ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব (১৬৫০-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

[Influence of Persian Language and Literature on Urdu Language and Literature] (1650-1950 CE)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

হুসাইনুল বান্না

পিএইচ. ডি. গবেষক

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ও

সহকারী অধ্যাপক

উর্দু বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর, ২০২২

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব (১৬৫০-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ)*** [Influence of Persian Language and Literature on Urdu Language and Literature (1650-1950 CE)] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কেউ গবেষণা করেননি। আমি আমার এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করেনি।

(হুসাইনুল বান্না)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং: ৮০
শিক্ষবর্ষ: ২০১৯-২০২০
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক ও উর্দু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব হুসাইনুল বান্না কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ***উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব (১৬৫০-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ)*** [Influence of Persian Language and Literature on Urdu Language and Literature (1650-1950 CE)] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি নিখুঁতভাবে পাঠ করেছি এবং পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে তা উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী)
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	**ভূমিকা**.....	৫-১১
২.	**প্রথম অধ্যায়ঃ** ফারসি ও উর্দু ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১২-৪৬
৩.	**দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ**উর্দু ভাষার ক্রমবিকাশে ফারসি ভাষার প্রভাব.....	৪৭-৮৮
৪.	**তৃতীয় অধ্যায়ঃ** উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে ফারসির প্রভাব.....	৮৯-১১৯
৫.	**চতুর্থ অধ্যায়ঃ** উর্দু কাব্যসাহিত্যে ফারসি কাব্যসাহিত্যের প্রভাব.....	১২০-১৭০
৬.	**পঞ্চম অধ্যায়ঃ** ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রভাবিত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক.....	১৭১-২০৭
৭.	উপসংহার	২০৭-২১১
৮.	গ্রন্থপঞ্জি.....	২১২-২২২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রচলিত ভাষা ও সাহিত্যগুলোর মধ্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য একটি সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য । জ্ঞান-গরিমার ভাষা হিসেবে এর খ্যাতি রয়েছে। এ ভাষাটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা– যা ইন্দো ইরানি ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে প্রাচীন ফারসি, পাহলভির আভেস্তায়ি রূপ পরিগ্রহ করে বর্তমান আধুনিক ফারসি ভাষার রূপ ধারণ করেছে। এ ভাষাটি কেবল সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবেই নয়; বরং এ ভাষার মাধ্যমে দর্শন এবং মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধানও নির্দেশ করে। হাজার খ্রিষ্টাব্দ থেকে চতুর্দশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষায় বহু কবি ও দার্শনিক সৃষ্টি হয়েছেন। এ ভাষার সমৃদ্ধি ঈর্ষণীয়। এক সময় ইউরোপ, চীন এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের সাহিত্যকর্মগুলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সামনে ম্লান হয়ে যেতো।

বর্তমানে ইরান, আফগানিস্তান ও তাজাকিস্তানের জাতীয় ভাষা ফারসি। সেই সাথে উজবেকিস্তান, ইরাক ও পাকিস্তানসহ পৃথিবীর অনেক দেশে ফারসি ভাষার প্রচলন রয়েছে। ফারসি খ্রিষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের প্রাচীন একটি ভাষা হলেও অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে এর বিকাশ সাধিত হয়। এর বিস্তার চলে প্রায় চৌদ্দশ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় ফারসি সাহিত্যের কবি রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.) থেকে শুরু করে ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.), শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.), উমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খ্রি.) নিজামি গাঞ্জাভি (১১৪৫- ১২০৩ খ্রি.) হাফিজ শিরাজিসহ (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.) অসংখ্য গুণি কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক জন্মলাভ করেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য তাঁদের পরিচর্যা পেয়ে পৃথিবীময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসনে সমাসীন হয়। কিছু দিন পূর্বেও ইরান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত শিক্ষিতজনদের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবকে দোষ বা ত্রুটি বলে বিবেচনা করা হতো। ধর্মপ্রচারক সুফি-সাধক, তুর্কি ও মোগলদের আগমনে এ উপমহাদেশের মানুষের সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সখ্যভাব গড়ে উঠে। উপমহাদেশে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের মধ্যে এমন কোনো ভাষা নেই যার উপর ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এবং তার উন্নত সংস্কৃতির প্রভাব পড়েনি।

উপমহাদেশের ভাষাগুলোর মধ্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সূচনাপর্বটি ছিলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থসমূহের ভাবানুবাদের মাধ্যমে। উপমহাদেশীয় এ ভাষাটি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ছোঁয়ায় এক সময় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় ভারতীয় ফারসি কবি-সাহিত্যিকগণের হাতেই এ ভাষাটি লালিত ও চর্চিত হয়েছে। তাই সুদীর্ঘ প্রায় হাজার বছর উর্দু ভাষা ও সাহিত্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে বিরামহীন প্রভাব গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব গ্রহণ করেছে অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) সময় থেকে নিয়ে আল্লামা ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) সময়কাল পর্যন্ত।

মূলত অলি দাকানি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে সামনে রেখে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে নতুন এক ধারা সৃষ্টির প্রয়াস চালান। এ ধারাটি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে এতো সমাদৃত হয় যে, অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) পর থেকে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকই এ ধারা অবলম্বনে সাহিত্য চর্চা করেছেন। উর্দু বর্ণমালা, শব্দ ও নতুন নতুন বাক্য তৈরি, শব্দপ্রকরণ,

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাকরণ, সাহিত্যালঙ্কার, অনুপ্রাস, পরিভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, কাব্য ও ছন্দে ফারসির প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। মোট কথা উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই যেখানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পড়েনি। উল্লেখ্য যে, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব যেমন উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে পড়েছে, তদ্রূপ উর্দু ভাষা ও সাহিত্যেরও কিছু কিছু প্রভাব ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে পড়েছে।

উর্দু ভাষাটি মূলত ভারতীয় আর্য ভাষা। এর উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে বিজ্ঞজনদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে ইন্দো-ইরানি হয়ে আরইয়া বা আর্য ভাষার রূপ ধারণ করে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক প্রাকৃতের সিঁড়ি বেয়ে শৌরশিনি প্রাকৃতের অপভ্রংশ রূপ থেকে এ ভাষাটি সৃষ্টি হয়েছে। হাজার খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে এ ভাষার নাম ও বর্ণমালায় নানা বিবর্তন দেখা যায়। রিখতা (ریختہ), খাড়িবোলি (کھڑی بولی), হিন্দুস্তানি (ہندوستانی), হিন্দাভি (ہندوی), উর্দুয়ে মুআল্লা (اردوئے معلی)সহ নানা নামে এ ভাষাটির পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়। অবশেষে উপমহাদেশের বিশিষ্ট ফারসি ও উর্দু কবি খান আরজুর (১৬৮৭-১৭৫৬ খ্রি.) প্রস্তাবনায় এবং বিখ্যাত উর্দু কবি ইমাম বখ্শ নাসিখের (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) দাবির প্ররিপ্রেক্ষিতে এ ভাষাটির নাম উর্দু নির্ধারিত হয়।

উর্দু গদ্য ও পদ্য সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিলো ফারসি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমে। খাজা ফরিদুদ্দিন গাঞ্জেশেকার (১১৭৩-১২৬৫ খ্রি.) একাদশ শতাব্দীতে উর্দু ভাষায় কাব্য চর্চা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, মুলতান দরবারের সভা কবি খাজা মাসউদ সাআদ সালমান[১] (১০৪৬-১১২১ খ্রি.) উর্দু ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডা রাষ্ট্রের শাসক খাজা কুলি কুতুব শাহ (১৪৬৫-১৫১১ খ্রি.) ফারসি কবিদের অনুসরণ করে সর্বপ্রথম উর্দু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। উর্দু ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের বিশাল এক সম্ভার হলো ধর্মীয় বই-পুস্তক। ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত ধর্মীয় গ্রন্থাবলি উর্দু অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

উর্দু ভাষার বিকাশ সাধন হয়েছে দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবের অন্যতম কারণ হলো ধর্মপ্রচার। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর সুফি-সাধকদের আগমন ঘটে। তাঁদের মাতৃভাষা ফারসি হওয়ায় তাঁরা ফারসি মিশ্রিত দিল্লির কথ্যভাষা হিন্দাভিকে (উর্দু ভাষার পূর্ববর্তী নাম) ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে উর্দু ভাষায় প্রচুর পরিমাণে ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

---

১. খাজা মাসউদ সাআদ সালমান। আনুমানিক ১০৪৬ খ্রিষ্টাব্দে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফারসি কবিতার সাথে সাথে লাহোরের আঞ্চলিক ভাষা হিন্দুস্তানি তথা উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। বলা হয় তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানি ভাষাকে ফারসি বর্ণমালায় প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতা রচনার সময়কাল হলো সুলতান ইব্রাহিম গাজনাভির (৪৫০-৪৯২ হি.) শাসনকাল। জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারাগারে অতিবাহিত করেন। কারাগারের বিভীষিকা ও বিভৎসতা সম্পর্কে তাঁর ফারসি কবিতাগুলোর বর্ণনা অতুলনীয়। তাঁর কবিতায় স্বল্পসংখ্যক সংস্কৃত পরিভাষা পরিলক্ষিত হয়। ১১২১ থেকে ১১৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক যুগের উর্দু ভাষার কবিগণ ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চার পাশাপাশি তাঁদের মাতৃভাষা উর্দুতেও কাব্যচর্চা করেছেন। তখন সাহিত্যমানের অর্থবহুল শব্দ উর্দু কাব্যে ছিলো অপ্রতুল। এ ভাষার কবিগণ এ অপ্রতুলতা দূর করেছেন ফারসি সাহিত্য ভাণ্ডারের শব্দমালা দিয়ে। বাক্যগঠন, বাক্যালঙ্করণ, কাব্যরীতি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার সবটাই ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে উর্দু ভাষায় এসেছে। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সর্বত্র ফারসি ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। এই প্রভাবের সময়কাল প্রায় এক হাজার বছর বলে অনুমিত। তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে এতদঞ্চলে ফারসি ভাষাচর্চা অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। তবে এ সময়েও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়নি।

তেরোশ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির ফারসি কবি আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) আবির্ভাব ঘটে। মাতৃভাষায় তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে তিনি ফারসি কথার সাথে উর্দু কথাগুলোকে গেঁথে দিয়েছিলেন। উর্দু কাব্যসাহিত্যের প্রাণপুরুষ অলি দাকানিকে (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) উর্দু কাব্যের বাবা আদম (بابائے آدم) বলা হয়। শুরুতে তিনি ফারসি কাব্য চর্চা করলেও পরবর্তীকালে তিনি উর্দু কাব্য রচনায় এক জাগরণ সৃষ্টি করেন। তাঁর অনুকরণেই সে যুগে মির্যা আবদুল কাদির বেদিল (মৃত্যু, ১৭২০ খ্রি.), আমির খান আঞ্জাম (মৃত্যু, ১৭৪৬ খ্রি.), ও সিরাজুদ্দিন আলি খান আরজু (১৬৮৭-১৭৫৬ খ্রি.) প্রমুখ ফারসি কবি উর্দুকাব্য রচনা করে ব্যাপক সাড়া জাগান। গোটা ভারতে তখন উর্দু সাহিত্যচর্চার হিড়িক পড়ে যায়। শুরু হয় উর্দু সাহিত্যের নতুন যাত্রা।

এক পর্যায়ে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারে উর্দুভাষা একটি দুর্বোধ্য ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম হয়। মির্জা মাজহার জানেজানা[২] (১৭০০-১৭৮০ খ্রি.) ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ উর্দু ভাষার অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসেন। ফারসি ভাষাকে সামনে রেখে উর্দু ভাষার উচ্চারণ ও বানানরীতি তৈরি হয়। এ উদ্যোগটি উর্দু ভাষার ইতিহাসে মির্জা মাজহারের ভাষা সংস্কার আন্দোলন (تحریک مظہر) নামে পরিচিত।

মির্জা মাজহার (১৭০০-১৭৮০ খ্রি.) যেহেতু সুফি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাই এ সময় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ইরানের সুফি সাহিত্যের প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাবের একটি বিশেষ কারণ ছিলো ফারসিভাষী মরমি কবিদের ভারত আগমন এবং তাঁদের সর্বজনীন প্রেমবাদমূলক ধর্মের প্রচার ও প্রসার। মির্জা মাজহারের সংস্কার আন্দোলনের পূর্বে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য অশ্লীলতায় ভরপুর ছিলো। মির্জা মাজহার (১৭০০-১৭৮০ খ্রি.) ফারসি বাক্যবিন্যাস ও শব্দ চয়নের সাথে সাথে আলোচ্য বিষয় পরিমার্জনের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে মির্জা মাজহারের (১৭০০-১৭৮০ খ্রি.) উদ্যোগটি উর্দু সাহিত্যপ্রেমীগণ সাদরে গ্রহণ করেন।

---

২. মির্জা মাজহার জানেজানা দিল্লির একজন প্রসিদ্ধ ফারসি ও উর্দু কবি। তাঁর প্রকৃত নাম হলো শামসুদ্দিন। কবি নাম হলো মাজহার জানেজানা। তিনি ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু ভাষা ও বানানরীতি সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লিতে মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, খণ্ড ২: ৫১৩)

Dhaka University Institutional Repository

মূলত উর্দু ভাষায় গদ্যরচনা শুরু হয় ইরানের লোককাহিনীকে ঘিরে। উর্দু সাহিত্যে দাস্তান (داستان) হলো গল্প বলার এক কথ্যধারা। এগুলো ফারসি কাহিনী অবলম্বনে উর্দু ভাষায় লেখা হয়েছে। এ সময়ে উর্দু ভাষার এমন অবস্থা ছিলো যে, উর্দু ভাষায় রচিত গদ্য বা পদ্যের যে কোনো গ্রন্থের ভূমিকা ফারসি ভাষায় লেখা হতো।

তাজকিরা (কবিদের জীবনচরিত) রচনাও ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় এসেছে। ফারসি ভাষায় এর সূচনা হয় খ্রিষ্টীয় তেরোশতকের দিকে। এর উদ্দেশ্য ছিলো বিভিন্ন কবির জীবনবৃত্তান্ত ও কাব্যের নিদর্শন সংগ্রহে রাখা। ফারসি কবিদের অনুকরণে উর্দু কবিদেরও জীবনবৃত্তান্ত লেখার রেওয়াজ গড়ে উঠে। এতে পছন্দের কবির কবিতা লিপিবদ্ধ করে রাখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কবির পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো। উত্তর ভারতে প্রেস চালু হলে এ ধরনের কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে উর্দু ভাষায় তাজকিরা (تذکرہ) সাহিত্যধারা বা জীবনচরিত রচনার রেওয়াজ গড়ে উঠে ।

উর্দু সাহিত্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) থেকে শুরু করে মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১), মির তাকি মির (১৭২৩-১৮১০ খ্রি.), ইনশা উল্লাহ খান ইনশা (১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.), ইমাম বখ্শ নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.), হায়দার আলি আতিশ (১৭৬৪-১৮৪৭ খ্রি.), মুমিন খান মুমিন (১৮০০-১৮৫১ খ্রি.), ইব্রাহিম জাওক (১৭৯০-১৮৫৪), মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) এবং আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) প্রমুখ ফারসি ভাষার পাশাপাশি উর্দু সাহিত্যেও অবদান রেখেছেন সমানভাবে। এ কবি-সাহিত্যিকদের দীক্ষাগুরু ছিলেন ফারসি ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। তাই তাঁদের রচনায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম হলো *উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব*। সময়কাল হলো ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। অত্র গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যে প্রভাব পড়েছে তা নির্ণয় করে বিশদ আলোচনা করা।

গবেষণাকর্মটির দু'টি দিক রয়েছে। একটি হলো উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব। আর অপরটি হলো উর্দু সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব। একজন গবেষক হিসেবে এ দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অত্র অভিসন্দর্ভে বর্ণ, শব্দ, ব্যাকরণ, সাহিত্যালঙ্কার, অনুপ্রাস, অনুবাদ সাহিত্য, গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে তথা উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবকে সুনিপুণভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

অত্র গবেষণাকর্মটিকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর ক্রমবিন্যাস হলো নিম্নরূপ:

প্রথম অধ্যায়: ফারসি ও উর্দু ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
এ অধ্যায়ে ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; বিবর্তনের ধারা; ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার প্রভাব ও ক্রমবিকাশ; ভারতীয় ভাষা উর্দুর সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক; উর্দু ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ; প্রাকৃত ভাষা, অঞ্চল ভিত্তিক উর্দু ভাষার নাম ও বিশ্লেষণ; ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশে ফারসির প্রভাব; উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানীদের অভিমত; উর্দু

ভাষার তিনটি রচনাশৈলী এবং উর্দু ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: উর্দু ভাষার ক্রমবিকাশে ফারসি ভাষার প্রভাব।

এ অধ্যায়ে যুগভিত্তিক উর্দু ভাষার উপর ফারসি ভাষার প্রভাব; পৃথিবীতে বর্ণমালা সৃষ্টি ও উর্দু বর্ণমালার ইতিহাস; উর্দু বর্ণমালার উপর ফারসি বর্ণমালার প্রভাব; আমির খসরু কর্তৃক রচিত উর্দু ও ফারসি ভাষার সমন্বয়ে মিশ্র ভাষার একটি গজল; উর্দু কবিতার অবিরাম যাত্রা; মোগল শসানামলে উর্দু ভাষার উপর ফারসির প্রভাব; উর্দু শব্দপ্রকরণ; ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষায় ফারসির প্রভাব; উর্দু শব্দপ্রকরণ; ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র ও পরিভাষার দিক থেকে ফারসির প্রভাব; উর্দু বানানরীতিতে ফারসির প্রভাব; উর্দু প্রবাদ-প্রবচনে ফারসি প্রবাদের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে ফারসির প্রভাব।

এ অধ্যায়ে উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে নাদওয়াতুল উলামাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবদান; উর্দু অনুবাদ-সাহিত্যের যুগভিত্তিক বিশ্লেষণ; উর্দু গদ্যসাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব; উর্দু দাস্তান সাহিত্যে ফারসি দাস্তানের প্রভাব; উর্দু ভাষায় সুফিতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের ধারণা; আল কুরআনের উর্দু অনুবাদে ফারসির প্রভাব; ফারসি কবি আমির খসরু বিরোচিত *কিস্‌সায়ে চাহার দরবেশ-এর* উর্দু অনুবাদ; মির আম্মানের অনুবাদ সাহিত্য; অনুবাদক মির শের আলি আফসোসের উর্দু অনুবাদ সাহিত্য; উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে সৈয়দ হায়দার বখ্‌শ হায়দারি; উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে নভেল কিশোর প্রকাশনা সংস্থা; উর্দু গল্পে ফারসির প্রভাব; ফারসি ভাষার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *শাহনামে* সম্পর্কে কিছু কথা; *শাহনামের* অনুকরণে উর্দু কাব্যগ্রন্থ; *শাহনামের* উর্দু অনুবাদ; ফারসি কবি উমর খৈয়াম ও তাঁর কবিতার উর্দু অনুবাদ; উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে ফারসি কবি শেখ সাদি ও মাওলানা রুমির প্রভাব; রুমি রচিত মাসনাভির আঙ্গিকে উর্দু মাসনাভি; উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে ফারসি কবি হাফিজের প্রভাব; উর্দু ভাষায় দিওয়ানে হাফিজের অনুবাদগ্রন্থ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: উর্দু কাব্যসাহিত্যে ফারসি কাব্যসাহিত্যের প্রভাব।

এ অধ্যায়ে উর্দু কাব্যের ক্রমবিকাশ; উর্দু কাব্যসাহিত্যে ফারসি কাব্যসাহিত্যের যুগভিত্তিক প্রভাব; উর্দুকাব্যে ফারসি কাব্যশৈলীর প্রভাব; উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্যের প্রভাবের কারণ; উর্দুকাব্যে ফারসি ছন্দ ও ভাবগত প্রভাব; উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্যের উপাদানগত প্রভাব; উর্দু মাসনাভি ও মাসনাভি ধারার কবিতায় ফারসি মাসনাভির প্রভাব; উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্যের প্রেম ও প্রণয় সংক্রান্ত বিষয়াবলির প্রভাব; উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্যের উপাদানগত প্রভাব; উর্দু কাব্যে ফারসি গজলের প্রভাব; উর্দু গজলকাব্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট; উর্দু গজলকাব্যে ধর্মীয় প্রভাব; উর্দু কাব্যে ফারসি সাহিত্যশৈলীর প্রভাব; উর্দু কবিদের মাঝে ফারসি কবিদের প্রভাব; উর্দু কাসিদায় ফারসি কাসিদার প্রভাব; উর্দু রুবায়ি কবিতায় ফারসির প্রভাব; রুবায়ি কাব্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট; উর্দু মারসিয়াকাব্যে ফারসি মারসিয়াকাব্যের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে গবেষণাধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়: ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রভাবিত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক।

এ অধ্যায়ে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) থেকে নিয়ে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) পর্যন্ত উর্দু কবিদের কবিতার ধরন ও বৈশিষ্ট্য এবং উর্দু কবিদের রচিত কবিতায় কোন্ কোন্ ফারসি কবির প্রভাব রয়েছে তা উদ্ধৃতি ও তথ্যসহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে উপসংহারে গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র ও টীকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণামূলক পত্রিকার জন্য যে নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে, তা অনুসরণ করা হয়েছে। কোনো খ্যাতিমান লেখক বা কবির নাম উল্লেখ করা হলে টীকা-টিপ্পনীতে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মটি সমৃদ্ধ ও সুসম্পন্ন করার জন্য প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বানানরীতির ক্ষেত্রে *বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান* এবং ক্ষেত্র বিশেষে *বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*-এর প্রমিত বানানরীতি অনুরসণ করা হয়েছে। তবে কতিপয় ফারসি, উর্দু ও আরবি শব্দের ক্ষেত্রে কাসেমিয়া লাইব্রেরি চকবাজার কর্তৃক প্রকাশিত *ফারহাঙ্গে কাসেমি* এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের অভিমত ও পরামর্শ অনুসৃত হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভে উদ্ধৃত কবিতাগুলো গবেষক কর্তৃক অনূদিত। গবেষণা ও গবেষণামূলক অনুবাদের ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের একজন শিক্ষক হিসেবে অত্র বিষয়টির পাঠদানের সাথে গবেষক প্রায় এক যুগ ধরে সংশ্লিষ্ট আছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে আমি মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। আমি শুকরিয়া আদায় করি আমার মায়ের- যাঁর দোয়ার বরকতে আমি গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে পেরেছি। আমার স্ত্রী শরীফা জাহানারা ও আমার আত্মজা-আত্মজ সৈয়দা জুয়াইরিয়াতুল বান্না তাহিয়া, সৈয়দ মুহাম্মদ তাবশিরুল বান্না ও সৈয়দা খাদিজাতুল কুবরা রাকিন-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ- যারা ভালোবাসার মায়াজালে আমাকে আটকে রেখে গবেষণাকর্মটি সমৃদ্ধ করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ত্যাগের কথা স্বীকার করতেই হয়। তারা জীবনের অনেক চাহিদা কোরবানি করেছে যেনো আমার গবেষণাকর্মটি সমাপ্তিতে ত্বরান্বিত হয়।

আমি আমার প্রাণের বিভাগ উর্দুর সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কার্মচারীর শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষত যাঁদের নিকট আমি শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেকে আলোকিত করার প্রয়াস পেয়েছি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী ও অধ্যাপক ড. মো. ইস্রাফীল-এর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আমার সহকর্মী অধ্যাপক ড. রশিদ

আহমদ ও উর্দু বিভাগের বর্তমান চেমারম্যান অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম, জনাব মো. গোলাম মাওলা হিরন ও হাফসা আক্তার-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি– যাঁরা গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বর্তমান চেয়াম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন-এর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ– যাঁর সুন্দর পরামর্শে আমার অভিসন্দর্ভটি সুসজ্জিত হয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানসহ ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার আত্মার পরমআত্মীয় অধ্যাপক ড. মুহসীন উদ্দীন মিয়ার প্রতি– যাঁর মূল্যবান পরামর্শে আমি একজন যোগ্য তত্ত্বাবধায়কের দিকনির্দেশনা পেয়েছি। আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি– যিঁনি আমাকে একজন যোগ্য গবেষক হিসেবে প্রস্তুত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণা আমাকে উজ্জীবিত করেছে এবং গবেষণায় শক্তি যুগিয়েছে।

শৈশবকাল থেকে অদ্যাবধি আমি যেসকল শিক্ষকের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছি; তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার এ অভিসন্দর্ভটি মূলত তাঁদের বিন্দু-বিন্দু শ্রমের ফসল। অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ করতে যেয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, উর্দু বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় আলিগড়, চৌধুরি চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয় মিরাট, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসারসহ অসংখ্য দেশি-বিদেশি লাইব্রেরির সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। এছাড়া আমার অভিসন্দর্ভের উপর অনুষ্ঠিত দুইটি সেমিনারে যাঁরা এ গবেষণা অভিসন্দর্ভকে সমৃদ্ধ করার জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামত দিয়েছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অবশেষে আমি সকলের আশির্বাদ কামনা করছি।

প্রথম অধ্যায়

ফারসি ও উর্দু ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মনেরভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। প্রতিটি ভাষার রয়েছে ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এই ইতিহাস ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই ভাষার মূলভিত শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং ভাষা হয় প্রাঞ্জল ও সাহিত্যময়। আর এ ভাষার মাধ্যমে রচিত হয় নানা রকমের গল্প, উপাখ্যান, কবিতা, গাথা, নাটক ও উপন্যাস। পৃথিবীতে যে সকল ভাষা বর্তমানে প্রচলিত আছে, তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ ভাষাগুলো কয়েকটি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর মাঝে সীমাবদ্ধ। এ বিষয়টি নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো, একই স্তরের বিভিন্ন ভাষার মাঝে যদি শব্দ ও ব্যাকরণগত সাদৃশ্য বা মিল পরিলক্ষিত হয় তবে সে ভাষাগুলো উৎপত্তিগত ও বংশগত দিক থেকে এক। এটি ভাষা বিজ্ঞানীদের একটি সূত্র বলে বিবেচিত। (আবেদি, ১৯৮৪: ১)

ফারসি ভাষার পরিচয়

ফারসি ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ফারসি ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ইরানে। ইরানের অধিকাংশ অধিবাসী আর্য বংশোদ্ভূত। দক্ষিণ ইরানের সমতল ভূমির আদি অধিবাসী এবং আর্যদের পারস্পরিক ভাষার সংমিশ্রণের ফলে ফারসি ভাষার সৃষ্টি হয়। (তামীমদারী, ২০১৪: ৪)

ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী হলো পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ভাষাগোষ্ঠী। ভারতবর্ষ, ইরান, মধ্যএশিয়া ও সমগ্র ইউরোপের ভাষাগুলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকেই। ফারসি ভাষার ইতিহাস প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো। খ্রিষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর পূর্বে আর্যরা ইরান[৩] ভূখণ্ডটি দখল করে বসতি স্থাপন করে। খ্রিষ্টপূর্ব দু'হাজার থেকে খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ একত্রিশ বছর পর্যন্ত ইরানে বিভিন্ন ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাজ্যের গোড়াপত্তন ঘটে। এ সময় অভ্যন্তরীণ ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে ফারসি ভাষায় আমূল পরিবর্তনও সাধিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় এ যুগটিকে ফারসি ভাষার প্রাচীন যুগ বলা হয়ে থাকে। (কাসেমি, ১৩৭৮ সৌ.: ১৮)

পৃথিবীর প্রাচীতম ভাষার উপর একটি বিশ্লেষণ

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উৎস কোথায় ছিলো তা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও অনেকের মতে মূলত অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির সমতল ভূমি ছিলো এ ভাষার উর্বরস্থল। এ ভাষাটির কথ্যরূপ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হয়ে ইরান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে ভাষাটির নামেরও পরিবর্তন ঘটে; নাম হয় ইন্দো-ইরানিক। কালের বিবর্তনে এ ভাষাটি কাবুল, মঙ্গলিয়া, তিব্বত, লাহোর, মুলতান, সিন্ধু অঞ্চলে ইন্দো-আরয়ায়ী বা আর্যভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে। এই আর্যভাষাটিই মূলত ফারসি ও উর্দু ভাষার আদিরূপ।

---

৩ প্রাচীন ইরানের অধিবাসীরা নিজেদের 'অরিয়' অর্থ্যাৎ আর্য বলতো। এ শব্দটিই মধ্য যুগের ফারসি ভাষায় 'এরান' এবং আধুনিক ফারসি ভাষায় 'ইরান' হয়েছে। ইরানের অধিবাসীরা নিজেদের জন্য ইরান নাম ব্যবহার করে। এর থেকেই মূলত ইরান দেশ ও ইরানি জাতি বোঝায়। ইরানের একটি অঞ্চলের প্রাচীন নাম পার্স। এই নামটি ভারতবর্ষে পারস্য এবং আরব দেশে ফার্‌স উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অনেকে মনে করেন, ইরানিগণ যোদ্ধা ও অশ্বারোহণে পারদর্শী ছিলেন বলে তাদেরকে আরবি ভাষায় ফারিস বলা হতো। (পাল, ১৯৫৪: ৫)

আর্যভাষার দু'টি প্রধান শাখা রয়েছে। ভারতীয় আর্য ও ইরানীয় আর্য। ইরানীয় আর্যভাষা আভেস্তায়ি, মধ্যযুগীয় ফারসি, পাহলাভি যুগ অতিক্রম করে আধুনিক ফারসি ভাষা ও সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। দারি, পস্তু ও বেলুচি ভাষাও ফারসি ভাষারই ভিন্নরূপ। পক্ষান্তরে ভারতীয় আর্যভাষার মূল হলো বৈদিক ভাষা; যা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অতি প্রাচীনরূপ। এই বৈদিক ভাষা টেকসালি, সংস্কৃত, প্রাকৃতরূপ পরিগ্রহ করে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

ফারসি ভাষার কাল নির্ণয়

ফারসি ভাষার ক্রমবিকাশকে মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা (১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্যযুগ ও (৩) আধুনিক যুগ। আর প্রাচীন যুগের ফারসি ভাষাকে মাদি ও সেকায়ি, প্রাচীন ফারসি ও আভেস্তায়ি এ তিনটি স্তরে বিভাজন করা যায়। যার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ফারসি ভাষার প্রাচীন যুগে মাদি ও সেকায়ি ভাষা

মাদি হলো মাদ সম্প্রদায়ের ভাষা। এর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। আর সেকায়ি হলো ইরানের সেকা সম্প্রদায়ের ভাষা। এ সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী এলাকা থেকে চীনের সীমান্তবর্তী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ধারণা করা হয় যে, সেকায়ি ভাষার কিছু শব্দ বর্তমানে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে। (সিরাজী, ২০১৪: ৫)

প্রাচীন ফারসি ভাষা

প্রাচীন ফারসি বলতে মূলত হাখামানশি (রাজত্বকাল খ্রিষ্টপূর্ব সাতশো বছর) যুগে বিভিন্ন পর্বতে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিকে বোঝায়। এই লিপিগুলোর নিদর্শন রাজা দারাউশ (শাসনামল খ্রি.পূ. ৫২১-৪৮৪) ও তাঁর পুত্র খাশাইয়ারশাহর তত্ত্বাধানে বিস্তুন নামক পর্বতে খোদাই করা লিপি থেকে পাওয়া যায়। এ ভাষাটিকে মিখি ভাষাও বলা হয়। মিখ শব্দটি ফারসি। এর অর্থ হলো পেরেক বা কিলক। যেহেতু এ ভাষাগুলোর বর্ণ পেরেক বা কিলক আকৃতির ছিলো তাই এ ভাষার লিপিকে মিখি নামে অবিহিত করা হতো। এ ভাষার বর্ণের সংখ্যা ৩৬ টি। এ বর্ণমালা নিনওয়া ও বেবিলন এলাকায় প্রচলিত ছিলো। এ বর্ণগুলো বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হতো। (সিরাজী, ২০১৪: ৫)

আভেস্তায়ি ভাষা

প্রাচীন ফারসি ভাষার সর্বশেষ স্তর হলো আভেস্তায়ি ভাষা। এর উৎপত্তি হলো জারথুস্ত্রীয়[৪] ধর্মগ্রন্থ আভেস্তা থেকে। এ ভাষাটি হলো প্রাচীন ইরানের উত্তরাঞ্চলের কথ্যভাষা। এর বর্ণমালায় মোট ৪৪টি বর্ণ বিদ্যামন ছিলো। এ বর্ণগুলো ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হতো। (সেন, ২০১৮: ৮২)

---

৪ জারথুস্ত্র ছিলেন প্রাচীন ইরানি যুগের একজন ধর্মসংস্কারক। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি ইরানে আসেন। জারথুস্ত্র তাঁর ধর্মীয় মতবাদ ও বাণীগুলোকে ছন্দকাব্যে প্রচার করেছেন। মূলত জারথুস্ত্র কর্তৃক প্রচারিত ইরানের ধর্মমত ও বাণীসমূহ সম্বলিত ধর্মগ্রন্থকে *আভেস্তা* বলা হয়। জারথুস্ত্র প্রবর্তিত নীতিমূলক ধর্ম অবলম্বন করার পূর্বে ইরানি আর্যরা ভারতীয় আর্যদের মতো দেব-দেবির উপাসক ছিলো। *আভেস্তা* ধর্মগ্রন্থে এই ধর্মাচারের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (সেন, ২০১৮: ৮২)

মূলত ফারসি সাহিত্যের সূচনাকাল হলো ২২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। এ সময়টিকে সাসানি যুগের সূচনাকালও বলা চলে। খ্রিষ্টপূর্ব সাতশো বছর পূর্বে হাখামানশি যুগে ভাষার যে বিকাশ শুরু হয় তার ধারাবাহিকতায় সাসানি যুগের সম্রাটগণ ফারসি ভাষা ও সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত করেন। তাই সাসানিদেরকে হাখামানশিদের উত্তরাধিকারী বলা চলে।

উল্লেখ্য যে, আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট [Alexander The Great] (৩৫৬-৩২৩ খ্রি.পূ.) হাখামানশি যুগের শেষ সম্রাট তৃতীয় দারাউশকে পরাজিত করে সেলুকি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই শাসনব্যবস্থাকে আশকানিগণ নিশ্চিহ্ন করে তারা প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত টিকে ছিলো। আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট [Alexander The Great] (৩৫৬-৩২৩ খ্রি.পূ.)-এর শাসনামলে ইরানে গ্রিকদের প্রভাব থাকলেও আশকানিদের শাসনামলে ইরানে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। অবশেষে ২২৬ খ্রিষ্টাব্দে আরদেশির বাবেকান নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আশকানি শাসক পঞ্চম আরদেভান পরাজিত হলে আরদেশির বাবেকান স্বীয় পিতা সাসানের নামে সাসানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। (সিরাজী, ২০১৪: ২১-২২)

আরদেশির সিংহাসনে আরোহনের পর ধর্মীয়গ্রন্থ *আভেস্তাকে* সুবিন্যস্ত করেন। মূলত আরদেশিরের শাসনামলে ইরানের ইতিহাস ঐতিহ্যের সূচনা ঘটে। আরদেশিরের পর স্বীয় পুত্র শাহপুরের শাসনামলে (২৪০-২৭৩ খ্রি.) গ্রিস বারংবার ইরানের আক্রমণের শিকার হয়। অবশেষে ২৬০ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিক বাদশা গরডিয়ান পরাজিত ও বন্দি হন এবং গ্রিক সাম্রাজ্য ইরান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে গ্রিসের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ইরানের আয়ত্তাধীনে আসে। গ্রিক-সভ্যতা, দর্শন আর কৃষ্টির প্রভাবে ইরানি সভ্যতা, দর্শন ও কৃষ্টি-কালচার আরো বিকশিত হয়।

সাসানি সাম্রাজ্য ২২৬ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিলো। সাসানি যুগে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে সাসানিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। পাহলাভি ভাষায় রচিত জারথুস্ত্রীয় বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ *মাজদা ইয়াসনা* এ যুগের বলেই প্রতীয়মান হয়।

সাসানি যুগের প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত দ্বারা প্রাচীন ইরানে প্রচলিত তিনটি ভাষা তথা গ্রিক, সাসানি ও পাহলাভির প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, সাসানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আরদেশির বাবেকানের যুগের প্রাপ্ত শিলালিপিগুলো সবচেয়ে প্রাচীন। এ শিলাপিলিগুলোতে আশেকানিদের পতনসহ সে যুগের ধর্মীয় নানাবিধ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফারসি ভাষার মধ্যযুগ

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ সনে আভেস্তায়ি ভাষার[৫] বিলুপ্তি ঘটে এবং এ ভাষাটি জারথুস্ত্রীয় ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। এ যুগে ইরানে প্রচলিত ভাষাগুলোকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) ইরানের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষা। এ অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাগুলোর

৫ খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ সনে আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট (Alexender the Great) আরবেলার যুদ্ধে ইরানিদের পরাজিত করে ইরানে গ্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং পাগল প্রায় হয়ে ইরানের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সকল কিছু পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এতে ইরানের ভাষা সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থার বিনাশ ঘটে। (পাল, ১৯৬২: ১৫)

মধ্যে পাহলাভি আশেকানি ভাষা অন্যতম। (২) ইরানের পূর্বাঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষা। এ ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বালখি, খাতনি, খারেজমি ও সুগদি। (সিরাজী, ২০১৪: ৯) যেহেতু আধুনিক ফারসি ভাষার সাথে পাহলাভি আশেকানি ভাষার সম্পর্ক রয়েছে। তাই পাহলাভি আশেকানি ভাষা সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

পাহলাভি ভাষা

পাহলাভি ভাষা মূলত আধুনিক ফারসির জননী। আধুনিক ফারসি ভাষাকে পাহলাভি আশেকানি ভাষার রূপান্তরিত অবস্থা বলা যায়। পাহলাভি ভাষার উৎপত্তি হয়েছে আশকানি সাম্রাজ্যের যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৭-২২৪)। এ যুগের সাথে সম্পৃক্ত করেই আশেকানি শব্দটি পাহলাভি ভাষার সাথে যুক্ত করা হয়। পাহলাভি ভাষাটি ছিলো খোরাসানের কথ্যভাষা এবং ইরানের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষা। পাহলাভি শব্দটি ফারসি পারোয়ান (Parowan) থেকে নির্গত। এটি একটি প্রদেশের নাম। এ অঞ্চলে রাজা আশকে আওয়াল গ্রিক সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে আশকানি (খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৭-২২৪) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ইরানের সাসানি[৬] শাসনামলে প্রায় চারশত বছর পর্যন্ত সর্বজন গ্রাহ্য ভাষা ছিলো। এ ভাষাটিও আরবির মতো ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে লেখা হতো।

পাহলাভি সাহিত্য একটি সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য। জারথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ এ ভাষায় রচিত। জারথুস্ত্রীয় ধর্মের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোও এ ভাষাতেই রচিত হয়েছে বলে প্রমাণ মিলে। জারথুস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারীরা কতিপয় ধর্মীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এ কারণে ইরানের অধিবাসীদের সাথে ভারতীয়দের সখ্যভাব গড়ে উঠে। বিশেষত প্রথম খসরু নওশিরওয়ানের শাসনামলে (৫৩১-৫৯৭ খ্রি.) সাসানীয়দের সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়।

কথিত আছে যে, বাদশাহ নওশিরওয়ানের বুর্জুয়ে নামক মন্ত্রী ও চিকিৎসক ভারতবর্ষ আগমন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিখ্যাত *কালিলা ওয়া দিমনা* (كليله و دمنه) নামক গ্রন্থটি ইরানে নিয়ে যান। এ গ্রন্থটি পশু-পাখির ভাষায় বর্ণিত পৌরাণিক (Fable) নীতি কাহিনী সম্বলিত। বাদশাহ নওশিরওয়ানের নির্দেশে পরবর্তীকালে এ গ্রন্থটি পাহলাভি ভাষায় অনূদিত হয়। (আমিরী, ১৩৭৪ সৌ.: ২)

পাহলাভি সাহিত্য

পাহলাভি পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সাহিত্য। এর গোড়াপত্তন হয় ২২৪ খ্রিষ্টাব্দে সাসানি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আরদেশির বাবেকানের হাতে। এর পরিসমাপ্তি ঘটে ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে সাসানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক ইয়াজদেগারদের শাসনামলে। দীর্ঘ ৪২৮ বছর ধরে পাহলাভি সাহিত্য বিদ্যমান ছিলো।

পাহলাভি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো *আভেস্তা*। কিন্তু এ ধর্মগ্রন্থটির চর্চা হতো মূলত মুখে মুখে। এর মর্মার্থ কেবল পুরোহিতগণই বুঝতে পারতেন। যার কারণে এ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রোয়জন

৬ ইরানে ইসলামপূর্ব সর্বশেষ যে সাম্রাজ্য ছিলো তাকে সাসান সাম্রাজ্য বলা হয়। প্রায় চারশত বছর এ সাম্রাজ্য পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো। ইসলাম আগমনের পর মুসলিম শাসনকর্তাদের মাধমে এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। (পাল, ১৯৬২: ১৬)

ছিলো। এই *আভেস্তা* ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলো *জিন্দাভেস্তা*। সাসানি যুগের এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি পৃথিবীর বুকে সাহিত্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। চার খণ্ড সম্বলিত এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের অংশবিশেষ এখনো সংরক্ষিত আছে।

জিন্দাভেস্তা ব্যাখ্যাগ্রন্থকে পাহলাভি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলে। এ ছাড়া *কারনামায়ে আরদেশিরে পাপেকান*, *ইয়াদগারে জাবের*, *খোদা-ই-নামে*, *দেরাখতে আশুরিক* ইত্যাদি গ্রন্থ পাহলাভি সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন। পাহলাভি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থগুলোতে গদ্য সাহিত্যের পাশাপশি কাব্যসাহিত্যেরও নমুনা পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এ আমলে কাব্যচর্চাও বেশ জনপ্রিয় ছিলো। (সিরাজী, ২০১৪: ২৮)

এ সময় ইরানে পাহলাভি ছাড়াও অন্যান্য ভাষার প্রচলন ছিলো। এ ভাষাগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো খারেজমি, সুগদি ও তোখারি ভাষা। খারেজমি ভাষার কোনো স্বতন্ত্র লিপি পাওয়া যায় না। সুগদি ইরানের পূর্বাঞ্চলের একটি প্রদেশের নাম। এ প্রদেশেই সুগদি ভাষার প্রচলন ছিলো। আর তোখারি ভাষা হলো ইরান ও চীনের সীমান্তবর্তী এলাকার ভাষা। এ ভাষাটি চীনে প্রচলিত খাত্তানি ভাষার নিকটতর একটি ভাষা।

আধুনিক ফারসি ভাষা

আধুনিক ফারসি ভাষার উৎপত্তি হলো আনুমানিক খ্রিষ্ট্রীয় অষ্টম শতকে। এটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর বংশানুগত ভাষা। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা.)-এর নির্দেশে প্রখ্যাত সাহাবি হযরত সাআদ বিন আবি ওক্কাস (রা.)-এর মাধ্যমে ইরান বিজয়ের যে সূচনা হয়েছিলো; ৬৫২ খিষ্টাব্দে তার পরি সমাপ্তি ঘটে।

ইরানের সাসানীয় সর্বশেষ সম্রাট ইয়াজদেগারদ ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে নিহত হলে ইরানের প্রচলিত পাহলাভি ভাষায় আরবির প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। মধ্যযুগে যেখানে পাহলাভি বা ফারসি ভাষায় আরবি শব্দের পরিমাণ শতকরা পাঁচভাগ ছিলো, সেখানে আধুনিক ফারসি ভাষায় তা শতকরা ষাটভাগে উন্নীত হয়। (শাফাক, ১৩৫২ সৌ.: ১১৪)

ইরান আরবদের অধীনস্ত হওয়ার পরও তারা যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পাহলাভি ভাষাতেই সমাধা করতো। সাতশত খ্রিষ্টাব্দে ইরানের প্রাদেশিক উমাইয়া শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৬৬১-৭১৪ খ্রি.) যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম আরবি ভাষায় সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন। ক্রমে ক্রমে পাহলাভি ভাষার উপর আরবি ভাষা প্রভাব বিস্তার করে। এক পর্যায়ে ইরানিরা স্বীয় মাতৃভাষা পাহলাভি বর্ণমালা ত্যাগ করে আরবি বর্ণমালায় ফারসি ভাষা লিপিবদ্ধের প্রয়াস চালায়। তারা আরবি ভাষা শিখে এ ভাষায় বহুগ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করে। (পাল, ১৯৫৪: ২২)

এক সময় ইরানে আরবি ভাষার ব্যাপক প্রচলন ও প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এ প্রভাব আনুমানিক দু'শ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এর ফলে ইরানের শিক্ষিত, মনীষী ও পণ্ডিতগণ আরবি ভাষাতেই পত্রবিনিময় ও সাহিত্যচর্চা করেছেন। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, ইরানের জ্ঞানী-গুণিজন মাতৃভাষা

ফারসিতে সাহিত্যচর্চার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। ফলে আরবি ভাষায় সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, ইতিহাসে মুসলমানদের তথা আরবদের এ বিজয়কে 'ফাতহুল ফুতুহ' (فتح الفتوح) বা মহাবিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবি ভাষার এ আধিপত্য ইরানে প্রায় দু'শো বছর বিরাজমান ছিলো। অবশেষে ৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ (৮২২-৮৬১ খ্রি.) যখন খেলাফত পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন তখন তাঁর দুর্বল কর্ম-কাণ্ডের কারণে ইরানিদের মাঝে বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং ক্রমান্বয়ে তাহিরি, সাফ্ফারি, সামানি, আল বুয়ে ও গাজনাভিদের হাত ধরে ইরান পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

এ দু'শো বছরে ফারসি ভাষা নানারূপ পরিগ্রহ করে বর্তমানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ের কবি-সাহিত্যিকগণ এ নতুনরূপের ফারসি ভাষায় কাব্য ও গদ্যচর্চা করে ফারসি ভাষাকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠতম ভাষায় সমুন্নত করার প্রয়াস চালান। এ সময় (২৫৪ হিজরি আনুমানিক ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে) সিস্তানের অন্তর্গত ইরানের জারান্জ শহরে ইয়াকুব লিস সাফফার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফারসি দারি[৭] (Dardic) ভাষাকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্ধারণ করেন যার ধারাবাহিকতা আফগানিস্তানসহ বহু রাষ্ট্রে আজও বিদ্যমান রয়েছে।

পাহলাভি ভাষা ফারসি ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণ

ভাষাবিজ্ঞানীগণ পাহলাভি ভাষা ফারসি ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার নানা কারণ উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম দু'টি কারণ এ স্থানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এক. আরবদের কর্তৃত্বের কারণে পাহলাভি ভাষা ব্যবহারের অঞ্চলগুলোতে আরবি ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এক পর্যায়ে প্রচুর আরবি শব্দ পাহলাভি ভাষায় প্রবেশ করে। অবস্থা বিচারে ষাট শতাংশ আরবি শব্দ পাহলাভি ভাষায় স্থান করে নিলে এ ভাষাটি ফারসিরূপ পরিগ্রহ করে।

দুই. পাহলাভি বর্ণমালা ও আরবি বর্ণমালার লেখ্যরূপ অনেকটা কাছাকাছি ছিলো। ইসলাম আগমনের পর ইরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় জ্ঞান-গরিমার ভাষা হিসাবে আরবিচর্চা শুরু হয় এবং পাহলাভি ভাষা উপেক্ষিত হতে থাকে। ফলে ইরান ও তার আশপাশের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোতে শাসকদের আগ্রহের কারণে তাঁদের রাজ দরবারে আরবি বর্ণমালায় পাহলাভি ভাষাচর্চা শুরু হয়। এ ভাষাটিকে তৎকালে দরবারি ভাষা বা ফারসি দারি ভাষা বলা হতো। পরবর্তীকালে এ ভাষাটিই ফারসি ভাষা হিসেবে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। (পাল, ১৯৫৪: ২৭)

---

৭ দারি আফগানিস্তানে ব্যবহৃত এক প্রকারের ফারসি ভাষা। আফগানিস্তানের প্রায় পঁচিশ শতাংশ লোকের এটি মাতৃভাষা। ফারসি ভাষার মতো দারি ভাষাও আদি-নব্য ফারসি ভাষার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। মধ্যযুগের ফারসি ভাষা ছিলো সাসানীয় সাম্রাজ্যের সাহিত্য, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা। এটি হাখামনশি সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত আদি ফারসি ভাষার পূর্ববর্তীরূপ। দারি শব্দটি দরবারি থেকে এসেছে। সাধারণত রাজ দরবারে এ ভাষাটির ব্যবহার হতো বলে তাকে দারি ভাষা বলা হতো। (লেজার্ড, ১৯৭৫: ৩৮)

ইসলাম আবির্ভাবের পর ফারসি ভাষা

ইসলাম আবির্ভাবের পর আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকা গাজনাভি এবং খোরাসান অঞ্চলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়। এ অঞ্চলের ফারসি সাহিত্যশৈলীকে খোরাসানি রচনাশৈলী বলা হয়। ২২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রায় ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ রচনাশৈলী ফারসি সাহিত্যকে আলোকিত করে।

এ রচনাশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ফারসি ভাষার প্রাচীন শব্দের ব্যবহার। এতে আরবি শব্দের বাহুল্য নেই বললেই চলে। এ রচনাশৈলীতে এমন শব্দমালার ব্যবহার দেখা যায়, যা বর্তমানে ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ যুগের প্রধান সাহিত্য বৈশিষ্ট্য হলো রুবায়ি আঙ্গিকের কবিতা যাতে সুফি ভাবধারার বর্ণনা রয়েছে।

এ ছাড়া এ যুগে মাসনাভি (দ্বিপদী কাব্য) আঙ্গিকের কাব্যচর্চার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ফারসি সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খোরাসানি রচনাশৈলীর অস্তিত্ব বিরাজমান ছিলো। এরপর ফারসি সাহিত্যে আরবি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এর অব্যবহিতপর ইরাকি রচনাশৈলীর উদ্ভব ঘটে যা ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিলো।

কবি ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০খ্রি.) স্বীয় মহাকাব্য *শাহনামে* (شاه نامه) রচনায় খোরাসানি রচনাশৈলী অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। *শাহনামে* (شاه نامه) রচনার যুগটি ছিলো খোরাসানি রচনাশৈলীর সমাপ্তি যুগ। এ যুগে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। তবে ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) এ রচনাশৈলী ব্যবহারে পুরোপুরি সফল হননি বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি) ছাড়াও কবি রুদাকি[৮] (৯০০-৯৪০ খ্রি.) সামারকান্দি, শাহিদ বালখি, দাকিকি ও কাসায়ি, আবুল ফারাজ রুনি ও মাসউদ সাআদ সালমান ছিলেন এ যুগের প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে অন্যতম।

ফারসি দারি ভাষা

নসর বিন আহমদ সামানি ৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে সামানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যার কেন্দ্র ছিলো বোখারা। উল্লেখ্য যে, এর শাসকগণ সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে এ সময় পারস্যে সুন্নি মতবাদের বিকাশ ঘটে ছিলো। এ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিলো ফারসি দারি ভাষা। সামানি শাসকদের আগ্রহের কারণেই মূলত এ ভাষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। প্রথমে আরবি ভাষার বত্রিশটি বর্ণের সাথে আরো চারটি বর্ণ যুক্ত করে এ ভাষাটি লেখা হয়। পর্যায়ক্রমে এ ভাষাটির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। (ডানিয়েল, ২০০১: ৭৪)

---

৮ আবু আব্দুল্লাহ জাফর বিন মুহাম্মদ রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.) ছিলেন সামানি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অন্ধকবি। এ সময়টি ছিলো নব্য ইরানি যুগের সূচনাকাল। বর্তমান সমরকন্দের অন্তর্গত রুদাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে রুদাকি নামে ডাকা হতো। তাঁর কাব্যশক্তির প্রভাব সকল যুগের শ্রেষ্ঠ ফারসি কবিগণ স্বীকার করেছেন। ফারসি ভাষায় প্রচলিত প্রায় সকল ছন্দেই তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তবে মাসনাভি ও কাসিদা ছন্দে তাঁর রচনা অতুলনীয়। কবিতা ছাড়াও তিনি বহু গান লিখে সুর করেছেন এবং চাঙ্গ নামক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারদর্শী ছিলেন। (পাল, ১৯৫৪: ৩১)

এরপর আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকা গাজনাভিতে খোরাসান অঞ্চলের সামানিদের সাবেক সেনাপতি আলাপতেগিন গাজনাভি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এর স্থায়িত্বকাল ছিলো ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। আলাপতেগিনের মৃত্যুর পর স্বীয় ভৃত্য ও জামাতা সাবুকতেগিন এ সাম্রাজ্যের শাসক হন এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। সাবুকতেগিনের পুত্র মাহমুদ গাজনাভি সামানিদের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত গাজনাভি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। ফলে ফারসি দারি ভাষা ইরান থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় আলাদা গুরুত্ব লাভ করে। এ ভাবেই ফারসি ভাষার সাথে ভারতীয়দের সখ্য গড়ে উঠে। (কাসেমি, ৩৭৮ সৌ.: ১০৮)

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার সূচনা

গাজনাভি সাম্রাজ্য ভারতের পশ্চিমাঞ্চল দখলের মধ্য দিয়ে ফারসি সাহিত্য ভারত বা উপমহাদেশীয় অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করে। খাজা মাসউদ সাআদ সালমানের (মৃত্যু: ১১২১-১১৩০ খ্রি.) ন্যায় কবিগণ এ সময় ভারতের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ভারতবর্ষের কবিগণের ভালো লাগার সম্পর্ক গড়ে উঠে। গাজনাভি সম্রাটগণ ভারত থেকে যে সীমাহীন সম্পদ লাভ করতো তা তাঁরা বিপুলভাবে কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে বিলিয়ে দিতো। এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কাসিদা বা স্তুতিবাদ কাব্যচর্চার ব্যাপকতা লাভ করেছে। তা ছাড়া এ যুগে ইরফানি (অধ্যাত্মবাদ) সাহিত্যের প্রচলন ঘটে। কবি মাজদুদ্দিন সানায়ি, হাসান গাজনাভি এবং *কালিলা ওয়া দিমনা* (كليله و دمنه)-এর অনুবাদক আবু নাসরুল্লাহ মুনশি এ যুগের অন্যতম কবি ও সাহিত্যিক। খোরাসান ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো এ সময় ফারসি কবিদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। (তামীমদারী, ২০০৭: ৪৮)

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে খোরাসান অঞ্চল ছাড়াও এ উপমহাদেশে ঘুরি রাজবংশ ছিলো ফারসি কবিদের আশ্রয়স্থল। এ সময়ের কবিগণ সাধারণত জটিল ও দুর্বোধ্য সাহিত্যালংকার ব্যবহারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। যে কারণে সে যুগের কবিদের রচিত কাব্যে এক প্রকারের অস্পষ্টতা ও জটিলতা পরিলক্ষিত হতো। তবে এ যুগে সুফি ও আরিফ তথা অধ্যাত্মবাদি কবিগণের গুরুত্ব অন্যদের তুলনায় বেশি ছিলো। তখন ইরানের সামাজিক অবস্থা এবং শাসকদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ কাব্যচর্চার দিকে সকলকে উৎসাহিত করে ছিলো। এ আধ্যাত্মিকতা ফারসি কবিতায় বিশেষ সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিলো। ফলে ফারসি কাব্যে সংযোজিত হয়েছিলো আধ্যাত্মিক ভাবধারা সম্বলিত কবিতা।

এ সময় ফারসি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে সাবকে ইরাকি রচনাশৈলীর বিকাশ দেখা যায়। যার কারণে ফারসি সাহিত্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদিস ও আরবি প্রবাদ অধিকহারে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফারসি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদের এধারা ফারসি সাহিত্যকে দরবার থেকে বের করে এনে সকলের কাছে সমাদৃত করে তোলে। ভারতের ফারসি কাব্যচর্চায়ও এধারার প্রভাব দেখা যায়। এ সময়কার ভারতের ফারসি কবিদের মধ্যে তারতারি, জামালুদ্দিন দাকানি ও তাজুদ্দিন জিরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যুগে ভারত ছাড়াও আজারবাইজান ও ইসফাহানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। এ উন্নয়ন খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

খ্রিষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকে জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্র হিসেবে ইরানে ফারস ও শিরাজ অঞ্চলের অভ্যুদয় ঘটে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার বিস্তৃতি তখন তুরস্কের কৌনিয়া নামক অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ছিলো। এ সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি হলেন মুসলিহুদ্দিন আব্দুল্লাহ শিরাজি সাদি (১২১০-১২৯১খ্রি.) যিনি শেখ সাদি নামে সমধিক পরিচিত। এ সময়ের আরেকজন বিখ্যাত ফারসি কবি হলেন মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.)। তাঁরা তাঁদের রচনায় কেবল ফারসি ভাষার প্রাঞ্জলতা সৃষ্টি করেননি; বরং ভাষার বিশুদ্ধতা ও আরবি শব্দ ব্যবহারেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। গজল রচনার বিশেষ কারিগর হিসেবে কবি শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি শিক্ষামূলক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সমাজকে পরিচিত করে তোলেন। আর মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ছিলেন অধ্যাত্মবাদের কালজয়ী দিকনির্দেশক। তাই এ যুগের রচনাগুলোকে চারিত্রিক উন্নয়ন এবং সমাজ বিনির্মাণের মাইল ফলক হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষাচর্চার ক্রমবিকাশ

তেরোশ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের অবস্থা ছিলো বিশৃংখল ও গোলযোগপূর্ণ। বিশেষত ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খান ইরানে হামলা করে এবং একই বছরে বোখারা ও খোরাসানে আক্রমণ করে সাহিত্য ও জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দেয়। বোখারা থেকে শুরু করে হামেদান পর্যন্ত গোটা অঞ্চল চেঙ্গিস খানের সৈন্যবাহিনীর লুটতরাজ ও আক্রমণের ময়দানে পরিণত হয়। এ কারণে ইরানের কবি-সাহিত্যিক ও মনীষীগণ ভারত ও এশিয়া মাইনোরের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করেন।

মোঙ্গলদের আধিপত্যের কারণে কিছু সংখ্যক ইরানি কবি ভারতবর্ষকে নিজেদের আবাস স্থল হিসেবে বেছে নেন এবং ভারতবর্ষে অবস্থান করে ফারসি সাহিত্যে অনন্য অবদান রাখেন। ইরানি কবি-সাহিত্যিকদের দেখা-দেখি অন্যান্য অঞ্চল থেকেও কবি-সাহিত্যিকগণ ভারতবর্ষে পাড়ি জমান। ফলে ফারসি সাহিত্যচর্চায় এ অঞ্চল এতো দীপ্তিমান হয়ে উঠে যে, এ অঞ্চলের কতিপয় কবিকে শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) ও হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর ন্যায় কবিদের সাথে তুলনা করা হতো। এ সকল কবির মধ্যে আমির খসরু[৯] (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) ছিলেন অনন্য। বলা হয়ে থাকে, তিনিই সর্বপ্রথম রিখতি[১০] তথা উর্দু মিশ্রিত ফারসি কবিতা রচনা করেন। গজল রচনায় শব্দ চয়ন ও মিষ্টি ভাষা ব্যবহারের কারণে তাঁকে উপমহাদেশের শেখ সাদি নামে ভূষিত করা হয়। (তামীমদারী , ২০০৭: ৫৫)

---

৯ কবি আমি খসরুর পুরো নাম আবুল হাসান ইয়ামিনুদ্দিন খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.)। তিনি ফারসি ও উর্দু উভয় ভাষাতেই কাব্য চর্চা করেছেন। তিনি ছিলেন রিখতি তথা ফারসি মিশ্রিত উর্দু কবিতা রচনার জনক। তিনি বিখ্যাত সুফি নিজামুদ্দিন আওলিয়ার একজন শিষ্য। কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি সঙ্গীতচর্চাও করেছেন। তাঁকে কাওয়ালি সঙ্গীতের জনক বলা হয়। তাঁকে তুতিয়ে হিন্দ বা ভারতের তোঁতাপাখি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। *মাতলাউল আনওয়ার* (مطلع الانوار), *শিরিন ওয়া খসরু* (شیرین و خسرو), *মাজনুন ওয়া লাইলি* (مجنون و لیلی), *হাশত্ বেহেশ্ত* (هشت بهشت) ইত্যাদি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ৩৮৪)

১০ উর্দু ভাষায় রিখতা (ریحتہ), রিখতি (ریحتی) শব্দ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। রিখতা (ریحتہ) উর্দু ভাষার প্রাচীন নাম। আবার রিখতি (ریحتی) হলো ফারসি পঙক্তি মিশ্রিত উর্দু কবিতা। কখনো কখনো রিখতি (ریحتی) শব্দটি নারী বিষয়ক অশ্লিল কবিতাকেও বোঝায়।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গলদের অধীনে থাকা ইরানের রাজ্যগুলো ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হয়। এ সময় স্টাইল বা বর্ণনার আঙ্গিক, দর্শন ও শিল্পচর্চায় ইরানে ফারসি সাহিত্য একটি ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছিলো। কথিত আছে যে, এ যুগে অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের মাঝে সৃষ্টিশীলতার ঘাটতি দেখা দিয়ে ছিলো। শিল্প ও সাহিত্যে পূর্ববর্তীদের অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া তাদের কোনো গত্যান্তর ছিলো না। কিন্তু চৌদ্দশ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি সাহিত্য আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে তৈমুর লং ইরানের অধিকাংশ শহর দখল করে নেন। পরবর্তীকালে তৈমর পুত্র শাহরুখ ইরানের শিল্প ও সাহিত্যের উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

তৈমুর পুত্র ইরানের হেরাত নামক অঞ্চলে চিত্রকর্ম ও ইসলামি শিল্পকলা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তৈমুরের বংশধরদের হেরাত অঞ্চলের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকার কারণে এ সময় হেরাতের সাথে খোরাসানের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প ও সাহিত্যে এ অঞ্চলের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। তৈমুর বংশধরদের সহযোগিতায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

এ যুগের ফারসি কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অতি সহজ-সরল পন্থায় মনের ভাব ব্যক্তকরণ। এ যুগে ফারসি সাহিত্য রাজ দরবার থেকে বের হয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রবেশ করে। জ্ঞান-গরিমার ভাষা হিসেবে ফারসি ভাষা তখন ভারতবাসীর কাছেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। ভারতবর্ষের রাজ দরবারগুলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসে। শান্তি ও নিরাপত্তার আশায় যে সকল ফারসি কবি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তারা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়ে সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেন এবং খ্যাতি লাভ করেন। এ সকল কবির মধ্যে অন্যতম হলেন বদরুদ্দিন চাচী, শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া, সায়্যিদ সিরাজ সাগজি প্রমুখ। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে এভাবেই খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

তৈমুরীয়দের যুগে ফারসি গদ্য সাহিত্যেরও প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। পূর্ববর্তী শতাব্দীতে ইরানে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার জন্য কেবল আরবি ভাষাই একমাত্র উপযোগী মনে করা হতো। পনেরোশ খ্রিষ্টাব্দে এ ধারণায় পরিবর্তন আসে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি ফারসি ভাষায় রচিত হতে আরম্ভ হয়। এই শতকে ইতিহাস রচনার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এ যুগে বাবা ফাগানি[১১] রচিত কবিতা ফারসি সাহিত্যে এক নুতন স্টাইল নিয়ে আসে। বাবা ফাগানি 'সাবকে ওকু' (سبک وقوع) তথা তাৎক্ষণিক সংঘটিত হওয়া স্টাইলের অগ্রপথিক ছিলেন। এ সময় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য হেরাত-খোরাসান থেকে নিয়ে আজারবাইজান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ড. তামীমদারীর মতে এ সময় ফারসি ভাষায় উল্লেখ করার মতো প্রায় নয়শজন কবির আবির্ভাব হয়। (তামীমদারী, ২০০৭: ৬০)

খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর থেকেই জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) আর শেখ সাদির (১২১০-১২৯১খ্রি.) কাব্যপ্রতিভার প্রভাবে ফারসি সাহিত্যে মরমি কবিতা রচনার যে ব্যাপকতা শুরু হয়েছিলো তা

১১ পুরো নাম বাবাফাগনি শিরাজি। বাবা ফাগানি শিরাজি হযরত আলি রা. সম্পর্কে অনেক প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেছেন। বাবা ফাগানি শিরাজি ইরানের শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনী সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে মৃত্যুবরণ করেন। (পাল, ১৯৬২ : ১৬২)

কবি হাফিজ ও জামি[১২] (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.)-এর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এ সময় মোগল ও তৈমুরীয়দের অত্যাচার সাধারণ মানুষদের সংসারের প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দেয়। সুদূর ইরান থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের আত্মিক শান্তির অবলম্বন ছিলো রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.), হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) আর জামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.)-এর কবিতা। এ কবিতার প্রভাবে অনেকে এ সময় নির্জনে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করেছেন। চৌদ্দশ খ্রিষ্টাব্দে রচিত মোল্লা জামির (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.) কবিতা এ ক্ষেত্রে অনন্য। তাঁকে প্রাচীন কবিদের কবিতার সমন্বয়কারী বলা যায়। তিনি গজল ও কাসিদা রচনায় খাকানি (১১২০-১১৯৯ খ্রি.) ও শেখ সাদিকে (১২১০-১২৯১ খ্রি.) এবং মাসনাভি রচনায় ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) ও নিজামি (মৃত্যু, ১২০৩ খ্রি.)-এর রচনাশৈলীর অনুসরণ করেছেন। তবে জামির (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.) গজলে কবি হাফিজের রচনাশৈলীর (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) প্রভাবও সমান্তরালভাবে পরিলক্ষিত হয়। (তামীমদারী, ২০০৭: ৫৯)

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ছিলো মূলত সাবকে হিন্দি তথা ভারতীয় স্টাইলের সূচনাপর্ব। এ স্টাইলটি পরবর্তীকালে ফারসি অঞ্চলগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইরানে সাফাভি সাম্রাজ্য[১৩] ক্ষমতায় আরোহণ করে। তারা শিল্প, সাহিত্য ও চারুকলায় ইরানে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করে। এ যুগে ফারসি সাহিত্যে বিপুল পরিমাণে গজল ও মারসিয়া (শোকগাথা কাব্য) রচিত হয়। প্রেমাস্পদের অনর্থক প্রশংসা, বস্তুবাদী ইতিহাস ও ধাঁধা ছিলো গজলের উপজীব্য বিষয়। সাফাভি শাসকগণ যেহেতু শিয়া মতবাদের অনুসারী ছিলেন সে কারণে এ যুগের ফারসি সাহিত্যে মারসিয়া তথা শোকগাথা কবিতায় আহলে বাইতের প্রশংসা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা, কারবালার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়াবলি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সাফাভি সাম্রাজ্যের সমকালীন যুগে এশিয়া মাইনরে অটোম্যানদের শাসন এবং ভারতে মোগলদের শাসন চলছিলো। ইরানে এ সময় বিভিন্ন দল ও গোত্রের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয় । বিশেষ করে উজবেক ও অটোম্যানদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধে সাফাভি শাসকগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে দেশের সাধারণ জনগণ ও কবি-সাহিত্যিকগণ নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেন। ফলে তারা ভারতবর্ষে পাড়ি জমান। এ অঞ্চলের ফারসি সাহিত্য সাবকে হিন্দি বা ভারতীয় রচনাশৈলীতে রচিত হতো। এ রীতিতে কবিগণ শব্দের কাঠামো বিনির্মাণে জটিল কলাকৌশল অবলম্বন করতেন। ফলে এ যুগের কাব্যচর্চার সাথে পূর্ববর্তীযুগের কাব্যচর্চার একটি মৌলিক তফাৎ লক্ষ করা যায়। এ যুগের কবিগণ প্রশংসা বা স্তুতিমূলক কাব্যচর্চা থেকে খানিকটা দুরে অবস্থান করে গজল রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। এ সময় আপন পির ও ধর্মীয় নেতাদের প্রশংসায়

---

১২ পুরো নাম মাওলানা নুরুদ্দিন আবদুর রহমান আল জামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.)। তিনি একজন ফারসি কবি ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ নাম হলো জামি বা মোল্লা জামি। তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থসমূহ হলো *হাফতে আওরাঙ্গ* (هفت اورنگ), *তোহফা আল আহরার*(تحفة الاحرار), *লাইলি ওয়া মাজনুন* (ليلى و مجنون) ইত্যাদি। (পাল, ১৯৫৪: ১৩২)

১৩ মুসলমানদের পারস্য বিজয় পরবর্তী অন্যতম সাম্রাজ্য, যাদের দ্বারা ১৫০১ থেকে ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরান শাসিত হয়ে ছিলো। সাফাভীয় শাসকগণ শিয়া সম্প্রদায়ের ইসনা আশারিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (পাল, ১৯৫৪: ১৩৩)

কাসিদাসমূহ রচনা করা হতো; অনেক সময় তাদের কবিতায় তৎকালীণ রাজা-বাদশাহদের স্তুতি প্রকাশ করতে কতিপয় কবিকে দেখা যায়।

এ যুগের ফারসি গদ্য সাহিত্যও জটিল এবং কৃত্রিম আলংকারিক বাহুল্য ছিলো। খ্রিষ্টীয় ষোলো শতাব্দীতে ফারসি সাহিত্য খোরাসান, হেরাত, ভারত, ইসফাহান ও অটোম্যান সাম্রাজ্যসহ প্রায় অর্ধ-পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ফারসি সাহিত্যের দর্শন আর মারসিয়া শোকগাথাগুলো সাধারণ জনগণ সাদরে গ্রহণ করে নেয়। এ যুগের অন্যতম কবি হলেন মুহতাশেম কাশানী (মৃত্যু, ১৫৮৭ খ্রি.)। তিনি স্বীয় মারসিয়াকাব্যে আহলে বাইতের গৌরবময় কীর্তি এবং কারবালার দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ শতাব্দীতে ভারতীয় অঞ্চলেও বেশ কিছু কবি-সাহিত্যিক ফারসি সাহিত্য চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উরফি শিরাজি (মৃত্যু, ১৫৯০ খ্রি.), নজিরি নিশাপুরি, ও গাজালি মাশহাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইরানে সাফাভিগণ শিয়া মতাদর্শ প্রচারে গোঁড়াপন্থি হয়ে উঠেন। যে কারণে তারা শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি একেবারে মনোযোগ দেননি। ফলে শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ ভারত, অটোম্যান সাম্রাজ্য, এশিয়া মাইনর ও ইসফাহান অঞ্চলে পাড়ি জমান। এ অঞ্চলগুলোর শাসকগণ তখন আলেম-উলামা, শিল্পী ও কবি-সাহিত্যিকদের সাদরে গ্রহণ করেন। ভারতীয় অঞ্চল তখন ফারসি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, এ যুগে কবিদের রচনাশৈলীর ধরন ছিলো সাবকে হিন্দি বা ভারতীয় রচনাশৈলী। ড. তামীমদারীর মতে এ যুগের কবিগণ জটিল ও কাল্পনিক বিষয়সমূহ উপস্থাপন, বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার ও বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে এক ধরণের অস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করাকে শ্রেষ্ঠতর সাহিত্য বলে মনে করতেন। (তামীমদারী, ২০০৭: ৬৩)

খিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফারসি ভাষায় হামাসে (حماسه) বা বীরত্বগাথা সাহিত্যের ধারা সূচিত হয়। এ হামাসে বা বীরত্বগাথা সাহিত্য সাধারণত ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিলো। কবিগণ এ বীরত্বগাথা হামাসে রচনায় ফেরদৌসির *শাহনামে* (شاه نامه) অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। এ শতাব্দীতে বর্ণনামূলক সাহিত্যেও পরিবর্তন আসে। পূর্বে বর্ণনামূলক সাহিত্যে গল্পের মূল উপাদান ছিলো নিজামি গাঞ্জাভির[১৪] (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.) কাব্য সমগ্র। এ শতাব্দীতে বর্ণনামূলক সাহিত্যে প্রাঞ্জল ও সরল ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। ফায়েজি ফাঈয়াজি (মৃত্যু, ১৫৯৫ খ্রি.), হাকিম শিফায়ি (মৃত্যু, ১৬২৭ খ্রি) ও নাজেম হারাভি (মৃত্যু, ১৬৭০ খ্রি.) প্রমুখ বর্ণনামূলক রচনা ও গল্পসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

এ শতব্দীতে *সাকি নামে* রচনার মধ্য দিয়ে আদাবিয়াতে গানায়ি বা গীতিধর্মী সাহিত্য পুনরায় উৎকর্ষতা লাভ করে। গীতিধর্মী সাহিত্যের সূচনা হয় ষষ্ঠদশ শতকে। এ শতাব্দীতে *সাকি নামে* কাব্যপ্রতিভার মূল

১৪ কবি নিজামির পুরো নাম শেখ নিজামুদ্দিন আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ। ফারসি সাহিত্যে তিনি নিজামি গাঞ্জাভি নামে বেশি পরিচিত। তিনি প্রাচীন ইরানের গাঞ্জ শহরে ১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফারসি সাহিত্যে তাঁর অবদান কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে। তাঁর বিখ্যাত মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *মাখজানুল আসরার* (مخزن الاسرار), *ইসকান্দর নামে* (اسکندرنامه) ও *হাফত পেইকার* (هفت پیکر)। তিনি ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (তামীমদারী, ২০০৭: ৮৬)

উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। *সাকি নামে* নামক গীতিধর্মী কবিতায় কবিগণের ভাবনা ও কল্পনা ছিলো একেবারে নতুন এবং আলোচ্য বিষয় ছিলো অধ্যাত্মবাদের চেতনায় পরিপূর্ণ। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব এবং মানব সভ্যতায় দুঃখের মূল বিষয়গুলো এখানে খোলাখুলি আলোচিত হয়েছে। এ সময় ফারসি সাহিত্যে বিদ্রুপাত্মক কবিতারও বিকাশ ঘটে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষেও ফারসি সাহিত্য ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। কবি সায়েব তাবরিজি[১৫](১৫৯৩-১৬৬৯ খ্রি.) ভারতে তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটান। তিনি ভারতীয় দরবার থেকে প্রাপ্ত উপহার-উপঢৌকন ও ভালোবাসা লাভে ধন্য হন। যদিও পরবর্তীকালে তিনি স্বীয়-মাতৃভূমি ইস্ফাহানে ফিরে যান এবং ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। মোট কথা, সায়েব (১৫৯৩-১৬৬৯ খ্রি.) একটি নতুন সাহিত্যশৈলীর বিকাশ সাধন করেছেন যা ফারসি সাহিত্যে 'সাবকে হিন্দি' (سبک هندی) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অল্প শব্দে অধিক অর্থ তুলে ধরা, সূক্ষ্ম চিন্তা-দর্শন, কোনো একটি বিষয়বস্তুর বিশদ ব্যাখ্যা প্রদানসহ সাবকে হিন্দির বৈশিষ্ট্যাবলি সায়েবের (১৫৯৩-১৬৬৯ খ্রি.) কাব্যে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবিগণের মধ্যে তালিব আমুলি[১৬] (মৃত্যু ১৬২৬ খ্রি.) ও আব্দুল কাদের বেদিল[১৭] (জন্ম, ১৬৪২ খ্রি.) ছিলেন অন্যতম। আব্দুল কাদের বেদিল (জন্ম, ১৬৪২ খ্রি.) কাল্পনিক বিষয়গুলোকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে। এ কারণে তাঁকে ভারতীয় রচনাশৈলী ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত বলে মনে করা হয়। এ সময় কামরূপ, মধুমালতি, কমলতা নামক অনেকগুলো মাসনাভি হিন্দি ও উর্দু ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে রোমান্টিক সাহিত্যরীতির ক্ষেত্রে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্য দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। (শাফাক, ১৩৫২ সৌ.: ৫৮৪)

ফারসি অভিধান রচনা

এ সময় ভারতবর্ষে অনেকগুলো অভিধান বা শব্দকোষ রচিত হয়। জামালুদ্দিন ইনজু রচিত *ফারহাঙ্গে জাহাঙ্গিরি* এবং ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ হুসাইন তাবরিজি রচিত প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ *বুরহানে কাতে* (রচনাকাল, ১৬৫১ খ্রি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে উর্দু ভাষার উপর ফারসি সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাবও পড়ে। বিশেষভাবে শর্তব্য যে, এ সময় ফারসি কাব্যের অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই উর্দু সাহিত্য ভারতীয় পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

---

১৫ পুরো নাম মুহাম্মদ আলি সায়েব তাবরিজি (১৫৯৩-১৬৬৯ খ্রি.)। পিতা মির্জা আব্দুর রহিম। তিনি একজন ফারসি কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় সুফি চিন্তাধারা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কবিতার মূল বক্তব্য হলো আধ্যাত্মিক জীবনই মানুষের চরম ও পরম আদর্শ। জীবনের তাগিদে তিনি কিছুকাল ভারতে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর কবিতায় ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইস্ফাহানে মৃত্যুবরণ করেন। (পাল, ১৯৫৪: ১৫৯)

১৬ কবি তালিব আমুলি ছিলেন একজন বিখ্যাত ফারসি কবি। কবিতা ছাড়াও তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ছিলেন। (পাল, ১৯৫৪: ১৬৪)

১৭ মাওলানা আবুল মাআনি মির্জা আব্দুল কাদের বেদিল দেহলাভি। ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সুফি এবং মরমি কবি। আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) পর উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়মাপের ফারসি কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ৪৭১)

সাবকে বাজেগাশত বা পুণপ্রতিষ্ঠার যুগ

সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ইরানে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃংখলা দেখা দেয়। ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। নাদের শাহ আফশারের হাতে সাফাভি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। নাদের শাহ ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে শাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ভারতবর্ষেও বারবার আক্রমণ করেন। অবশেষে ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হলে ইরান ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক বিশৃংখলার মাঝে পতিত হয়। এর যথেষ্ট প্রভাব ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর পড়ে। ফলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে অনেকটা অগ্রগতির ধারা ব্যহত হয়। এক পর্যায়ে নাদের শাহের পারিষদবর্গের মধ্যে অন্যতম কারিম খান জান্দ ক্ষমতায় সমাসীন হন এবং ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জান্দ রাজবংশের হাতে ইরানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুঞ্জিভূত থাকে। নাদের শাহের শাসনামলে ইরানে যে বিশৃংখলা চলছিলো তা জান্দদের ক্ষতায় সমাসীন হওয়ার মধ্য দিয়ে অনেকখানি প্রশমিত হয়। জান্দদের শাসন কালে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময় ফারসি সাহিত্যের রচনাশৈলীতে বাজেগাশত নামে এক নতুন রচনাশৈলীর সৃষ্টি হয়। এই রচনাশৈলী ফারসি সাহিত্যের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

এ সময় ফারসিভাষী কবি-সাহিত্যিকগণের লেখায় দু'ধরনের রচনাশৈলী অনুসরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একদল কবি ইরানের প্রথম যুগের কবি-সাহিত্যিকদের অনুসরণ করে সাবকে ইরাকি বা ইরাকি রচনাশৈলীর অনুসরণ করেছেন। আরেকটিদল সাবকে হিন্দি বা ভারতীয় রচনাশৈলীর অনুসরণ করেছেন। রচনাশৈলীর এ সংস্কার আন্দোলনে আঞ্জুমানে আদাবিয়ে ইস্ফাহান অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। এরপর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় 'আঞ্জুমানে দোভামে আদাবি' (দ্বিতীয় সাহিত্য সংস্থা) এবং সর্বশেষ 'আঞ্জুমানে খাকান' নামক সংস্থার মাধ্যমে এ সংস্কার প্রায় দু'শো বছর পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিগণের মধ্যে ফতেহ আলি খান সাবা (মৃত্যু, ১৮২২ খ্রি.), ভেসাল শিরাজি (মৃত্যু, ১৮৪৫ খ্রি.), শাতের আব্বাসি সুবহি (মৃত্যু, ১৮৯৭ খ্রি.) ও ফাতহুল্লাহ খান শাইবানি (মৃত্যু, ১৯০০ খ্রি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ তথা বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব সাহিত্যে আমূল পরিবর্তন আসে। গোটা বিশ্বে সাহিত্যচর্চা বলতে কেবল আত্মজীবন মূলক সাহিত্যচর্চা, প্রেম-ভালোবাসা ও আত্মশুদ্ধির ধারণা সম্পর্কিত সাহিত্য বুঝাতো তা থেকে সরে গিয়ে বাস্তবতার সাহিত্যচর্চা হয়। সমাজ পরিবর্তনের দিক-নির্দেশনা, আইন, স্বাধীনতা, সমতা রক্ষা, সভ্যতা, নারী স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগরণ সৃষ্টিসহ বহু নান্দনিক বিষয়াদি এ সাহিত্যে স্থান পায়। এর ফলে সাহিত্যে বাস্তবতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময়কার সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বর্ণনামূলক সাহিত্যচর্চা।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের মতো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যেও বর্ণনামূলক গদ্য সাহিত্যের প্রভাব পড়ে। ফলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। এ বর্ণনামূলক গদ্য সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সমকালীন সামাজিক অবস্থা এবং ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরা। অপর দিকে ইউরোপে বর্ণনামূলক সাহিত্যের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় তাদের দেখা-দেখি গোটা বিশ্বে তখন বর্ণনামূলক সাহিত্যচর্চার সমাদর বাড়ে। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে তখন ফারসি সাহিত্যে উপন্যাস

রচনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সূচনাপর্বে ফারসি উপন্যাসগুলো ছিলো সমালোচনামূলক, আবেগপ্রবণ এবং প্রেম বিষয়ক। এ উপন্যাসগুলো মূলত ইউরোপীয় সাহিত্যের অনকুরণে রচিত হয়েছিলো। এ সময় *শাহনামে* (شاه نامه)-এর মতো ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থের উপর নির্ভর করে ইতিহাস ভিত্তিক কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছিলো। ক্রমান্বয়ে বর্ণনামূলক এ কথাসাহিত্যের ধারা ইরানে সমাদৃত হতে থাকে। সৃষ্টি হয় ছোটগল্প, নানা বিষয়ের উপন্যাস, নাটকসহ নানা আঙ্গিকের সাহিত্য ধারা।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ইরানে ইউরোপীয় গ্রন্থ অনুবাদের প্রবণতা দেখা যায়। মূলত স্বৈরশাসক রেজা শাহের যুগে কবি-সাহিত্যিকগণ নিজেদের নিরাপত্তা বিবেচনায় যা লিখতে পারতেন না; অনুবাদ সাহিত্যে তাই প্রকাশ করার প্রয়াস চালাতেন। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরানী বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ফারসি সাহিত্য ও ইরানি সাস্কৃতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে ইসলামি অনুশাসনকে সামনে রেখে রচিত হয় ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস ও বিভিন্ন উপদেশমূলক চলচ্চিত্র। বলা যায় যে, এ সময় থেকে ফারসি কথাসাহিত্য একটি নতুন পথে যাত্রা শুরু করে যার ধারা এখনো বিরাজমান।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত কবি হলেন নিমা ইউশিজ। তিনি ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের মাজন্দোরান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফারসি কাব্যে মুক্তছন্দের প্রচলন ঘটান। নিমা ইউশিজ ফারসি কাব্যজগতে যে নব্য ধারা সৃষ্টি করেছেন তাতে পরবর্তীকালের কবিগণ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বর্তমানে এ কাব্য ধারাটি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ ধারা।

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সখ্য ও সখিত্বভাব অতিপ্রাচীন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনরূপ আভেস্তা এবং উর্দু ভাষার প্রাচীন রূপ বেদের যুগ থেকে মূলত এ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত জনগণের ভাবনার আদান-প্রদান চলে ইরান থেকে ভারতে আর ভারত থেকে ইরানে। ভাষাবিজ্ঞানীগণ ফারসি ভাষার আদিরূপ আভেস্তা এবং উর্দু ভাষার আদিরূপ বেদের বর্ণমালা ও আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সামাঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন। তবে সরকারি হিসাব-নিকাশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের এক চেটিয়া প্রভাব ভারতীয় ভাষাগুলোতে শুরু হয় সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) যুগ থেকে। এক পর্যায়ে গাজনাভির বাদশাহগণ গাজানাভি থেকে মুলতান পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা দখল করে নেন। তারপর পাঞ্জাব এলাকা এক সময় উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার মূলকেন্দ্রে পরিণত হয়। (আবেদি, ১৯৮৪: ২)

উর্দু এ উপমহাদেশীয় একটি ভাষা। উপমহাদেশের সর্বজন গ্রহণীয় ভাষা। এটি মনের ভাব আদান-প্রদানে অত্যন্ত সাবলীল। হিন্দুস্তানী বা ভারতীয় এ ভাষাটি ইরানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। মোগল শাসনামলের সমাপ্তি ও ইংরেজ শাসনামলের প্রথম যুগে উর্দুই ছিলো গোটা ভারতে যোগসূত্র স্থাপনের একমাত্র ভাষা। মোগলদের দরবারে ফারসি ভাষার প্রচলন থাকলেও তখন উর্দুই ছিলো আমজনতার অন্যতম ভাষা। (পাল, ১৯৬২: ভূমিকা)

ইসলাম ধর্মের সাথে ভারতের সম্পর্ক

এক ভাষার উপর অন্যভাষার প্রভাব মানব ইতিহাসে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। তবে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে এ প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও রাষ্ট্র থেকে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তারা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে মদিনায় এসে পাড়ি জমান। ফলে আরবি ভাষা দ্বারা তারা প্রভাবিত হন। এ ক্ষেত্রে রাসুল (সা.)-এর অনেক সাহাবির কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন হযরত সালমান ফারসি ইরান থেকে, সুহায়েব রুমি তুরস্ক থেকে, বেলাল ইথিওপিয়া থেকে এবং মারিয়া কিবতিয়া মিসর থেকে মদিনায় আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, ভারতের অধিবাসী জাট জাতির এক কৃষক নবি পত্নী হযরত আয়েশা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চিকিৎসা করেন। (ভাট্টি, ১৯৯০: ২০-২১) ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর খাওলা বিনতে হানাফিয়্যা নামক একজন স্ত্রী ভারতের সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। (ভাট্টি, ১৯৯০: ২৭) তাই বোঝা যায় আরবদের সাথে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

ভাষার উপর ধর্মের প্রভাব

কখনো কখনো ভাষা ধর্মের কারণে সকলের কাছে সমাদৃত হয়ে উঠে। এর প্রভাবে অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষা তার নিজস্বতা হারায়। কারো কারো মতে ইসলাম ধর্ম আসার পর উর্দু ,ফারসি ও তুর্কিভাষার অবস্থা অনেকটা এমনই হয়েছে। পারস্যের পাহলাভি ভাষা আরবি ভাষার প্রভাবে হয়েছে ফারসি, রোমান ভাষা হয়েছে তুর্কি আর সংস্কৃতি ভাষা ফারসি ভাষার প্রভাবে হয়েছে উর্দু। (ফারুকি, ১৯৮৬: ২৩৫) তবে এটিও সত্য যে, ইসলাম কোনো কৃষ্টি-কালচারকে মূলোৎপাটন করতে চায়না। কিন্তু মুসলিম সৈন্যবাহিনীতে যেহেতু ইরান, মিসর, রোমান এবং ভারতীয় লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তারা সকলেই আরবি ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এ প্রভাব তাদের আঞ্চলিক ভাষায় বিস্তার লাভ করে ।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার উপর ইসলাম ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। ইসলামের প্রথম যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ মদিনায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং আরবি ভাষার প্রভাব নিয়ে স্বীয় জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী মদিনার পরিবর্তে যখন কুফা নির্ধারিত হয় তখন গ্রন্থ ছিলো কেবল একটি তথা আল কুরআন। কিন্তু ইসলামধর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি এতোটাই উদ্বুদ্ধ করে যে, রাজধানী কুফা জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার শহরে পরিণত হয়। এমনকি বলা হয় যে, তৎকালে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখতেই ইসলামি পণ্ডিতগণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

জ্ঞানের উন্নয়ন ভাষার উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এ সময় ভাষার উন্নয়ন হয় চোখে পড়ার মতো। আরবি ভাষা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকল ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তীদেশ ইরানের পাহলাভি ভাষা তার বর্ণমালা পরিত্যাগ করে আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করে। (জায়দান, ১৯৬৪: ১২) কিন্তু ইরানের মাটি ও অধিবাসী নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্যের ব্যাপারে বড় সচেতন ছিলো। ইসলামের প্রথম যুগে তারা আরব্য কৃষ্টি-কালচারে প্রভাবিত হলেও পরবর্তীকালে নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্যের ব্যাপারে তারা সজাগ হয় এবং নিজেদের কৃষ্টি-কালচার গোটা বিশ্বে প্রচার ও প্রসারে প্রয়াস চালায়।

ইসলামি রাষ্ট্রের বিশাল সৈন্যবাহিনীতেও এ উপমহাদেশের অধিবাসীদের অংশগ্রহণ সর্বজনবিদিত। সুদূর মুলতান থেকে বিহার পর্যন্ত এ বিস্তৃত এলাকার অধিবাসীদের সাথে ইরানি আর্যদের পূর্ব থেকেই ব্যবসায়িক লেন-দেন ও আসা-যাওয়া ছিলো। ফলে ইরানি আর্যদের ভাষা ও সাংস্কৃতির প্রভাব এ উপমহাদেশের ভাষা ও সাংস্কৃতিকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে তোলে। (বালাজুরি, ১৩৫১ সৌ.: ২২৮-২৩৮)

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের আদি বাসস্থান

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী লোকদের আদি বাসস্থান ছিলো পূর্ব-ইউরোপ। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা ইউরোপীয় ভাষা এবং আর্যভাষা। এক পর্যায়ে আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীর একটি দল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরপূর্বে মধ্যএশিয়া, এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ায় (Mesopotamia) এসে অবস্থান করে। কিছুকাল সেখানে অবস্থান করার পর ইন্দো-ইরানীয় আর্যগোষ্ঠী ইরানে এসে বাসস্থান গড়ে। ইন্দো-ইরানীয় আর্যগোষ্ঠী ইরানে দীর্ঘকাল অবস্থানের কারণে সেখানে একটি সভ্যতা গড়ে উঠে। এরপর ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষীগণ ক্রমশঃ ভারতের সিন্ধু ও পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতে যাত্রার কিছুকাল পরেই এ সম্মিলিত যাত্রার ভাঙ্গন শুরু হয়। (জুর, ২০১৪: ৬৬)

ইন্দো-ইরানীয় আর্যগণ ভারতে আক্রমণ করে অনার্যদের পরাজিত করে নিজেদের রাজ্যবিস্তার করতে থাকে। এর ফলে আর্যদের ভাষা ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়টিকে ঐতিহাসিকগণ বৈদিক যুগের সূচনাকাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ যুগটি ছিলো খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত। এ যুগে আর্যভাষার অস্তিত্ব হিসেবে আমরা *ঋগবেদের* বা *বেদ* গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক দেখতে পাই। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে এসে উপভাষাগুলোর কারণে বৈদিকের শিষ্টরূপ বিকৃত হতে আরম্ভ করে। এ সময় পাণিনি[১৮]সহ বৈদিক পণ্ডিতগণ ভাষার সংস্কার সাধন স্বরূপ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেন। বৈদিক ভাষার এ সংস্কাররূপকেই সংস্কৃত ভাষা বলা হয়ে থাকে। এ যুগটিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগও বলা চলে। (সেন, ২০১৮: ৮৭)

ভাষার ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ করে ভারতীয় আর্যভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ যথাক্রমে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন। যথা: (ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা বেদ ও সংস্কৃত ভাষার যুগ। (খ) মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত ও পালি ভাষার যুগ এবং (গ) অর্বাচীন বা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা। এই আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা থেকেই মূলত উর্দু-হিন্দিসহ উপমহাদেশে প্রচলিত ভাষাগুলো জন্মলাভ করেছে। (হুসাইন, ১৯৪৭: ৩৬)

১৮ পাণিনি ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় লৌহযুগের সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গান্ধার রাজ্যের পুস্কলাবতি নগরির একজন নাগরিক। মূলত পাণিনি বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চলের শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর একজন মনীষা। (সেন, ২০১৮: ৮৭)

উপমহাদেশের আদি অধিবাসী

ঐতিহাসিকভাবে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, ভারতবর্ষের আদি অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম হলো দ্রাবিড় জাতি। আর্যরা এসে দ্রাবিড়দের আক্রমণ করলে তারা পাহাড়-পর্বত আর বন-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে। গুটিকয়েক যারা বসতি এলাকায় ছিলো তাদেরকে নিম্ন শ্রেণির হিন্দু বানানো হয়। আর্যদের কৃষ্টি ও সভ্যতা এ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় আর্যভাষায় কথা বলা সাধারণ মানুষের জন্য সভ্য ও ভদ্র হওয়ার পরিচায়ক ছিলো। কালক্রমে আর্যভাষা আঞ্চলিকতার প্রভাবে বিকৃত হতে আরম্ভ করে। শুরু হয় আর্যভাষা রক্ষার আন্দোলন ও উদ্যোগ। আর্য পণ্ডিতগণ শহরে বহুল ব্যবহৃত শব্দটিকে টেকসই শব্দ হিসাবে ধার্য করে বিশেষ নিয়ম-নীতির আলোকে ভাষাকে রক্ষা করার প্রয়াস চালায়। রচিত হয় আর্যদের ধর্মগ্রন্থ *বেদ*। পরবর্তীকালে এ ভাষাটি সংস্কৃত ও টেকসালি ভাষা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (হুসাইন, ১৯৪৭: ৩৫)

পাণিনি কর্তৃক ব্যাকরণিক নিয়ম-নীতি আর পণ্ডিতব্যক্তিদের কঠোরতার কারণে সংস্কৃত ভাষা কেবল শিক্ষিতজনদের ভাষা হিসাবে পরিগণিত হয়। সাধরণ মানুষের ভাষা আঞ্চলিক দ্রাবিড় ভাষার মিশ্রণে বিকৃত হতে হতে এক পর্যায়ে উপমহাপদেশীয় ভাষাগুলো দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১.সংস্কৃত। ২. প্রাকৃত। (হুসাইন, ১৯৪৭: ৩৫)

গৌতমবুদ্ধ ও প্রাকৃত ভাষা

কালের আবর্তে সংস্কৃত ভাষা সাধারণ জনগণের জন্য দুর্বোধ্য ও বোধগম্যহীন এক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সাধারণ জনগণ প্রাকৃত ভাষায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে থাকে। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ জনসাধারণের এ ভাষাকে বিকৃত ভাষা হিসাবে অপভ্রংশ বলতেন। কিন্তু এই প্রাকৃত ভাষাটি এক সময়ে জনসাধরণের কাছে এতো সমাদৃত হলো যে, সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতগণ এ ভাষাটি সাদরে গ্রহণ করে নিলেন।

সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতগণের কঠোরতার ফলে এ সময় প্রাকৃত ভাষার ব্যাপক উন্নতি ঘটে। প্রাকৃত ভাষার বিরোধিতা করা হয়েছে যে পরিমাণে, তার উন্নয়নও হয়েছে ততো দুর্বার গতিতে। এক সময় গৌতমবুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার করেন প্রাকৃত ভাষায়। ফলে প্রাকৃত ভাষা জনসাধারণের কাছে একটি পবিত্রতম ভাষার মর্যাদা লাভ করে। গৌতমবুদ্ধ যখন প্রাকৃত ভাষায় স্বীয় ধর্মের প্রচার ও প্রসার আরম্ভ করেন, তখন তাঁর শিষ্যরা বলেছিলো, আপনার বাণী সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হলে ভালো হয়। জবাবে বুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ না করে প্রাকৃত ভাষায় লিপিব্ধ করতে আদেশ করেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে যেয়ে উর্দু ভাষার ইতিহাসবেত্তা মাসউদ হুসাইন খান[১৯] (১৯১৯-২০১০ খ্রি.) উল্লেখ করেন:

> یمیل اور اتے کیل ناموں دوبر ہمن بھائی مہاتما کے پاس آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اے بھگوان! مختلف
> ذات پات کے لوگ آپ کے بولوں کو دہرا کر ناپاک کر رہے ہیں اس لیے ہمیں حکم دیجئے کہ انہیں چھندوں (ویدک

১৯ মাসউদ হুসইন খান হলেন একজন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এমিরিটাস ছিলেন। তিনি জামিয়া মিল্লিয়া দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। (হুসাইন, ১৯৪৭:১)

سنسکرت) میں لکھدوں تاکہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جاسکے۔ مہاتما انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اے بھکشو!
بدھ کے بولوں کو سنسکرت میں ہرگز نہ لکھنا، جو ایسا کرے گا وہ میری توہین کرے گا۔

(খান, ১৯৯৪: ১৭)

[এমিল এবং উটেকিল নামক দু'ব্রাহ্মণ ভ্রাতা মহাত্মা বুদ্ধের কাছে এসে বললো: 'ভগবান, বিভিন্ন জাতের লোক আপনার বাণী উচ্চারণ করে অপবিত্র করে ফেলছে। আপনি অনুমতি দিলে তা আমরা ছন্দে তথা বেদ-সংস্কৃতি ভাষায় লিখতে চাই। যাতে আপনার বাণী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের শিকার না হয়।' বুদ্ধ অসম্মতি জানিয়ে বললেন, 'ভিক্ষু, বুদ্ধের বাণী সংস্কৃত ভাষায় কখনো লিপিবদ্ধ করোনা। যে এমনটি করবে, সে আমাকে অপমান করবে'।]

এ ভাবেই একটি দর্শন ও ধর্মমত প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হলে তা সাহিত্যরূপ লাভ করে। বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত প্রাকৃত এ ভাষাটিই পরবর্তীকালে পালি ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রাকৃত ভাষার বিবর্তন

প্রাকৃত ভাষার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ড. ইহতেশাম হুসাইন খান বলেন:

> প্রাকৃত ভাষাটিকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। ১. মাগধি প্রাকৃত– যে ভাষায় রাজা অশোক বই-পুস্তক রচনা করেছেন। ২. অর্ধমাগধি প্রাকৃত– যে ভাষায় মহাবির জৈনমতাদর্শের বই-পুস্তক লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩. পালি প্রাকৃত– এই প্রাকৃত ভাষাতেই বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হয়েছে। পালি শব্দের অর্থ হলো বইয়ের মূল টেক্সট। পরবর্তীকালে এ নামটি ভাষার পরিচয় প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। ৪. অপভ্রংশ প্রাকৃত। (ইহতেশাম হুসাইন, ১৯৪৭: ৩৬)

অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষার বিভাজন

অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. প্রাকৃত শৌরসেনি– যা গঙ্গা, যমুনা এবং পাঞ্জাব এলাকার কথ্যভাষা ছিলো। এ ভাষারই অপভ্রংশরূপ থেকেই হিন্দি ও উর্দু ভাষার সৃষ্টি। ২. মাগধি প্রাকৃত– যা মাগধ বা পূর্বভারতের কথ্যভাষা ছিলো। এই মাগধির অপভ্রংশ রূপ থেকেই আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষার সৃষ্টি। ৩. প্রাকৃত মহারাষ্ট্রী– যা দক্ষিণ ভারতের কথ্যভাষা হিসাবে গণ্য ছিলো। এ ভাষা থেকেই মারাঠি এবং সিংহলি ভাষার সৃষ্টি। ৪. পৈশাচী প্রাকৃত– এ ভাষা থেকেই ভারতীয় পশাই ও কাফের, চিতরালি, কোহেস্তানি এবং কাশ্মিরি ভাষার সৃষ্টি।

উল্লেখ্য যে, প্রাকৃত ভাষাকে প্রথমত দুভাগে ভাগ করা যায়। ১. পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাকৃত, যার থেকে উর্দু ও হিন্দি ভাষার সৃষ্টি ২. পুর্বাঞ্চলীয় প্রাকৃত, যার থেকে বাংলা, অসমি ভাষার সৃষ্টি। (শহীদুল্লাহ, ২০১৯: ১৮)

আধুনিক ভারতের ভাষাগুলো প্রাকৃত ভাষা থেকে সরাসরি সৃষ্টি হয়নি; বরং তাদের অপভ্রংশরূপ থেকে বিকশিত হয়েছে। যেমন হিন্দাভি বা হিন্দুস্তানি ভাষার অপভ্রংশরূপ হলো হিন্দি বা হিন্দাভি। আবার এ ভাষার একটি বিশেষ অপভ্রংশ রূপকেই উর্দু ভাষা বলা হয়ে থাকে। (আজাদ, ১৯৯৫: ৭২)

যুগভিত্তিক আর্য ভাষার বিভাজন

সাহিত্যের সময়কাল বিচারে আর্য ভাষাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা। এর সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শ পর্যন্ত। এটি মূলত বৈদিক সাংস্কৃতির যুগের ভাষা। এ যুগেই পাণিনি সংস্কৃত ভাষা রক্ষার্থে কিছু ব্যাকরণিক নিয়ম-নীতি তৈরি করেছিলেন। এ সময়কালকে বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃতির যুগ বলা হয়। প্রাকৃত ভাষার গণজোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই এ সময় সংস্কৃত ভাষা রক্ষা করার প্রয়াস চালানো হয়।

২. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা। এর সময়কাল হলো খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শত থেকে এক হাজার খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এটি মূলত প্রাকৃত ভাষার যুগ। এ ভাষার শেষ পর্যায়ের নাম হলো অপভ্রংশ। এ সময়ে ঠিক কতগুলো প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিলো, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কেউ কেউ আটত্রিশটি প্রাকৃত ভাষার কথা বলে থাকেন। এ গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, শৌরসেনি, মাগধি, মহারাষ্ট্রী ও পৈশাচী। (আজাদ, ১৯৯৫: ৭৫)

৩. আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা। এর সময়কাল হলো হাজার খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, আর্য ভাষার মধ্যযুগে মুসলমানগণ এ উপমহাদেশে আগমন করেন। স্বীয় ধর্ম প্রচার আর ব্যবসায়িক লেনদেনের সাথে সাথে এ সময় ভাষারও লেনদেন হয় ব্যাপকভাবে। অষ্টম শতকে ভারতবর্ষে মুসলমানদের ব্যাপকভাবে যাতায়াত শুরু হয়। এ সময় উপমহাদেশের অপ্রচলিত ভাষাগুলো আরবি ও ফারসি ভাষার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও উপকৃত হয়।

উর্দু ভাষার উৎস

উর্দু উপমহাদেশের একটি প্রসিদ্ধ সর্বজনীন ভাষা। অঞ্চল এবং যুগভেদে এ ভাষাটির নামও ছিলো একাধিক। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ ভাষাটি হিন্দুস্তানি বা সর্বভারতীয় ভাষা নামেই বেশ পরিচিত। মূলত উর্দু একটি মিশ্রভাষা। এর কথ্যরূপ ছিলো সুদূর কাবুল থেকে বিহার পর্যন্ত প্রচলিত। এটি কাশ্মির থেকে হায়দারাবাদ তথা ভারতের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের সর্বজনবোধ্য একটি ভাষা ছিলো। এ ভাষার উৎস সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

উর্দু শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ

উর্দু শব্দটি মূলত তুর্কি শব্দ। অর্থ হলো সৈন্যশিবির। ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে চেঙ্গিজ খানের আমলে উর্দু শব্দটি শাহজাদাদের অস্থায়ী নিবাস এবং সৈন্যদের অস্থায়ী তাবু অর্থে ব্যবহৃত হতো। (কাদেরি, ১৯২৯: ৭) মোগল সম্রাটগণ অনেকে তাদের রাজ দরবারে অস্থায়ী মহল বানাতেন। যেখানে দরবারের উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের যাতায়াত থাকতো। তাদের ভাষা ছিলো উচ্চ মার্গের। তাই শুরু যুগে ভাষাটির কয়েকটি নামের মাঝে জবানে উর্দুয়ে মুআল্লা (زبان اردوئے معلی) অন্যতম। সমাজের উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিবিরের ভাষা ছিলো উর্দু।

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল বলেন:

> উর্দু শব্দটি Altaic বা তুরস্কের আলতাই পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি শব্দ। শব্দটি তাঁবু, বাসস্থান, সেনানিবাস বা সেনা নায়কের বাসস্থান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভারতে তুর্কিদের আগমনের পর শব্দটি ফারসি ও উর্দুরূপ গ্রহণ করে সেনানিবাস, বাজার বা সৈন্যবর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। সম্রাট আকবরের শাসনামলে উর্দু শব্দটি মোগলসৈন্যদের শক্তিশালী সেনানিবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরপর শব্দটি দ্বারা জবানে আহলে উর্দু (زبان اہل اردو) তথা সেনানিবাসে বসবাসরত সৈন্যদের ভাষা বোঝানো হতো। ক্রমে ক্রমে উর্দু শব্দটি একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে বোঝাতে আরম্ভ করে। (পাল, ১৯৬২: ৬)

উর্দু ভাষার কয়েকটি নাম

১. রিখতা (ریختہ) অর্থাৎ মিশ্র ভাষা। হিন্দি, ফারসি ও অন্যান্য ভাষার সহযোগে এ ভাষাটির জন্ম বলে এটিকে রিখতা বা মিশ্র ভাষা বলা হয়ে থাকে।
উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি অলি, যাকে উর্দু কবিদের 'বাবা আদম' বলা হয় তিনি উর্দু ভাষাকে রিখতা নামে অবিহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন:

یہ ریختہ ولی کا جا کر اسے سنا دو　　رکھتا ہے فکر روشن جو انوری کے مانند

(অলি, ২০০৮: ১২৭)

[এটি হলো অলির উর্দু কবিতা, তাদেরকে শোনাও। ফারসি কবি আনোয়ারির মতো যা দীপ্ত চেতনার ধারক-বাহক।]

দুই বা দুইয়ের অধিক মিশ্রিত ভাষার বাক্যকে রিখতা বলে। উর্দুর প্রাচীন কবিগণ ফারসি এবং হিন্দি মিশ্রিত বাক্য ব্যবহার করতেন বলে এ ভাষাটিকে রিখতা বলে অভিহিত করা হয়। (কাদেরি, ১৯২৯: ১০)

২. খাড়িবোলি (کھڑی بولی) অর্থাৎ আম-জনসাধারণের কাছে প্রচলিত কথ্যভাষা। গঙ্গা নদীর পার ঘেষে একটি অঞ্চল হলো খাড়। এই খাড় অঞ্চলের কথ্যভাষা থেকেই উর্দু ভাষার জন্ম। (পাল, ১৯৬২: ২৫)

৩. জবানে উর্দুয়ে মুআল্লা (زبان اردو معلی) অর্থাৎ উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সুধীজন ও সৈন্যদের ভাষা। মোগল রাজমহলে সাধারণ মানুষের যাওয়া আসার অনুমতি ছিলোনা। সৈন্যদের মাঝে যারা উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন এবং যাদের রাজমহলের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো তাদের রাজমহলে ব্যবহৃত ফারসি মিশ্রিত আঞ্চলিক ভাষাকে জবানে উর্দুয়ে মুআল্লা (زبان اردو معلی) বলা হতো। ফারসি মিশ্রিত আঞ্চলিক ভাষাটিই বর্তমানে উর্দু ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে।

তবে উর্দু শব্দটির ব্যবহার আমরা মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের লেখায়ও দেখতে পাই। বাবর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম নিজেকে ভারতের সম্রাট বলে দাবি করেন। তুজুকে *বাবরি* (تزک بابری) তথা *বাবর নামা* বা *বাবর চরিত* গ্রন্থে তাঁর বিজয়ী সৈন্যদেরকে 'উর্দুয়ে নুসরাতে শিআর' (اردوئے نصرت شعار) বা বিশেষ সাহয্যকারী সৈন্যদল নামে ভূষিত করা হয়। (পাল, ১৯৬২: ৪)

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশে ফারসির প্রভাব

উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ কখন কোথায় হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ ব্যাপার। তবে উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশে ফারসি ভাষার প্রভাব রয়েছে এ কথাটি বলা চলে। এ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে সিন্ধু প্রদেশে। মুহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের পর এখানে প্রায় ৫০০ বছর মুসলমানদের রাজত্ব চলে। এ সময় অসংখ্য সুফি-সাধক ইরান ও আরব থেকে সিন্ধুতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তখন উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষা ছিলো হিন্দুস্তানি আর্য ভাষা। হিন্দুস্তানি আর্য ভাষার সাথে সুফি-সাধকদের ফারসি ও আরবি ভাষার মিশ্রণে যে ভাষার জন্ম হয় তাই মূলত উর্দু ভাষা। তৎকালে সুফি-সাধকগণের জীবনাচার ছিলো যাযাবরের মতো। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ইসলাম প্রচার করে বেড়াতেন। তাই ফারসি মিশ্রিত সুফি-সাধকদের এ ভাষাটি গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। (আব্দুল হক, ১৯৯৫: ৩)

২. কথিত আছে সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) রাজত্ব ব্যাপক বিস্তৃত ছিলো। কিন্তু মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) পুত্র মাসউদের সময় থেকে এ রাজত্ব ছোটো হতে শুরু করে। মাসউদের পুত্র মওদুদের সময়ে তারা ইরানের প্রভাবশালী গোত্র সেলজুকদের দ্বারা এতো বেশি নির্যাতিত হন যে, সুদূর ইরান ছেড়ে তারা এ উপমহাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এ সময় তাদের সাথে এ উপমহাদেশের মানুষদের বন্ধুত্বভাব ও আন্তরিকতা তৈরি হয়। সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) উত্তরসুরিদের ফারসি ভাষা এবং উপমহাদেশের মানুষের কথ্যভাষা হিন্দুস্তানির সংমিশ্রণে যে ভাষার সৃষ্টি হয় তাই মূলত উর্দু ভাষা। (পাল, ১৯৬২: ৪)

উল্লেখ্য যে, সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) বংশধর সুলতান ইব্রাহিম গাজনাভির (১০৩৩-১০৯৯ খ্রি.) রাজত্বকালে রাজদরবারের প্রসিদ্ধ ফারসি কবি মাসউদ সাআদ সালমান ও আবু আব্দুল্লাহ আননাকতি ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি মিশ্রিত হিন্দি তথা উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করেন। এ বিষয়টি সে সময়কার ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকলেও তার কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে পাওয়া যায়না। (খান, ১৯৯৪: ৭৬)

৩. *বাগে বাহার* (*باغ و بہار*)-এর লেখক মির আম্মান দেহলাভি[২০] বলেন:

২০ মির আম্মান দেহলাভি (১৭৪৭-১৮০৬ খ্রি) ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশা হুমায়ুনের শাসনামলে মোগল দরবারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। আহমদ শাহ আবদালি এবং সুরজমলজাট দিল্লি আক্রমণ করলে তিনি প্রথমে জীবিকার তাগিদে আজিমাবাদ এবং পরবর্তীকালে কোলকাতায় আসেন। মির বাহাদুর আলি হুসাইনির মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান ড. জোন গিলক্রিস্টের সাথে দেখা করেন। ড. জোন গিলক্রিষ্ট তাঁর প্রতিভার মূল্যায়নস্বরূপ আমির খসরু বিরচিত ফারসি গ্রন্থ *কিসসায়ে চাহার দরবেশ* (قصہ چہاردرویش)-এর উর্দু অনুবাদ করান। এ অনুবাদটি তৎকালে খুব প্রশংসিত হয়। *বাগেবাহার* ছাড়াও মির আম্মান রচিত *গাঞ্জে খুবি* নামে আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে মির আম্মান মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ৮৮)

جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے، تب چاروں طرف کے ملکوں سے، سب قوم قدر دانی اور فیض رسانی اس خاندان لاثانی کی سن کر حضور میں آکر جمع ہوئیں، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی۔ اس لیے اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سوداسلف، سوال جواب کرتے، ایک زبان اردو مقرر ہوئی۔

(আম্মান দেহলাভি, ১৯৪৪: ৪-৫)

[যখন বাদশাহ আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন আশপাশের রাজ্যগুলো থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক মোগলদের শৌর্য-বীর্যের কথা শুনে দিল্লিতে পাড়ি জমান। কিন্তু এ সম্প্রদায়গুলোর ভাষা ছিলো পৃথক। এ সময় পারস্পরিক লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয় এবং মত বিনিময়ের কারণে একটি মিশ্রভাষা তৈরি হয়। এ ভাষাটিই হলো উর্দু ভাষা।]

৪. স্যার সৈয়দ আহমদ খান[২১] বলেন:

'اردو کی ہیولی خلجی سلاطین کے عہد میں تیار ہو چکا تھا جبکہ اس نے زبان کی شکل شاہ جہاں کے عہد میں اختیار کی۔'

[উর্দু ভাষার অবকাঠামো খিলজিগোষ্ঠীর শাসনামলে তৈরি হয়েছিলো কিন্তু ভাষার অঙ্গ-সৌষ্ঠব বাদশাহ শাহজাহানের শাসনামলে প্রস্তুত হয়।] (আহমদ খান, (অনু): ৩)

৫. বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি মনিরুদ্দিন ইউসুফ তাঁর রচিত *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, '১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি যখন রাজধানী হওয়ার মর্যাদা পেলো তখন দিল্লি ও তার আশেপাশের অঞ্চলের প্রচলিত খাড়িবোলি ভাষা ফারসি ভাষার অবয়ব ধারণ করার ফলে যেভাষাটির সৃষ্টি হয় তাই বর্তমানের উর্দু ভাষা'। (ইউসুফ, ১৯৬৮: ১০)

কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীগণ উর্দু সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রদান করেছেন। উর্দু সাহিত্যের সূচনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে যেয়ে মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ তাঁর রচিত *আবে হায়াত* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

'اتنی بات ہر شخص جانتا ہے ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے'

[এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত যে, উর্দু ভাষা বুরুজ ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে। আর বুরুজ ভাষাটি হলো নিতান্ত ভারতীয় একটি ভাষা।] (হুসাইন আজাদ, ১৯৫০: ৬) মূলত বুরুজ ভাষাটি মহারাষ্ট্রের ভাষা। এর সাথে শৌরসেনি প্রাকৃত ভাষার রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

---

২১ পুরো নাম সৈয়দ আহমদ খান তাকাভি (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.)। তিনি একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক এবং উর্দু সাহিত্যের আধুনিকায়নের অগ্রদূত ছিলেন। তিনি মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মোহামেডান এংলো অরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন- যা পরবর্তীকালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করে। *জিলাউল কুলুব* (جلاء القلوب), *আসারুস সানাদিদ* (اثار الصنادید) ও *কালিমাতুল হক* (کلمۃ الحق) তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ১৪১)

এ উপমহাদেশে বিজয়ী বেশে আসা মুসলমানদের মাতৃভাষা ছিলো ফারসি। কিন্তু এ ফারসি ভাষায় তখন প্রচুর পরিমাণ আরবি শব্দের ব্যবহার হচ্ছিলো। ভারতীয় ভাষাগুলোর মাঝে বুরুজ ভাষা গঙ্গা-যমুনার পার ঘেষে সমগ্র ভারতে একটি প্রচলিত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিলো। এই বুরুজ ভাষাটি ফারসিভাষী মুসলমান ও তাদের সংস্কৃতির ছোঁয়ায় নতুন যে রূপ ধারণ করে তাই উর্দু ভাষা।

৬. এই বিষয়টিকে উল্লেখ করতে যেয়ে উর্দু ভাষার ইতিহাস রচনাকারী সৈয়দ হাকিম শামসুল্লাহ কাদেরি বলেন:

مسلمانوں کے اثر سے برج بھاشا میں عربی فارسی الفاظ داخل ہونے لگے جس کے باعث اس میں تغیر شروع ہوا جو زور بزور بڑھ تا گیا اور ایک عرصہ کے بعد اردو زبان کی صورت اختیار کر لی۔

(কাদেরি, ১৯২৯: ১৮)

[মুসলমানদের প্রভাবে বুরুজ (উর্দুর পূর্বরূপ) ভাষায় আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার হতে থাকে। যার ফলে বুরুজ ভাষায় পরিবর্তন আসতে থাকে। এ পরিবর্তন দিনে দিনে বেড়ে গিয়ে এক পর্যায়ে যে ভাষাটি সৃষ্টি হয় তাই মূলত উর্দু ভাষা।]

মুসলমানরা ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখল করলেও মিসর, মরক্কের মতো ভারতবর্ষে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষাকে সমূলে ধ্বংস করতে পারেনি। হিন্দু ধর্মাবলম্বি আর্যদের উন্নত সাহিত্য ও সাংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সংস্কৃতি ও ভাষার সংমিশ্রণে যে নতুন ভাষা সৃষ্টি হয় তাই উর্দু।

৭. উর্দু ভাষার ইতিহাস লেখক সৈয়দ হাকিম শামসুল্লাহ কাদেরি (১৮৮৫-১৯৫৩ খ্রি.) আরো বলেন:

مسلمان اپنی زبان کو ہندوستان میں عام نہ کر سکے۔ لیکن ہندوں کی زبان بھی ان کی عام زبان نہ ہو سکی۔ بلکہ دونوں اقوام کی زبانوں کے اختلاط سے ایک تیسری زبان وجود میں آئی جو اردو کے نام سے مشہور ہے۔

(কাদেরি, ১৯২৯:১৮)

[মুসলমানগণ নিজেদের ভাষা ভারতে ব্যাপকতর করতে ব্যর্থ হয়। আবার তারা ভারতীয় হিন্দুদের ভাষাও গ্রহণ করতে পারেনি; বরং মুসলমানদের ভাষা ফারসি ও ভারতীয়দের ভাষার সংমিশ্রণে তৃতীয় একটি ভাষার জন্ম হয়; মূলত তাই উর্দু ভাষা নামে প্রসিদ্ধ।

সিন্ধু বিজয়ের পূর্বেই পারস্য থেকে মুলতানের পথ ধরে বিহার এবং মালদা ও নিলাব এলাকা পর্যন্ত যে ভাষাটি শিক্ষিতজনদের ভাষা হিসাবে পরিচিত ছিলো; মূলত সে ভাষাটি রাজ দরবারে বেশি ব্যবহৃত হতো বলে এটিকে দরবারি ভাষা এবং সংক্ষেপে দারি ভাষা বলা হতো। এই দারি ভাষাটি মূলত ফারসি ভাষার একটি রূপ। এই দারি ভাষার প্রভাব হিন্দুস্তানি (উর্দু আদিরূপ) ভাষার উপর থাকার কারণে যে ভাষাটি সৃষ্টি হয়েছে তাই উর্দু। (শামিম, ২০১২: ৮৬)

৮. মৌলাভি আব্দুল গফুর নাসসাখ বলেন:

'زبان اردو روز مرہ شہر دہلی کو کہتے ہیں۔'

(নাসসাখ, ১৮৯০: ২-৪)

[উর্দু মূলত দিল্লি শহরের প্রচলিত ভাষা।]

এ এলাকায় বহুকাল ধরে হিন্দুস্তানি ভাষা (উর্দু ও হিন্দি ভাষার আদিরূপ) প্রচলিত ছিলো। দিল্লির অধিবাসীরা এ ভাষাতেই কথা-বার্তা ও লেনদেন করতো। সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরি (১১৪৯-১২০৬ খ্রি.) যখন দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে নেন; তখন দিল্লির প্রচলিত ভাষায় প্রাচীন আরবি, তুর্কি ও ফারসি শব্দমালা সংযোজন হতে থাকে। এরপর মুহাম্মদ বিন তুঘলুক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.) দিল্লির ক্ষমতা দখল করে শোষণ চালায়। ফলে দিল্লির অধিবাসীরা দক্ষিণ ভারতে চলে আসে। এ সময় দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষাতেও দিল্লির তথা উর্দুর প্রভাব পড়ে। এই কথিত ভাষাটিই বাদশা শাহজাহানের আমলে ফারসি বর্ণমালার মাধ্যমে আক্ষরিকরূপ লাভ করে। (নাসসাখ, ১৮৯০: ৩-৪)

মুসলমানগণ ভারতে আসার পর দীর্ঘ দিন ফারসি ভাষাকে এবং হিন্দুগণ হিন্দি ভাষাকে সংরক্ষণ করেন। বাদশাহ আকবরের শাসনামলের পূর্বে মুসলমানগণ হিন্দি ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার করতো না। কিন্তু বাদশা আকবরের শাসনামলে রাজা টোডারমল (Todermal) হিসাব কার্জের সুবিধার্থে হিন্দুদের ফারসি ভাষা শিখতে বাধ্য করলেন। এতে হিন্দি ভাষায় ফারসি শব্দের সংমিশ্রণে যে ভাষাটির জন্ম হয় তাই উর্দু ভাষা।

উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানীদের অভিমত

১.ড বিমজ তাঁর রচিত গ্রামার গ্রন্থে লিখেন:

> Urdu by origin, is a dialect of the Western Hindi spoken for centuries in the neighbourhood of Delhi and Meerut and is directly descended form Saur Senic Prakrit. This living dialect has formed the basis of Urdu, the name having been given at a later period. (Beames, 1875: 15.)

[উর্দু মূলত ঐ পশ্চিমা কথ্যহিন্দি ভাষারই একটি শাখা– যা দিল্লি, মিরাট এবং তার আশপাশের এলাকায় প্রচলিত ছিলো। এ ভাষার সরাসরি সম্পর্ক হলো শৌরসেনি প্রাকৃতের সাথে। এই কথ্যভাষাটিই মূলত উর্দুর মূল। আর এ ভাষাটির নাম উর্দু হয়েছে অনেক পরে।]

২. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ড. জন গিলক্রিষ্ট বলেন:

> Urdu started developing in north india around Delhi in about the 12th century. It was based on the language spoken in the region around Delhi. (Gilchrist, 1919: 217)
>
> [দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির আশপাশের এলাকায় উর্দু ভাষার সূচনা ও সমৃদ্ধি হয়েছে। দিল্লির আশপাশের কথ্যভাষা হলো এ ভাষাটির মূল।

১০৯৮ মতান্তরে ১১২১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে উর্দু ভাষার বর্তমানরূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। খাজা মাসউদ সাআদ সালমান (মৃত্যু, ১১২১ মতান্তরে ১১৩০ খ্রি.) হিন্দি ভাষাটিকে ফারসি বর্ণমালায় লিখার প্রয়াস চালান। এরপর বিখ্যাত ফারসি কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) রিখতা আকারে তথা ফারসি ভাষা মিশ্রিত উর্দু কবিতা রচনার প্রয়াস চালান। এরপর পঞ্চদশ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যে সাহিত্যচর্চা কালের বিবর্তনে তিনটি ধারায় বা স্টাইলে উর্দু ভাষা চর্চিত হয়। ঐতিহাসিকগণ উর্দু ভাষাকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করেন। যথা: (১) উর্দু ভাষায় দক্ষিণ ভারতীয় ধারা বা স্টাইল। (২) উর্দু ভাষার দিল্লির ধারা বা স্টাইল এবং (৩) উর্দু ভাষার লাক্ষ্ণৌর ধারা বা স্টাইল।

হিন্দাভি বা হিন্দুস্তানি ভাষা

উর্দু ভাষার আদি নাম হলো হিন্দাভি বা হিন্দুস্তানি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সূচনাতে এ ভাষাটিকে দেবনাগরি অক্ষর দিয়ে লিখা হতো। এরপর এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অবস্থানরত ধর্মপ্রচারক সুফিগণের বিভিন্ন ফারসি গ্রন্থ ও পুস্তিকায় খণ্ডিতভাবে এ ভাষাটি ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। যেমন সৈয়দ শামসুল্লাহ কাদেরি তাঁর লিখিত *উর্দুয়ে কাদিম* (*اردوئے قدیم*) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন: 'বাবা ফরিদুদ্দিন শেকারগাঞ্জ তাঁর মাতৃভাষা ফারসির সাথে সাথে কখনো কখনো হিন্দাভি বা হিন্দুস্তানি শব্দ ব্যবহার করতেন'। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে ভাইয়া বলে সম্বোধন করেছেন। আবার তাঁর এক শিষ্য তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দেহে জ্ঞানের অবস্থান কোথায়? উত্তরে বাবা বলেছিলেন, 'বিচ সারকে' (بیچ سرکے) তথা মাথার মধ্যে। (কাদেরি, ১৯২৯:২২)

হিন্দাভি ভাষাটিকে ফারসি বর্ণমালায় লেখার সূচনা সম্পর্কে ড. মাসউদ হুসাইন বলেন:

> پنجاب پر غوریوں کے حملے 1168ء سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 1193ء میں بالآخر شہاب الدین غوری دہلی کے آخری ہندو سمراٹ پرتھوی کو شکست فاش دے کر دہلی اور اجمیر قابض ہو جاتا ہے، جہاں اس کا سپہ سالار قطب الدین ایبک، اس کے انتقال کے بعد 1206ء میں سلطنت غلاماں کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ اردو کی ابتداء اور ارتقا کی اصل تاریخ اس کے بعد ہی سے شروع ہوتی ہے۔

(হুসাইন, ১৯৯৪: ৭৭,৭৮)

[মুহাম্মদ ঘুরি ১১৬৮ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ভারত আক্রোমণ শুরু করেন এবং অবশেষে ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শিহাবুদ্দিন ঘুরি দিল্লির সর্বশেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীকে পরাজিত করে দিল্লি এবং আজমির দখল করে নেন।

দিল্লিতে তাঁর প্রধান সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেকের ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর পর দাসদের শাসন শুরু হয়। উর্দু ভাষার সূচনা এবং উন্নয়ন এর পরপরই আরম্ভ হয়েছে।]

দক্ষিণ ভারতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য

বিখ্যাত ফারসি কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) দিল্লিতে অবস্থানকালে রিখতা (ফারসি বর্ণমালায় হিন্দাভি ভাষা) কাব্যচর্চা করেছিলেন। আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) রিখতাচর্চার প্রায় শত বছর পর দক্ষিণ ভারতের কবি-সাহিত্যিকদের রিখতা ধারার উর্দু সাহিত্যচর্চা করতে দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণের ধারনা মতে দিল্লির শাসক সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (শাসনকাল ১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.) নিজ রাজধানী দিল্লি থেকে দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তর করেন। তখন সম্রাটের আদেশে দিল্লির কবি-সাহিত্যিকগণ দিল্লি ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে চলে আসেন। এ সময় দক্ষিণ ভারতে উর্দুচর্চা আরম্ভ হয়। দক্ষিণ ভারতীয় উর্দু ভাষায় তদ্ভব[২২] উর্দু শব্দের প্রভাব বেশি। (পাল, ১৯৬২: ৩৫)

আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) এ কাজটি ছিলো উর্দু সাহিত্যচর্চার জন্য প্রভাতের মৃদু আলোর ন্যায়। তিনি মূলত দক্ষিণভারতের মাটি আর গন্ধ নিয়ে বেড়ে উঠা কবি-সাহিত্যিকগণকে উজ্জীবিত করে তোলেন। দক্ষিণ ভারতের শাসকগণ নিজেরাও ছিলেন উর্দু ভাষার প্রসিদ্ধ সাহিত্যকর্মী ও সংঘটক। তারা উর্দু সাহিত্যের উন্নয়নের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.), সুলতান মুহাম্মদ কুতুব শাহ (১৫৯৩-১৬২৬ খ্রি.), আব্দুল্লাহ কুতুব শাহ (১৬১৪-১৬৭২ খ্রি.), আবুল হাসান কুতুব শাহ (১৬০০-১৬৯৯ খ্রি.)সহ গোলকুণ্ডার একাধিক শাসক গজল, রুবায়ি, কাসিদা ও মারসিয়া লিখে দক্ষিণ ভারতে উর্দু সাহিত্যচর্চার গোড়াপত্তন করেন।।

এদিকে দক্ষিণ ভারতের আরেকটি রাজ্য বিজাপুরের শাসক দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদেল শাহ (১৫৫৬-১৬২৭ খ্রি.) এবং প্রথম আলি আদেল শাহও (১৫৫৮-১৫৯০ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের বড় মাপের কবি ছিলেন। এ সময় দক্ষিণ ভারতে মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.), মোল্লা নুসরাতি (মৃত্যু ১৬৮৩ খ্রি.) ও ইবনুন নাশাতি (মৃত্যু ১৬৫৫ খ্রি.)সহ অনেক কবি-সাহিত্যিক উর্দু ভাষার উন্নয়নে কাজ করেছেন। যুগচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সাহিত্যকর্মগুলো যদিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু উর্দু সাহিত্যের ক্রমবিকাশে এগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। সূচনাপর্বে তথা দক্ষিণ ভারতীয় উর্দু সাহিত্যে ফারসির চেয়ে উপমহাদেশীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলোর প্রভাব বেশি ছিলো। পরবর্তীকালে উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। (পাল, ১৯৬২: ৩৫)

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে উর্দু ভাষা

দিল্লিতে উর্দু সাহিত্যচর্চা নিরব হলেও আমরা এ সময় উত্তর ভারতের অধিবাসী কবির দাস[২৩] (১৪৪০-১৫১৫ খ্রি.) নামক একজন কবির সন্ধান পাই। যিনি তাঁর মর্মকথা এ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

---

২২ যে শব্দের মূল সংস্কৃত বা যে শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতরূপ ধারণ করেছে, তাকে তদ্ভব শব্দ বলে। বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু ভাষার শতকরা ষাটভাগ শব্দই তদ্ভব। (সেন, ২০১৮: ৮৮)

২৩ কবির দাস (১৪৪০-১৫১৫ খ্রি.) প্রাচীন ভারতীয় একজন কবি। যিনি স্বীয় যুগে হিন্দু-মুসলমানদের সম্প্রীতির কথা বলেছেন। তাঁর রচনায় জীবন ও প্রেমের কথা ফুটে উঠে। কবির দাসের (১৪৪০-১৫১৫ খ্রি.) ভাষা সহজ ও সরল। কবি মনির উদদীন ইউসুফ বলেন: 'বিখ্যাত কবি আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) পর কবির দাসকে (১৪৪০-

কবির দাস (১৪৪০-১৫১৫ খ্রি.)-এর বাণী মৌখিক পরম্পরায় প্রচারিত হয়েছে। হরেন্দ্র চন্দ্র পাল বলেন: 'কবিরের কবিতায় তৎসম শব্দ তথা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ছিলো বেশি। (পাল, ১৯৬২: ৩৭) কবির দাসের (১৪৪০-১৫১৫ খ্রি.) সাহিত্যে প্রমাণিত হয় যে, পনেরো শতকের গোড়ার দিকেই গোটা ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দাভি ভাষা ফারসি বর্ণমালায় প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। এখানে কবির দাস (১৪৪০-১৫১৫ খ্রি.)-এর রচিত কবিতার একটি নমুনা তুলে ধরা হলো:

ہمن ہے عشق مستانہ ہمن کو ہوشیاری کیا رہین آزاد یہ جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا

(ইউসুফ, ১৯৬৮: ২৪)

[আমি প্রেমের পাগল, আমার সতর্কতার কি প্রয়োজন আছে? এ জগতে আমি মুক্ত, দুনিয়ার সঙ্গে আমার বন্ধন কিসের?]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময় গোটা ভারতবর্ষেই হিন্দাভি ভাষাটিকে ফারসি বর্ণমালায় চর্চা করার একটি আবহ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং গোটা ভারতবর্ষের সে সময় অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক এ ভাষাচর্চা ও উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। (বেগ, ১৯৯৫: ৫৫)

দিল্লিতে উর্দু সাহিত্য

বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.) ১৬৮৬ ও ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করে নিলে দিল্লির অধিবাসীদের সাথে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় দিল্লির কবি-সাহিত্যিকগণ দক্ষিণ ভারতের উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের সাথে পরিচিত হন। এসময়ও দিল্লি অধিবাসীদের কথ্যভাষা ছিলো হিন্দাভি তথা উর্দু। কিন্তু এ সময় হিন্দাভি বা উর্দু ভাষায় সাহিত্য চর্চা করার কোনো আগ্রহ দিল্লিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়নি। অলি মুহাম্মদ অলি[২৪] (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ছিলেন দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত কবি। দিল্লির কাব্যচর্চার আসরগুলোতে অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) আগমনে দিল্লিবাসীর নিকট উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চার নবদিগন্তের সূচনা ঘটে। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) নির্দেশিত পথে দিল্লিবাসী উর্দু সাহিত্যচর্চা শুরু করে এবং অলিকে তারা উর্দু সাহিত্যের 'বাবা আদম' (بابائے آدم) খেতাবে ভূষিত করে। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও

১৫১৫ খ্রি.) পরিপূর্ণ হিন্দাভি (উর্দু ভাষার আদি নাম) ভাষার কবি মনে করা হয়'। তিনি আরবি-ফারসির প্রচলিত শব্দাবলি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন। কবির দাস (১৪৪০-১৫১৫ খ্রি.) ফারসির অনুকরণে হিন্দাভি ভাষায় গজলও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতাগুলোকে সুফিবাদ ও মরমিয়াবাদের কবিতা বলে গণ্য করা হয়। (ইউসুফ, ১৯৬৮: ২৪)

২৪ অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান কবি। নাম অলি মুহাম্মদ অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.)। তিনি দক্ষিণ ভারতের আওরঙ্গবাদে জন্মগ্রহণ করেন। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছুকাল তৎকালীন দীক্ষাগুরু শাহ অজিহুদ্দিনের খানকায় অবস্থান করেন। এ খানকাটি আহমাদাবাদে অবস্থিত। তিনি গজলসহ উর্দু কাব্যের প্রতিটি ধারায় কাব্যচর্চা করেছেন। ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সম্রাট আরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.) দক্ষিণ ভারত জয় লাভের সময় অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) দিল্লির কবিতার আসরগুলোতে অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেন। এ সময় দিল্লিবাসী অলিকে (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) উর্দু ভাষার 'বাবা আদম' খেতাবে ভূষিত করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ হলো *কুল্লিয়াতে অলি* (کلیات ولی)। অলির মৃত্যু সাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭ , খণ্ড ২: ৪৭২)

সাহিত্য প্রভাবিত উর্দু কাব্য চর্চায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। উর্দু সাহিত্যে এ ধারা বা রচনাশৈলীটির ব্যবহার প্রায় তিনশো বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এরপর উর্দু সাহিত্যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বেশি পড়লেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি; বরং পূর্বের ন্যায় আজও উর্দু সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব বিরাজমান রয়েছে।

উর্দু ভাষার তিনটি রচনাশৈলী

রচনাশৈলীর দিকবিচারে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের রচনাশৈলীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) দক্ষিণ ভারতীয় রচনাশৈলী। (২) দিল্লির কবি-সাহিত্যিকদের অনুসৃত রচনাশৈলী ও (৩) লাক্ষ্ণৌর কবি-সাহিত্যিকদের অনুসৃত রচনাশৈলী।

দক্ষিণ ভারতীয় রচনাশৈলীর সময়কাল উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে নিয়ে অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে আঞ্চলিক ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি ছিলো। এ সময়কার উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে নির্ধারিত কোনো বানানরীতি ছিলো না। তাই কবি-সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থে বানান-বিভ্রাট খুব বেশি পরিদৃষ্ট হয়। যদিও দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডার শাসক মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.), সুলতান মুহাম্মদ কুতুব শাহ (১৫৯৩-১৬২৬ খ্রি.), আব্দুল্লাহ কুতুব শাহ (১৬১৪-১৬৭২ খ্রি.), আবুল হাসান কুতুব শাহ (১৬০০-১৬৯৯ খ্রি.)-এর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোতে এ বানান বিভ্রাট চোখে পড়ার মতো ছিলো; কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুগটিকে উর্দু সাহিত্যচর্চার গোড়াপত্তনের যুগ বলা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের আরেকটি রাজ্য বিজাপুরের শাসক দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদেল শাহ (১৫৫৬-১৬২৭ খ্রি.) ও প্রথম আলি আদেল শাহ (১৫৫৮-১৫৯০ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.), মোল্লা নুসরাতি (মৃত্যু ১৬৮৩ খ্রি.) ও ইবনুন নাশাতি (মৃত্যু ১৬৫৫ খ্রি.) প্রমুখ উঁচু মানের কবি-সাহিত্যিক উর্দু সাহিত্যের উন্নয়নে সরব ভূমিকা পালন করেন। এ সময়কার উর্দু সাহিত্যের গুণগতমান বিশ্লেষণ করলে উর্দু সাহিত্যকে মূলত ফারসি সাহিত্যের অনুবাদই বলা যায়। তবে শব্দ চয়ন ও ভাষার গঠনে তখনো উর্দু ভাষা সংস্কৃত ভাষার অনেক কাছাকাছি ছিলো; যে কারণে সাহিত্য-সমালোচক ও ইতিহাস- বেত্তারা এ সময়ের রচনাশৈলীর বিষয়টিকে আলাদাভাবে তুলে ধরেননি।

দিল্লির কবি-সাহিত্যিকদের অনুসৃত রচনাশৈলী

দিল্লির কবি-সাহিত্যিকদের অনুসৃত রচনাশৈলী হলো উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাশৈলী। এটির সূচনা হয়ে ছিলো অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) থেকে এবং ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এ সময় উর্দু ভাষা ও সাহিত্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সবগুলো সাহিত্যরীতির অনুসরণ করেছে। ফারসি ভাষার শব্দ চয়ন, ব্যাকরণ ও শব্দগঠনে ফারসি রীতির পদাংকানুসরণ, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুপ্রাস ও সাহিত্যালংকারের ব্যবহার, অধ্যাত্মবাদচর্চা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়েছে। এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.), মির্জা রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.), খাজা মির দরদ (১৭২০-১৭৮৪ খ্রি.),

মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.), মুমিন খান মুমিন (১৮০০-১৮৫১ খ্রি.), ইব্রাহিম জাওক (১৮৩০-১৯০৫ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লাক্ষ্ণৌর কবি-সাহিত্যিকদের অনুসৃত রচনাশৈলী

১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৭-১৭০৭ খ্রি.)-এর মৃত্যুর পর দিল্লির কবি-সাহিত্যিকগণ মারাঠা ও নাদের শাহের আক্রমণে লাক্ষ্ণৌর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লাক্ষ্ণৌর শাসকগণ দিল্লির এ সকল কবি-সাহিত্যিকের হৃদয় উজার করে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু তারা শরাব, নারী ও ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হয়ে চারিত্রিক অধঃপতনে চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন। তাদের মনোবাঞ্ছা পুরোনার্থে লাক্ষ্ণৌতে বেশকিছু সরাইখানা ও পতিতালয় গড়ে উঠে। তবে লাক্ষ্ণৌর শাসকগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে লাক্ষ্ণৌর সর্বস্তরে সাহিত্যচর্চার আবহ তৈরি হয় এবং চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে লাক্ষ্ণৌর উর্দু সাহিত্যের বিরাট একটা অংশজুড়ে নর্তকী আর পতিতাদের প্রশংসায় গীতিকাব্য রচিত হয়েছে।

লাক্ষ্ণৌর শাসকগণ প্রকৃতঅধ্যাত্মবাদ থেকে দূরে সরে বাহ্যিক ইসলামি কৃষ্টি-কালচার সংরক্ষণে গুরুত্বারোপ করেছেন। যে কারণে তারা ফারসি কাব্যের অনুসরণে নতুন নতুন কাব্যধারা সৃষ্টি করেছেন। লাক্ষ্ণৌ রচনাশৈলীতে অধিক আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জাতিগঠন ও সমাজ পরিচালনার সঠিক দিক নির্দেশনা লাক্ষ্ণৌ ধারার রচনাশৈলীতে নেই বললেই চলে।

লাক্ষ্ণৌর এ ক্ষয়িষ্ণু ধারা উর্দু সাহিত্যে বেশ কিছুকাল অব্যাহত ছিলো। পরবতীকালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮খ্রি.), আল্লামা ইকবাল[২৫] (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.), মুন্সি প্রেমচাঁদ[২৬] (১৮৮০-১৯৩৬ খ্রি.), ডিপুটি নাজির আহমদ[২৭] (১৮৩০-১৯১২ খ্রি.) প্রমুখের উদ্যোগে এ ক্ষয়িষ্ণু ধারার অনেকটা অবসান

---

২৫ মূল নাম মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)। জন্ম ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান পাকিস্তানের শিয়ালকোট নামক স্থানে। উপমহাদেশে তিনি আল্লামা ইকবাল নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদ। তাঁর উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত কবিতা আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে বিবেচিত। তিনি ধর্মীয় ও ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের জন্য সকলের কাছে সমাদৃত। *বাঙ্গেদারা* (بانگ درا), *যারবে কালিম* (ضرب کلیم), *আসরারে খুদি* (اسرار خودی) ও *রমুজে বিখুদি* (رموز بی خودی) আল্লামা ইকবালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর আরো অনেক কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। এই মনীষী ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, খণ্ড,২: ৯৪৩)

২৬ মুন্সি প্রেমচাঁদ আধুনিক উর্দু ও হিন্দি ভাষার অন্যতম সফল লেখক। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের বানারস নামক অঞ্চলে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের তিনি একজন স্বনামধন্য কথাশীল্পি। তাঁর মূল নাম ধনপত রায়। তবে মুন্সি প্রেমচাঁদ নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তাঁকে উর্দু সাহিত্যের ছোটগল্পের জনক বলে অনেকে মনে করেন। হিন্দি উপন্যাস-সম্রাট হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের একজন অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী লেখক। উর্দু ও হিন্দি ভাষাকে একটি অভিন্ন ভাষা হিসেবে পরিচিত করতে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। *বড়ে ঘর কি বেটি* (بڑے گھر کی بیٹی), *কাফন* (کفن), *হজ্জে আকবর* (حج اکبر) তাঁর অন্যতম ছোটোগল্প। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭ , খণ্ড ১ম: ২৯৫)

২৭ পুরো নাম মৌলাভি নাজির আহমাদ দেহলাভি। উর্দু সাহিত্যে তিনি ডিপুটি নাজির আহমাদ নামে পরিচিত। তিনি ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন উপন্যাসিক এবং ধর্মসংস্কারক। *তাওবাতুন্নাসুহ* (توبۃ النصوح) ও *বানাতুন্নাআশ* (بنات النعش) তাঁর অন্যতম উপন্যাসগ্রন্থ। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ঘটে। লাক্ষ্ণৌ ধারার উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন শেখ গোলাম আলি হামাদানি মুসহাফি (১৭৫১-১৮২৫ খ্রি.), সৈয়দ ইনশা উল্লাহ (১৭৫৬-১৮১৭ খ্রি.), সাআদাত ইয়ার খান রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.), শেখ কালান্দার বখ্শ জুরআত (১৭৪৯-১৮১০ খ্রি.), হায়দার আলি আতিশ (১৭৭৮-১৮৪৭ খ্রি), ইমাম বখ্শ নাসেখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) প্রমুখ।

উর্দু ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত

মূলত উর্দু হলো ভারতীয় এমন একটি ভাষা– যা আমাদের কাছে হিন্দি নামে পরিচিত। একসময় এ ভাষাটিকে দেবনাগরি বর্ণমালা ও ফারসি বর্ণমালায় লেখা হতো এবং এর সমন্বিতরূপকে হিন্দুস্তানি ভাষা নামে অভিহিত করা হতো। তবে ১০৯৮ খিষ্টাব্দের পূর্বপর্যন্ত এ ভাষাটি ফারসি বর্ণমালায় লেখা হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। উর্দু ও ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) ভাষ্যমতে খাজা মাসউদ সাআদ সালমান (মৃত্যু. ১১২১ খ্রি.) সর্বপ্রথম এ ভাষাটিকে ফারসি বর্ণমালায় লিখার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। (হুসাইন, ১৯৯৪: ৭৮)

এ ভাষার বিস্তৃতি ছিলো সুদুর মুলতান থেকে বিহারের মাগধ এলাকা পর্যন্ত। সর্বজন স্বীকৃত কথা হলো এই যে, প্রতিটি ভাষা পঁচিশ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে এর উচ্চারণ ও বচনভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়। আরবি ও ফারসিভাষীরা সিন্দু কে হিন্দু এবং তাদের মুখে প্রচলিত বুলিকে হিন্দি বুলি বলতো। সিন্ধু বিজয়ের পর এ ভাষাটি আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়।

পাঞ্জাবি, গুজারাটি এবং দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে এটি গুজরি নাম ধারণ করে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। দিল্লি ও আশপাশের এলাকার ভাষা বুরুজ ও খাড়িবোলির প্রভাবে তা খাড়িবোলি ও দেহলাভি নামেও পরিচিতি লাভ করে। মোগল আমলে এ ভাষাটি সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের মনের ভাব আদান প্রদানের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠে। মোগলসৈন্যরা সাধারণত ফারসি ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু সৈন্য শিবিরের আশেপাশে যারা বাস করতো সেসকল আঞ্চলিক অধিবাসীর সাথে তারা ফারসি মিশ্রিত হিন্দি-উর্দু ভাষায় কথা বলতো। সৈন্যরা এখানকার হাট-বাজার থেকে আঞ্চলিক ভাষা উর্দু শিখতো। এ কারণে অনেকে মনে করেন উর্দু ভাষা সৈন্য শিবির বা বাজারে সৃষ্ট একটি ভাষা।

এক পর্যায়ে বাদশাহ শাহজাহানের আমলে এ ভাষাটি ব্যাপকভাবে ফারসি বর্ণমালায় লেখা শুরু হয় এবং এ ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার যেসকল শব্দ ফারসি অক্ষরে লেখা কঠিন বা কষ্টসাধ্য হতো তা বাদ দিয়ে লেখকগণ এর সমার্থক একটি ফারসি শব্দ প্রতিস্থাপন করতেন। এর ফলে একটি ভাষার দু'টি লিখিত রূপ হিন্দি ও উর্দু নামে দু'টি ভাষা হিসেবে পরিচিতি লাভ করলো। (জুর, ২০১৪: ১৪৪)

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভাষার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ[২৮] প্রতিষ্ঠা করলে দ্বন্দ্বটি আরো প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উর্দু

২৮ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (Fort William College) ইংরেজ গভর্ণার ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজ ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র। এ প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর উন্নয়নকে সামনে রেখে ভাষাভিত্তিক বিভাগ চালু হয়। প্রতিটি বিভাগে ছিলেন একজন অধ্যাপক ও কয়েকজন সহকারী শিক্ষক।

ও হিন্দি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিলো না। মুন্সি প্রেমচাঁদসহ অনেক প্রগতিশীল লেখক ফারসি ও দেবনাগরি উভয় বর্ণমালায় সাহিত্য চর্চা করে উর্দু ও হিন্দি ভাষাকে একটি অভিন্ন ও অসাম্প্রদায়িক ভাষা হিসেবে পরিচিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজগণ হিন্দু-মুসলমানের ভাষাকে ধর্মভিত্তিক পৃথকিকরণের উদ্দেশ্যে হিন্দাভি ভাষার দু'টি বর্ণমালাকে দু'টি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে নির্ধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে লাল্লু লাল জি হিন্দু বা সনাতনি ধর্মাবলম্বিদের পক্ষে এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে এ দূরুত্ব আরো বাড়তে থাকে। (জুর, ২০১৪: ১৪৪-১৪৫)

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভক্তির ফলে ফারসি বর্ণে হিন্দাভি ভাষাটি কেবল মুসলমানদের ভাষায় পরিণত হয়। আর দেবনাগরি বর্ণের ভাষাটি রয়ে যায় সনাতনি ধর্মাবলম্বিদের জন্য। ফলে একটি ভাষাই দু'টি রূপে পরিচিত হয়ে উঠে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক ভারত বিভাজনে মুসলমানগণ যেমন জাতি হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তেমনি ভাষা হিসাবে উর্দু ভাষাও হয়ে উঠে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষা।

উর্দু ভাষার উৎস নিয়েও অনেক মতানৈক্য রয়েছে। বাস্তবতা হলো এটি উপমহাদেশীয় একটি ভাষা। এর জন্ম ও বিকাশ ভারতেই এবং ভারতের সবচেয়ে ব্যবহৃত ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আধুনিক উর্দু সাহিত্যের জনকদের মধ্যে অন্যতম স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মির আম্মানসহ অনেকেই উর্দু ভাষার উৎস সম্পর্কে ভুল তথ্যা উপস্থাপন করেছেন। ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। অনেকে আবার উর্দু ভাষার উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসরণ করেছেন। তাদের বক্তব্যেও প্রান্তিকতা বিরাজমান। মূলত উর্দু ভাষার বিকাশ সাধন হয়েছে হাজার শতাব্দীর পরে।

উর্দু ভাষা সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে দু'ধরনের অভিমত লক্ষ করা যায়। প্রথমত উর্দু ভাষার লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের অভিমত আর দ্বিতীয়ত ভাষাবিজ্ঞানীদের অভিমত। উর্দু সাহিত্যের অনেক বড় বড় লেখক ও কবি-সাহিত্যিকগণ উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব দেখে একে মুসলমানদের সৃষ্টি একটি ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, উর্দু আর্য ভাষার প্রাকৃতরূপ শৌরসেনির অপভ্রংশের একটি প্রকার। পরবর্তীকালে এ ভাষায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রণীত নীতিমালার আলোকে উর্দু ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শ্রেয়।

বর্তমানে প্রায় ৪০ টি দেশে উর্দু ভাষার প্রচলন রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ৬ কোটি লোকের মাতৃভাষা হলো উর্দু। বাংলাদেশ, ভারত, আফগানিস্তান, মরিশাস, মিসরসহ বহু দেশে উর্দু কমিউনিটি (Community) উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা স্থানে উর্দুভাষীরা সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে পৃথিবীর একটি গতিশীল ভাষা ও উন্নত সাহিত্যরূপে প্রকাশে সফলতা অর্জন করেছে।

ভারতের প্রধান ভাষাগুলোর উন্নয়নে এ কলেজটি অনন্য ভূমিকা পালন করে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে এ কলেজের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ২৬২)

তথ্যসূত্র

১ আব্দুল গফুর নাসসাখ (১৮৯০): *রিসালা দর তাহকিকে যবানে রিখতা*, মুন্সি নভেল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

২ আহমদ তামীমদারী (২০০৭): *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস*, [অনুবাদ, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী] আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩ আহমদ বিন ইয়াহইয়া বিন জাবির বিন দাউদ আল বালাজুরি (১৩৫১ সৌ.): *ফুতুহুল বুলদান*, চাপাখানা উসমানিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত ।

৪ ইহতেশাম হুসাইন (১৯৪৭): *হিন্দুস্তানি লিসানিয়্যাত কা খাকা*, আদবি প্রেস, লাটুস রোড, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

৫ কিউমারাস আমিরী (১৩৪৭ সৌ.): *জবান ওয়া আদাবিয়্যাতে ফারসি দার হেন্দ*, (ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), ইসলামি সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয়, ইরান।

৬ জুরজি জায়দান (১৯৬৪): *তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম*, [অনুবাদ: মৌলভি মুহাম্মদ হালিম আনসারি], শেখ শওকত আলি এন্ড সন্স, করাচি, পাকিস্তান।

৭ তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী (২০১৪): *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বার্ড পাবলিকেশন্স, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৮ মনির উদ্‌দীন ইউসুফ (১৯৬৮): *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৯ মাসউদ হুসাইন খান (১৯৯৪): *মুকাদ্দামায়ে তারিখে যবানে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

১০ মির আম্মান দেহলাভি (১৯৪৪): *বাগ ও বাহার*, [সংকলক মৌলাভি আব্দুল হক], আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু ও হিন্দি, দিল্লি, ভারত।

১১ মির্জা খলিল বেগ (১৯৯৫): *উর্দু জবান কি তারিখ*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

১২ মুহসেন আবুল কাসেমি (১৩৭৮ সৌ.): *তারিখে যবানে ফারসি*, কিতাব খানায়ে যুহরি , ইরান।

১৩ মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টি (১৯৯০): *বাররে সগির মে ইসলাম কে আওয়ালে নুকুশ*, ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, লাহোর,পাকিস্তান।

১৪ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (২০১৯): *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৫ মুহিউদ্দিন কাদেরি জুর (২০১৪): *হিন্দুস্তানি লিসানিয়্যাত*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

১৬ মৌলাভি আব্দুল হক (১৯৯৫): *উর্দু কি ইবতেদায়ি নশু নুমা মে সুফিয়া কিরাম*, ইদারা আদাবিয়্যাতে উর্দু, হায়দারাবাদ, ভারত।

১৭ মৌলাভি মোহাম্মদ হুসাইন আজাদ (১৯৫০): *আবে হায়াত*, শেখ মোবারক আলি তাজির কুতুব আন্দুরুন, লাহোর, পাকিস্তান।

১৮ রেজা জাদে শাফাক (১৩৫২ সৌ.): *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান* [ইরানের সাহিত্য ইতিহাস], ইনতিশারাতে দানেশগাহে পাহলাভি, ইরান।

১৯ শামসুল্লাহ কাদেরি (১৯২৯): *তারিখে জবানে উর্দু*, মুন্সি নভেল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্মৌ, ভারত।

২০ সুকুমার সেন (২০১৮): *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কোলকাতা, ভারত।

২১ সৈয়দ আমির হুসাইন আবেদি (১৯৮৪): *হিন্দুস্তানি ফারসি আদব* , আলাপ্রেস, দিল্লি, ভারত।

২২ স্যার সৈয়দ আহমদ খান (প্রকাশের সন ও প্রকাশনা সংস্থার নাম অনুল্লিত): *আসারুস সানাদিদ*, সেন্ট্রালবুক ডিপু, উর্দু বাজার, জামা মসজিদ, দিল্লি, ভারত।

২৩ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৩৬০ বঙ্গাব্দ): *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক অজিত চন্দ্র ঘোষ, কোলকাতা, ভারত।

২৪ হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৫): *তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইংরেজি গ্রন্থাবলি

২৫ Elton L Daniel (2001): *The History of Iran*, Greenwood Press, New York.

২৬ G Lazard (1975): *The Rise of the New persian Language*, Cambridge University Press, London.

২৭ Ismail R. al Faruqi (1986): *The Cultural Atlas of Islam*. Mac-millan Publishing Co, New York.

২৮ John Gilchrist (1903 CE.): *Linguistic survey of India*, Cambridge University Press, London

২৯ John Beames (1875): *A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India*, Cambridge Library. London.

দ্বিতীয় অধ্যায়

উর্দু ভাষার ক্রমবিকাশে ফারসি ভাষার প্রভাব

ভাষা মানবসভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। ভাষার বিবর্তনে সাধারণ জনগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য সাধারণ জনগণ শব্দমালার গাঁথুনি প্রস্তুত করে। এ গাঁথুনি কোনো নিয়ম নীতির পরোয়া করে না; কেবল মনের ভাব প্রকাশ করে। মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য নিজ ভাষায় শব্দ খুঁজে না পেলে অপর ভাষার শব্দ কুড়ায় এবং অপর ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়েই মানুষ সমাজে বসবাস করে। সামাজিক তাগিদেই মানুষ স্বীয় সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষার অনুশীলন করে। এ অনুশীলন মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। কারণ একটি সমাজের ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষার প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। মাতৃভাষার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ মানুষ প্রতিনিয়ত অনুভব করে। একটি সমাজ উন্নয়নের জন্য অন্য সমাজের নান্দনিক বিষয়গুলো নিয়ে সমৃদ্ধিশালী সমাজে পরিণত হয়। একটি ভাষাও অন্য ভাষার প্রভাবে সমাজে আদৃত হয়ে উঠে। সমাজ ও ভাষা একে অন্যের প্রভাব নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকে। ইতিহাসে সমাজ ও ভাষার এ বৈশিষ্ট্য একটি চিরায়িত বিষয়।

পৃথিবীর সকল ভাষাই অপরাপর ভাষার কিছু না কিছু প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। ইংরেজি, চাইনিজ, ফারসি, নাগরি ইত্যাদি কোনো ভাষার ব্যাপারে এ দাবি করা যাবে না যে, তা অন্য ভাষার কমবেশি প্রভাব গ্রহণ করেনি। তবে পৃথিবীতে উর্দুই হলো এমন একটি ভাষা– যা ইন্দো-ইরানি শাখা ফারসির বাহুডোরে আশ্রয়ে বিকশিত হয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সহস্র প্রভাব গ্রহণ করেছে এবং কালের বিবর্তনে এ প্রভাবের রূপও হয়েছে বৈচিত্রময়।

ফারসি ভাষা প্রভাবিত উর্দু ভাষার কাল নির্ণয়

উর্দু ভাষার উপর ফারসির প্রভাব চারটি যুগের সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হলো:

১. প্রাচীন যুগ। এর সময়কাল হলো খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শত থেকে পাঁচশত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় উর্দু ভাষা আর্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাকৃত ভাষার রূপ ধারণ করে। এরপর শৌরসেনি অপভ্রংশ হয়ে আপন কাঠামো তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। এ সময় উর্দু কথ্যভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ সময়ে উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

২. **মধ্যযুগ**। এ যুগের সময়কাল হলো পাঁচশ খ্রিষ্টাব্দ থেকে একহাজার খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগে ভারতীয় ভাষাগুলো স্বীয় কাঠামো তৈরিতে সচেষ্ট ছিলো। ভাষাবিজ্ঞানী সৈয়দ ইহতেশাম হুসাইন বলেন:

'এ যুগে ভারতীয় ভাষাগুলো আর্যভাষা থেকে সবেমাত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে আধুনিক ভাষা-কাঠামোয় তৈরি হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এ যুগে উর্দুসহ ভারতীয় ভাষাগুলোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বর্ণমালা তৈরি হয়নি। ভারতীয় ভাষাগুলো তখন বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখা হতো'। (ইহতেশাম, ১৯৮৩: ১১)

৩. **তৃতীয় যুগ**। এর সময়কাল হলো একহাজার খ্রিষ্টাব্দ থেকে আঠারোশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগে উর্দুভাষাসহ ভারতীয় ভাষাগুলোর উন্মেষ ঘটে। এ সময় উর্দু ভাষার জন্য কেবল ফারসি বর্ণমালা নির্ধারণ করা হয়। ফলে উর্দু ভাষার উপর ফরসি ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এর প্রধান কারণ হলো এ সময় থেকে ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটে এবং স্থায়ীভাবে মুসলমানগণ এখানে বসবাস করতে থাকে।

ফলে মুসলমানদের কথ্যভাষা ফারসি ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলো বিশেষত উর্দুর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৪. **আধুনিক যুগ**। এর সময়কাল হলো আঠারোশ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। এ সময় উর্দু ভাষায় ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফারসি ভাষার প্রভাবের ধারাকে সামনে রেখে উর্দু একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভাষা রূপে পরিগণিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর উর্দু ভাষা সাম্প্রদায়িক চেতনায় ঝুঁকে পড়ে এবং কতিপয় লোক উর্দু ভাষাকে কেবল পাকিস্তান ও মুসলমানদের ভাষা হিসেবে পরিচিত করার অপপ্রয়াস চালায়। (বেগ, ২০১৭: ১০৫)

এই হাজার বছরের ইতিহাসে উর্দু ভাষা একাধিক নামে অভিষিক্ত হয়। নিম্নে উর্দু ভাষার ক্রমবিকাশে ফারসি ভাষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মুহাম্মদ বিন কাসেমের শাসনামলে উর্দুর ক্রমবিকাশে ফারসির প্রভাব

এই প্রভাবের সময়কাল প্রায় তিনশো বছরের। অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন কাসেম[২৯] (৬৯৫-৭১৫ খ্রি.) থেকে সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) ভারতবর্ষ আক্রমণ পর্যন্ত। তখন ছিলো উর্দু ভাষার শৈশবকাল। হিন্দুস্তানি তথা উর্দু ভাষা তখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। হাজার খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাতারদের অত্যাচার ও আক্রমণের কারণে অনেক ইরানি ও ফারসিভাষী ভারতবর্ষে পাড়ি জমান। ফলে ফারসিভাষীদের সাথে উপমহাদেশের মানুষের সখ্যভাব গড়ে উঠে। এ সময় উর্দু ভাষা ফারসিভাষীদের থেকে বিপুল পরিমাণ শব্দ গ্রহণ করে। মুহাম্মদ বিন কাসেম (৬৯৫-৭১৫ খ্রি.) ভারত আক্রমণ করে সিন্ধু জয় এবং উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করলে এ সখ্যভাব আরো দৃঢ় হয়।

বসরায় যখন মুসলমানদের সৈন্য ছাওনি গড়ে উঠে তখন মুসলমানদের আধিপত্য ও সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে অনেক ভারতীয় মুসলমান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। এতে ফারসি, আরবি, তুর্কি ও আফগানি সেনাবাহিনীর সাথে এ উপমহাদেশের মানুষের একটি সেতু বন্ধন তৈরি হয়। কথিত আছে, মুহাম্মদ বিন কাসেম (৬৯৫-৭১৫ খ্রি.) যখন সিন্ধু প্রদেশে আক্রমণ করেন তখন তার সাথে উপমহাদেশের স্থানীয় প্রায় চার হাজার সৈন্য ছিলো। (ভাট্টি, ১৯৯০: ২০-২১)

এ সময় মুলতান ছিলো জ্ঞানগরিমার উল্লেখযোগ্য স্থান। মুলতানের আঞ্চলিক ভাষা মুলতানি হলেও যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা গাজনি ও গৌর সম্রাটদের অধীনে হওয়ায় তাদের ভাষা ছিলো ফারসি। সেই দরবারের শোভা বর্ধনের জন্য মাসউদ সাআদ সালমান (মৃত্যু, ১১২১ খ্রি.) ফারসি বর্ণমালায় হিন্দুস্তানি তথা উর্দু কবিতা রচনা করেন। বর্তমানে এর অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়টিকে জোড়ালোভাবে উল্লেখ করেছেন। (হুসাইন খান, ১৯৯৪: ৭৬)

---

২৯. মুহাম্মদ বিন কাসেম (৬৯৫-৭১৫ খ্রি) ছিলেন একজন উমাইয়া সেনাপতি। তিনি সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চল জয় করে তা উমাইয়া খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। বর্তমান সৌদি আরবের তায়েফ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসেম (৬৯৫-৭১৫ খ্রি) উমাইয়া গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক তাঁকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেন। (হেজাজি, ২০০১: ৭)

ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল অধ্যাপক এইচ, সি, রায় (Professor H. C. Roy) রচিত *ভারতে হিন্দুস্তানি কবিতার সূচনা* প্রবন্ধের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, মাসউদ সাআদ সালমানই (মৃত্যু ১১২১ থেকে ১১৩০ খ্রি.) হলেন উর্দু ভাষার প্রথম কবি। কারণ তিনি সর্বপ্রথম ফারসি বর্ণমালায় হিন্দুস্তানি তথা উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। তিনি সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) পৌত্র ইবরাহিমের রাজদরবারে সভাকবি ছিলেন। ১১২১ থেকে ১১৩০ খিষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর উর্দু কবিতা বস্তুত কী প্রকৃতির ছিলো সে বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। (পাল, ১৯৬২: ৩৪)

মুহাম্মদ বিন কাসেম (৬৯৫-৭১৫ খ্রি.) যখন সিন্ধু বিজয় করেন তখন মুলতানে ইসলামি শিক্ষার কয়েকটি খ্যাত নামা কেন্দ্র অবস্থিত ছিলো বলে তথ্য পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবন হাওকাল[৩০] ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান আসার বর্ণনা দিয়ে বলেন:

> যখন আমি মুলতান এসেছি তখন শহরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ছিলো এবং তাদের ভাষা ছিলো হিন্দাভি (উর্দু ভাষার প্রাচীন নাম)। এ ভাষায় ফারসি শব্দমালার ব্যবহার ছিলো অধিক পরিমাণে। মুলতানে তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের 'সূর্যদেবতা' নামে একটি বড় মন্দির ছিলো। এ মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোক বহু দুর-দূরান্ত থেকে পুজা-অর্চনার জন্য আসতো। মুলতানে ইসলাম শিক্ষার কয়েকটি কেন্দ্র ছিলো। এ কেন্দ্রগুলোতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি গণিত ও সৌরবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো।(কুরাইশি, ১৯৬৭: ৪৭)

বিখ্যাত ফারসি কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) উর্দু ভাষার প্রথম কবি হিসাবে যে মাসউদ সাআদ সালমানের (মৃত্যু ১১২১ থেকে ১১৩০ খ্রি.) কথা উল্লেখ করেছন, তিনি এই লাহরেরই অধিবাসী ছিলেন।

ভারতবর্ষে আগত মুসলমান রাজা-বাদশাগণ তাঁদের নিজেদের মাতৃভাষা ফারসি এ অঞ্চলের মানুষের উপর কখানো চাপিয়ে দেননি। তারা বিজিত জাতির উপর শাসন করেছেন এবং বিজিতদের মুখের ভাষাই ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন। তারা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে যেয়ে কখনো কখনো মাতৃভাষা ফারসি শব্দমালা ব্যবহার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ অঞ্চলের শাসকগণ একজন মুসলিম হওয়ার চেয়েও বাদশা হওয়াকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিজেদের শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য পরস্পর লড়াই করেছেন। সুলতান মাহমুদ গাজনাভি (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) থেকে মোগল সর্বশেষ শাসকের মাঝেও এ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন ছিলো।

মুহাম্মদ বিন কাসেম (৬৯৫-৭১৫ খ্রি.) থেকে সুলতান মাহমুদ গাজনাভি (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) পর্যন্ত উর্দু ভাষার উপর ফারসি ভাষার যে প্রভাব রয়েছে সে বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীগণ বলেন: 'তখন উর্দু ছিলো কথ্যভাষা, তাই এ সময়ের উর্দু ভাষার উপর ফারসি ভাষার প্রভাব সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীগণ অন্ধকারে রয়ে গেছেন'। (হুসাইন খান, ১৯৯৪: ৭৭)

---

৩০. পুরো নাম আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবন হাওকাল (৯৪৩-৯৮৮ খ্রি.)। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, পর্যটক এবং ব্যবসায়ী ছিলেন। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারত ভ্রমন করেন। ৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। (বাগদাদি, ৯৭৭: ২)

সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) শাসনামলে উর্দুর ক্রমবিকাশে ফারসি প্রভাব

মুহাম্মদ বিন কাসেম (৬৯৫-৭১৫ খ্রি.) সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতে মুসলমানদের শাসন সিন্ধু প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকলেও মুসলমানদের ভাষা আরবি-ফারসি কেবল সিন্ধু প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিলোনা। মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি-কালচার, ভাষা তখন গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ইরান থেকে আগত বহু ফারসিভাষী সুফি-সাধক ও ব্যবসায়ীর বিপুলভাবে আগমন ঘটে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফারসি ভাষার সাথে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিলো বহুকাল ধরে।

সুলতান মাহমুদ গাজনাভি (৯৭১-১০৩০ খ্রি.), সুলতান মুহাম্মদ গাজনাভি (৯৯৮-১০৪১ খ্রি.), মুহাম্মদ বিন সাম (১১৪৯-১২০৬ খ্রি.) ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১২৯০-১৩৫১ খ্রি.)-এর ভারতবর্ষে মুর্হুমুহু আক্রমণ নতুন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে। দিল্লি ও দিল্লির আশ-পাশ এলাকার খাড়িবোলি ও বুরুজ ভাষা দক্ষিণ ভারতসহ গোটা ভারতের ভাষা ও উপভাষাগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ ছাড়া শাসকদের অনুসরণ করে কথ্যভাষায় ফারসি-আরবি শব্দের ব্যবহার জনসাধারণের জন্য একটি রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি এ সময় সাধারণ মানুষের জন্য ফারসি ভাষার ব্যবহার আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হতো। শিক্ষিত লোকেরা তখন প্রায় সকলেই হিন্দাভি ভাষায় ফারসি শব্দমালা, বাক্য-বিন্যাস এবং বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে উৎসাহী থাকতেন। মূলত ফারসি মিশ্রিত হিন্দাভি ভাষার আধুনিক রূপই হলো উর্দু। (জুর, ২০১৪: ৯৪)

উপমহাদেশের ভাষাসমূহে ফারসি ভাষার প্রভাব

উপমহাদেশের ভাষাসমূহে আরবি ও ফারসি শব্দমালার ব্যবহার অনেক আগ থেকেই পাওয়া যায়। রাজা পৃথ্বীরাজের দরবারি কবি চন্দর বরদায়ি (১১৫৯-১১৯২ খ্রি.) *পৃথ্বীরাজ রাসু* (پرتھوی راج راسو) নামে রাজা পৃথ্বী রাজের যে জীবনচরিত রচনা করেছেন; এতে প্রচুর পরিমাণ আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। রাজা পৃথ্বীরাজের বোন রাজকুমারি পৃথ্বীবায়ির স্বামী কোনো এক যুদ্ধে নিহত হলে স্বতীদাহের পূর্বে নিজের সন্তানদের জন্য একটি চিঠি লিখে ছিলেন। সে চিঠিতে তিনি প্রচুর পরিমাণ আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষে মোগলদের আগমনের বহুকাল পূর্বে ফারসি ভাষা এ অঞ্চলের ভাষাসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। (শামিম, ২০১২: ৩৫)

সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৮৭-১০৩০ খ্রি.) ভারতবর্ষে আক্রমণ উপমহাদেশের ভাষাগুলোর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সুলতান মাহমুদ গাজনাভি (৯৮৭-১০৩০ খ্রি.) উপমহাদেশের ভাষাসমূহের উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তবে এ কথাটি সর্বজন গ্রাহ্য যে, উপমহাদেশের ভাষাগুলোর উপর যে ভাষাটির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে তা হলো আধুনিক ফারসি ভাষা। এ ভাষাটি সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৯৭-১০৩০ খ্রি.) যুগে আর্যভাষার উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এক পর্যায়ে এ আর্যভাষার উপভাষা হিন্দাভি ফারসি বর্ণমালা ও বাক্য-বিন্যাস গ্রহণ করে উর্দু ভাষার রূপলাভ করে। (Grierson, Year not mentioned: 125)

সুলতান মুহাম্মদ ঘুরি (১১৪৯-১২০৬ খ্রি.) থেকে মোগলদের রাজ্যক্ষমতা দখল পর্যন্ত এ উপমহাদেশে মুসলিম পাঁচটি রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। মামলুকি, খিলজি, তুঘলকি, সৈয়দ এবং লোদী। এ সম্প্রদায়গুলোর প্রত্যেকটির মাতৃভাষা ছিলো ফারসি। শাসকদের মাতৃভাষা ফারসি দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় আর্যভাষার উপর প্রভাব বিস্তারের কারণেই উর্দু ভাষা ও সাহিত্য অস্তিত্বলাভ করে। (Study, 1996: 16)

তৎকালে দিল্লির শিল্প ও সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষার সরকারি ভাষা ফারসি হলেও গোটা ভারতে ভাব-বিনিময়ের ভাষা ছিলো হিন্দাভি তথা উর্দু। মুসলমানগণ দিল্লির মসনদ দখল করে দেখলেন, ভারতবর্ষে আঞ্চলিক ভাষা অনেক হলেও ভাব-বিনিময়ের ভাষা হিসাবে হিন্দাভি ভাষাটি বড়বড় শহরে, উপাসনালয়ে এবং সর্বস্তরের জনগণের কাছে ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে সমাদৃত। মুসলিম শাসকগণ এ ভাষাটিকে সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্ক রক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করেন। তাই ফারসিভাষী ক্ষমতাসীনদের ভাষার প্রভাব এ ভাষাটির উপর সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। (সেন, ২০১৮: ১৩৪)

বাংলা সাহিত্য ও বইয়ের ভাষা যেমন আঞ্চলিক ভাষা থেকে খানিকটা ভিন্ন, তদ্রূপ উর্দু ভাষাটিকেও ভারতের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে নিম্নশ্রেণির মানুষ থেকে আলাদা ও অভিজাত হিসাবে প্রকাশ করার লক্ষ্যে ফারসি বর্ণমালায় হিন্দাভি ভাষা লেখার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উর্দু ভাষা সমৃদ্ধশালি সাহিত্য হিসেবে বিকশিত হয়েছে। (সেন, ২০১৮: ১৩৫)

তেরোশ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে দিল্লির ক্ষমতা ভারতবর্ষের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিলো না। সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন তুঘলক (মৃত্যু ১৩২৭ খ্রি.) দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তুঘলক বংশের শাসকবর্গ দিল্লির মসনদে বসে বঙ্গ থেকে আফগানিস্তান অঞ্চল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এ সময় ইরান, বাগদাদ ও এশিয়া মাইনর থেকে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, ইসলাম প্রচারক, সুফি-সাধক, চিকিৎসক, সৈনিক ও বিভিন্ন জ্ঞান-গরিমায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারতীয় হয়ে এখানে বসবাস শুরু করেন।

মূলত এ সময় মঙ্গলীয় বাদশা চেঙ্গিস খান (১১৬২-১২২৭ খ্রি.)-এর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। যার ফলে বহু জ্ঞানী-মনীষী শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের আশায় ভারতবর্ষে পাড়ি জমান। বাগদাদ, ইরান, এশিয়া মাইনরের এ বিস্তৃর্ণ এলাকা থেকে যারা ভারতবর্ষে আগমন করেন তারা মূলত কৃষ্টি ও কালচারে কেবল আর্য হননি; বরং আর্য হিসাবে নিজেরদের তুলে ধরার এক অন্ধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। কথিত আছে ইরান থেকে লাহোর পর্যন্ত এ বিস্তৃর্ণ এলাকার কথ্যভাষা ছিলো ফারসি তথা দারি ভাষা। তাই ফারসিভাষীদের আর্য হওয়ার প্রয়াসে যে ভাষাটিকে ফারসিভাষীগণ গ্রহণ করেন, তাই উর্দু ভাষা ও সাহিত্য। (আবদুল্লাহ, ১৯৭৭: ১২৭)

ভারতবর্ষে আগত মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম এবং মাতৃভাষা ফারসি হলেও ভারতের সাধারণ মানুষের ভাষা ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। এ সময় শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার প্রয়োজন অনুভব করে। সময়ের তাগিদে ফারসি ভাষার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত সর্বভারতীয় আর্যভাষা উর্দুই সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়। শুরুতে এ ভাষাটি

জনসাধারণের কথ্যভাষা ছিলো এবং ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার নানা বর্ণমালা দিয়ে এর সাহিত্য রচনার প্রয়াস চালানো হয়। অবশেষে ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণমালা এ ভাষার জন্য সাব্যস্ত হয়। কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম এ ভাষাটিকে ইরান থেকে আগত সুফিসাধকগণ নিজেদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এ ভাষা অবলম্বনে ধর্ম প্রচার করেন। (শামিম, ২০১২: ৪১)

ফারসি ভাষার সাথে হিন্দাভি ভাষার যোগসূত্র

ভারতবর্ষে গাজনাভির সুলতানদের মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়। ভারতের উত্তরাঞ্চলের রাজা জয়পাল[৩১](শাসনকাল ৮১০-৮৫০ খ্রি.)-এর শাসনকার্য আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। জয়পাল (শাসনকাল ৮১০-৮৫০ খ্রি.) গাজনাভির সুলতানদের হাতে পরাজিত হন। এক পর্যায়ে ৯৮৬-৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কাবুল থেকে পেশাওয়ার পর্যন্ত গাজনাভির সুলতান মাহমুদের শাসনাধীনে চলে আসে। ৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ইন্তিকাল করলে স্বীয় পুত্র সুলতান মুহাম্মদ শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান মাহমুদ (৯৮৭-১০৩০খ্রি.) গাজনাভি সিংহাসনে আরোহণ করে মোট সতেরবার দিল্লি আক্রমণ করেন। এ সময় তিনি প্রতি বছর অক্টোবর মাস থেকে ডিসেম্বর এই চার মাস আক্রমণ চালিয়ে যে অঞ্চলগুলো দখল করতেন তা থেকে বিপুল সংখ্যক নির্মাণশ্রমিক ও অর্থসম্ভার নিয়ে গাজনাভি ফিরে যেতেন। ফলে ভারতীয় শ্রমিকগণ দেশে ফেরার সময় গাজনাভি অঞ্চলের ভাষার সাথে মিলিয়ে ফারসি থেকে অসংখ্য শব্দ, উপমা ও প্রবাদ নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহার করতো। এ ভাবেও ফারসি ভাষার সাথে হিন্দাভি তথা উর্দু ভাষার একটি দৃঢ় যোগসূত্র তৈরি হয়। (ইকরাম, ১৯৯২: ৫৭)

বর্ণ আবিস্কারের ইতিহাস ও উর্দু বর্ণমালা

সভ্যতার ইতিহাসে লেবানন পর্বত এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী এলাকা আবাদকারী ফিনিসীয়দের (Phoenicians) সবচেয়ে বড় অবদান হলো বর্ণমালা (Alphabet) আবিস্কার করা। তারা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonants) উদ্ভাবন করে। আধুনিক বর্ণমালার সূচনা এখান থেকেই। পরবর্তীকালে গ্রিকরা এর সাথে স্বরবর্ণ (Vawels) যোগ করে বর্ণমালাকে পূর্ণতা দান করে। ফিনিসীয়দের আরবি নাম কানআনি (كنعانى)। ফিনিসীয়গোষ্ঠীর একটি শাখা হলো আরামি। আরামীয়গণ সেই ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের নাম রাখে যথাক্রমে– আবজাদ (ابجد), হাওয়ায (هوز), হুত্তি (حطى), কালিমান (كلمن), সাফাস (سعفص), কারশাত,(قرشت)। (সুলাইমান, ১৯৮১: ১৫)

আরামীয়গণ ফিনিসীয় তথা কানআনিদের উদ্ভাবিত বর্ণ ও লিপির ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। এরপর ইরানি হাখামানশি (هخامنشى) বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ লিপি নীলনদ উপত্যকা এবং সিন্ধুনদের

৩১. রাজা জয়পাল ছিলেন পাল সম্রাট দেবপালের (মৃত্যু, ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ) জ্ঞাতী ভাই। পিতার নাম বাগপাল। তিনি ৮১০ থেকে ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট দেবপাল দেবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পাল সাম্রাজ্যের সেনাপতি হয়ে বহু সাম্রাজ্য জয় করার কারণে দেব পাল খুশি হয়ে জয়পালকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। (পালনপুরি, ২০২০: ৬৪)

অববাহিকায় প্রসার লাভ করে। এর থেকে হিব্রু, সুরিয়ানি, নাবতি, পালিমারি এবং এশিয়া মাইনর অঞ্চলে প্রচলিত লিপিগুলোর জন্ম। ইরানের পাহলাভি লিপিও এরই পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ বলে ধারনা করা হয়। (আতিফ, ১৯৯৫: ১৯)

আরামীয়দের ২২টি বর্ণ আরবদের ভাষার চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় দক্ষিণ ইয়ামেনের হিময়ারি (حميرى) জাতি এ বর্ণমালার সাথে আরবি বর্ণমালার আরো ৬টি বর্ণ তথা সা (ث), খা (خ), যাল (ذ), দোদ (ض), জোয়া (ظ) ও গাইন (غ) বৃদ্ধি করে পরিপূর্ণ আরবি লিপি তৈরি করে। এই লিপিটিকে মুসনাদে হিময়ারি (مسند حميرى) বলা হয়।

এরপর নাবতিগোষ্ঠী এই ২৮টি বর্ণের সাথে হামযা (ء) বর্ণটি বৃদ্ধি করে। শামস কায়স রাজি এ বর্ণগুলোর সাথে ফারসি ৪টি বর্ণ পে (پ), চে (چ), যে (ژ) ও গাফ (گ) যুক্ত করেন। এই ৩৩ টি ফারসি বর্ণমালার সাথে আরো তিনটি হিন্দি বর্ণ টে (ٹ), ডাল (ڈ) ও ড়ে (ڑ) যুক্ত করা হয়। সব মিলে উর্দু বর্ণমালার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬টি। তবে হরফে তাহাজ্জির বিন্যাস ও নাম সেটাই বহাল থাকে যা ফারসিতে ছিলো। (সেলিম, ১৯৮১: ২৬)

অন্যদিকে খ্রিষ্টানরা সুরিয়ানি ভাষায় ইঞ্জিল লিখার জন্য বিশেষ একটি লিপির উদ্ভাবন করে। তারা এর নাম দেয় সাতরাঞ্জিলি (سطرنجيلى) যা আরবি কুফি লিপির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো। (জৌনপুরি, ১৯৬১: ৩০)

মুসনাদে হিময়ারি (مسند حميرى) এবং সাতরাঞ্জিলি (سطرنجيلى) মিলে খাত্তে জাজম (خط جزم)-এর উদ্ভব হয়। এর অপর নাম হলো খাত্তে হিরি (خط ہيرى) যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় অর্ধশত বছর পূর্বে মক্কা নগরে পৌঁছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা খাজা আব্দুল মুত্তালিবের এ লিপিতে লেখা একটি পত্র বাদশাহ মামুনুর রশিদের কাছে সংগৃহীত ছিলো। মক্কা নগরের নিকটবর্তী অঞ্চল দাওমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দার বিন আব্দুল মালিকের ভাই বশির বিন আব্দুল মালিকের সাথে মক্কা নগরির সরদার হারব বিন উমাইয়ার মেয়ে সাহবার বিয়ে হয়। বশির এ লিপির লিখন পদ্ধতি শ্বশুর হারব বিন উমাইয়্যাকে শিখালে মক্কা-মদিনা, তেহামা এবং নজদ অঞ্চলে এ লিপিটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। (ইরানি, ১৩৪৬ সৌ: ৩৩)

প্রাথমদিকে হজরত উমর (রা.) হজরত উসমান (রা.) হজরত আলি (রা.) হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এবং হযরত উবাই ইবনে কাআব (রা.)-এর মতো কয়েকজন অহি লেখক সাহাবি এ লিপিতেই কুরআনের অহি লিখতেন। (ইরানি, ১৩৪৬ সৌ: ৩৩) উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত লিপি ছিলো খাত্তে কুফি (خط كوفى)। এ ছাড়াও মক্কি, মাদানি এবং বসরি লিপিরও এ সময় প্রচলন ছিলো। (শামিম, ২০১২: ১১৫) বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি (৬০৩-

৬৮৮ খ্রি.)[৩২] খাত্তে কুফিতে নুকতা এবং এরাব (জের, জবর, পেশ ইত্যাদি) প্রয়োগ করেন। এ লিপিটি আরব অঞ্চলে প্রায় ৫০০ বছর প্রচলিত ছিলো। (মির্জা, ১৯৮৯: ১৬১)

উমাইয়া বংশের শাসনামলে খাত্তে কুফি (خط كوفى)-এর অধিক প্রচলন এবং উন্নতি ঘটে। আব্বাসীয় আমলে ইবনে মাকলা বায়জাভি তৎকালীন লিপিগুলোকে মিলিয়ে আকলামে সিত্তা নামে ছয়টি লিখনরীতি তৈরি করেন। তিনি আরবি বর্ণমালাগুলো নতুন করে বিন্যস্ত করেন। বর্তমানে সেই বিন্যাসই বহাল রয়েছে। (রাহি, ১৯৮৬: ৮৫) ইবনে মাকলা খাত্তে নাসাখ (خط نسخ)-এরও প্রবর্তক। তিনি যে ৬টি লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন তার মধ্যে খাত্তে নাসাখ (خط نسخ) অন্যতম। আরবি, সিন্ধি ও পশতু বর্ণমালায় খাত্তে নাসাখ (خط نسخ) লিপি এখন পর্যন্ত বহাল আছে। উর্দুর জন্যও এ লিপিটি প্রবর্তনের সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো; তবে সেটি বাস্তবায়িত হয়নি।

খাত্তে নাসাখ (خط نسخ)-এর পর হাসান ইবনে হুসাইন আলি ফারসি খাত্তে তালিক (خط تعليق) নামে সপ্তম আরেকটি লিপি উদ্ভাবন করেন। (মাহরাবাদি, ১৩৪৫ সৌ. : ৩৬) অতঃপর খাজা আবুল আল আরবি হরুফে তাহাজ্জির সাথে 'পে (پ), চে (چ), ঝে (ژ), গাফ (گ), এই ৪টি হরফ সংযুক্ত করেন। (আজিজ, অনু: ১৯)

আরবির অষ্টম ও সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য লিপিরীতি হলো খাত্তে নাস্তালিক (خط نستعليق)। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তৈমুর লং[৩৩] (১৩৩৬-১৪০৫ খ্রি.)-এর সমসাময়িক খাজা মির আলি তাবরিজি এ লিপির প্রবর্তক। (মহরাবাদি, ১৩৪৫ সৌর.: ৬৭) অনেকে মনে করেন খাজা মির আলির তাবরিজির বহু পূর্বেই এ লিপিটির অস্তিত্ব ছিলো। তিনি মূলত এই লিপিটির সংস্কার সাধন করেছেন। তাই তাঁকে এ লিপিটির কেবল সংস্কারক বলা যায়। এটা মূলত খাত্তে নাসাখ (خط نسخ) ও খাত্তে তালিক (خط تعليق)-এর সমন্বিত রূপ। এ কারণে শুরুতে এ লিপিগুলোকে নাসাখ-তালিক বলা হলেও পরবর্তীকালে বহুল ব্যবহারের কারণে খাত্তে নাস্তালিক (خط نستعليق) নামে পরিচিতি লাভ করে। ড. ইহতিরাম উদ্দিন শাগেল বলেন:

یہ خط تمام پیش رو کے مقابلے میں مختصر، آسان اور رواں ہے۔ گویا یہ ایک قسم کا شارٹ ہنڈ ہے۔

(শাগেল, ১৯৬৩: ৯২)

[খাত্তে নাস্তালিক (خط نستعليق) পূর্ববর্তী লিপিগুলোর তুলনায় সবচে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সাবলীল। মনে হয় যেনো এক প্রকারের শর্ট হ্যান্ড]।

---

৩২. আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি (৬০৩-৬৮৮ খ্রি.) একজন বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ। তিনি ৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে হিজরত করে ইরাকের বসরা শহরে চলে যান। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম তিনিই আরবি ব্যাকরণের নীতিমালা তৈরি করেন। (মুছলেহউদ্দীন, ২০০৯: ১৮৯)

৩৩ . পুরো নাম তৈমুর বিন তারাগাই বার্লুস। তিনি পশ্চিম ও মধ্যএশিয়ার বিস্তৃর্ণ অঞ্চল নিজ দখলে এনে তৈমুরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সাম্রাজ্য ১৩৬৯ থেকে ১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব নেতৃত্বে সমাসীন ছিলো। (পালনপুরি, ২০২০: ১১৫)

উর্দু বর্ণমালায় ফারসির প্রভাব

ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, হিন্দাভি বা হিন্দুস্তানি (উর্দু ভাষার পূর্বনাম) ভাষাকে দেবনাগরি বর্ণমালাসহ বিভিন্ন বর্ণমালা দিয়ে লেখা হতো। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু কবি-সাহিত্যিক এ ভাষাটিকে দুই ধরণের বর্ণমালা দিয়েই লিখেছেন। উর্দু ভাষাকে ফারসি বর্ণমালা দিয়ে লেখার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় মোগল আমলে। তবে ফারসি কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) এ ভাষাকে ফারসি বর্ণমালা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনিই উর্দু ভাষাকে খাত্তে কুফি (خط کوفی) লিপিতে উপস্থাপন করেছেন। এরপর কুলি কুতুব শাহ (১৪৬৫-১৫১১ খ্রি) ফারসি বর্ণমালা দিয়ে হিন্দাভি ভাষায় সর্বপ্রথম সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন।

উপমহাদেশে মুসলমান তথা ফারসিভাষী সুফিদের আগমনের পর ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম খাত্তে কুফির (خط کوفی) প্রচলন ঘটে। এ ধরণের লিপি দিল্লির সুলতানদের শাসনামলের পূর্বপর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যবহার হতো। দিল্লির সুলতানি আমলে খাত্তে নাসাখ (خط نسخ)-এর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। শের শাহ শুরির (১৪৮৬-১৫৪৫ খ্রি.) শাসনামলেও এ ধরণের লিপি প্রচলিত ছিলো। মোগল সম্রাট জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) যদিও নতুন এক লিপি তথা খাত্তে বাবরি (خط بابری)-এর প্রবর্তক ছিলেন; তবে মোগল আমলে ভারতবর্ষে খাত্তে নাস্তালিক (خط نستعلیق) ই বেশি ব্যবহৃত হতো। (শামিম, ২০১২: ১১৯)

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ফারসির জায়গায় উপমহাদেশে যখন উর্দু ভাষার প্রচলন ঘটে তখন উত্তর ভারতে উর্দু ভাষার জন্যও খাত্তে নাস্তালিক (خط نستعلیق) ব্যবহার হতে থাকে। এখন পর্যন্ত এ ধরণের লিপি উর্দু ভাষার জন্য বহাল আছে। বৃটিশ আমলেও এ লিপি প্রচলিত ছিলো। বর্তমানে উর্দু ভাষার জন্য খাত্তে নাস্তালিকই (خط نستعلیق) ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রেসেও এই লিপির ব্যাপক চাহিদা আছে। ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি হরফগুলোকেও খাত্তে নাস্তালিক (خط نستعلیق)-এর আদলে সাজানো হয় এবং ভারতবর্ষে ফারসির জন্য খাত্তে নাস্তালিক (نستعلیق خط)-এর ব্যবহার দেখা যায়। (শামিম, ২০১২: ১২০) তাই খাত ও লিপির এ পরিক্রমায় উর্দু লিপির উপর ফারসি লিপির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

উর্দু ও ফারসি ভাষার সমন্বয়ে মিশ্রভাষার গজল

উর্দু ভাষার উপর ফারসি ভাষার প্রভাবের বিষয়টি প্রাথমিক যুগের কবি খাজা মাসউদ সাআদ সালমান (মৃত্যু ১১২১ থেকে ১১৩০ খিষ্টাব্দের মাঝে), বাবা ফরিদ উদ্দিন গাঞ্জেশেকার (১১৭৩-১২৬৫খ্রি.), আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.), কবির দাস (জন্ম ১৩৯৮ খ্রি.), গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রি.)-প্রমুখের কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। খাজা মাসউদ সাআদ সালমান (১১২১-১১৩০ খ্রি. মৃত্যু) থেকে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত উর্দু কবি অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.)-এর সময়কাল পর্যন্ত উর্দু ভাষার পরতে পরতে ইরানের সুফিবাদের বিষয়গুলো পাঠককে আলোড়িত করে তোলে। এ সময় উর্দু সাহিত্যচর্চার প্রচলন না থাকায় উপমহাদেশের কবিগণ মিশ্রভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। নিম্নে উর্দু ও ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি আমির খসরু (১২৫৩–১৩২৫ খ্রি.) কর্তৃক রচিত একটি মিশ্রভাষার গজল উল্লেখ করা হলো।

زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کہ تاب ہ جراں ندارم ای جان نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں

شبان ہجراں دراز چوں زلف وروز وصلت چو عمر کوتاہ سکھی پیاہ کو جو میں نہ دیکھو تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں

یکایک از دل دو چشم جادو بصد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے جو جاسنادے پیارے پی کو ہماری بتیاں

چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بعشق آں مہ نہ نیند نیناں نہ انگ چینا نہ آپ آئیں نہ بھیجیں پتیاں

بحق روز وصال دلبر کہ دادمارا فریب خسرو سپیت من کی ورائے راکھوں جو جانے پاؤں پیا کے گھتیاں

(কাদেরি, ১৯২৯: ৩১)

[প্রিয়! অসহায়ের অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টি এড়িয়ে যেওনা। নয়নে নয়ন রেখে তোমার সাথে কথা বলবো। বিচ্ছেদের জ্বালা আমি যে আর সইতে পারছিনা। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ বুকের পাঁজরে লেগে আছে।

বিচ্ছেদের রাত্রি কেশপুঞ্জের মতো দীর্ঘ। মিলনের দিন জীবনের মতো ক্ষণস্থায়ী। বন্ধু, প্রিয়তমাকে না দেখে আঁধার রাত্রি কাটে কেমন করে?

হঠাৎ তার জাদুময় দু'চোখ আমার প্রেমের ধোঁকায় প্রশান্তির শীতলতা বয়ে আনে। কেমন করে আমি পড়ে আছি; কেমন অবস্থায় আমি আছি; কেউ কি আমার প্রিয়তমাকে আমার কথাগুলো শুনিয়ে আসবে?

আমার প্রেমের হরহামেশা বিরহে আমি বালিকণার মতো আর প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির মতো জ্বলছি। চোখে ঘুম নেই, অঙ্গে স্বস্তি নেই, সে আসেও না চিঠিও পাঠায় না।

হে খসরু! কসম খেয়ে বলছি। প্রিয়তমা মিলনের দিন আমার সাথে প্রতারণা করেছে। যে স্থানে প্রিয়তমার পদচিহ্ন পড়ে সে স্থানে আমি প্রেমের জ্বালায় পুড়ে যাওয়া ছাই-ভস্মে পরিণত হওয়া আমার ব্যথিত হৃদয়কে সোপর্দ করলাম।]

উর্দু ভাষার কবিতার অবিরাম যাত্রায় ফারসি কবি আমির খসরু

পাক ভারতীয় কবিদের মাঝে কালিদাসের পর এবং রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) পূর্বে বিশ্ব সাহিত্যে ফারসি কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) উপমহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি উপমহাদেশে ফারসি ও উর্দু ভাষার প্রধান রূপকার। আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) উল্লিখিত গজলটি উর্দু সাহিত্যের পরবর্তীকালের কবিদের জন্য মাইলফলক হিসাবে কাজ করেছে। একটি দেশীয় ভাষা কী করে ফারসির ন্যায় উন্নত ভাষার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে– তা আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর থেকে ফারসিকে সামনে রেখে উর্দু কবিতার অবিরাম যাত্রা শুরু হয়। দিনে দিনে বিষয়বস্তু, শব্দ, বাক্যালঙ্কার ইত্যাদি সকল দিক থেকেই উর্দু ভাষার সঙ্গে

ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ব্যবধান বেড়ে চলে। অবশেষে অনেকেই উর্দুকে ভারতীয় ভাষা হিসাবে চিনতে সক্ষমতা হাড়ান। তারা মনে করেন উর্দু হলো মুসলমানদের তৈরি একটি কৃত্রিম ভাষা।

মোগল শাসকদের যুগে উর্দু ভাষার উপর ফারসির প্রভাব

সম্রাট জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) দিল্লির মসনদ (১৫২৬ খ্রি.) দখল করার পূর্বেই হিন্দাভি তথা উর্দু ভাষা সুদূর কাবুল থেকে বিহার পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে একটি সমাদৃত ভাষা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলো। উল্লেখ্য যে, সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) দিল্লি বিজয়ের পূর্বে এ ভাষাটি জানতেন। কারণ, সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) দিল্লি বিজয়ের পর মাত্র পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি দিল্লির সিংহাসনে সমাসীন হয়ে তৎকালে প্রচলিত উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেছেন। একটি কবিতায় সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) বলেন:

مجکانہ ہوا کچ ہوس مانک وموتی

আধুনিক উর্দু ভাষায় এই পঙ্‌ক্তিটি লিখলে যা দাঁড়ায় তা হলো:

مجھ کو نہ ہوا کچھ ہوس مانک وموتی

[আমার মণি-মুক্তার কোনো লোভ নেই।] (শিরানি, ১৯৮৫, খণ্ড,২: ৯)

তাই বলা যায়, মুহাম্মদ বিন কাসেম (৬৯৫-৭১৫ খ্রি.) থেকে সাতশো বছর পর সম্রাট বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) শাসনামলে উর্দু ভাষা ফারসির প্রভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করেছিলো এবং সুদূর কাবুল থেকে বিহার পর্যন্ত এ ভাষাটি একটি সমাদৃত ভাষা ছিলো।

সম্রাট বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) মাতৃভাষা ছিলো চাগতাই তথা তুর্কি। তাঁর স্বরচিত আত্মজীবনী *তুযকে বাবরি* (تزک بابری) তুর্কি ভাষায় রচিত। খোরাসানের শাসক বন্ধু হোসেন মির্জার দ্বারা তিনি খুব প্রভাবিত ছিলেন। বলা হয় তাঁর সংস্পর্শে এসে তিনি তৎকালীন জ্ঞান-গরিমার ভাষা ফারসি ও হিন্দুস্তানি তথা উর্দুভাষা শিখেন। সম্রাট বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) মানসিক ও শৈল্পিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিলো খোরাসানে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে মোগলদের স্থায়ীত্ব লাভে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। (হুসাইন খান, ১৯৯৩: ২৯)

সম্রাট বাবরের শাসনামলে উর্দু কবিতা

সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) যখন ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করলেন তখন ইব্রাহিম লোদির মাথা কেটে সম্রাট বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) সামনে রাখা হলো। এ সময় দরবারের জনৈক কবি হিন্দাভি তথা প্রাচীন উর্দু ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করেন। যেমন:

نوسے اپر تھا بتیسا　　پانی پتھ میں بھارت دیسا

اٹھیس رجب سکر بار　　بابر جیتا براہیم ہارا

[নয়শোর উপরে ছিলো আরো বত্রিশ, পানি পথে ভারত নামক দেশে। সময় আটাশ রজব শুক্রবার। সম্রাট বাবর যুদ্ধে জয় লাভ করলো আর ইব্রাহিম লোদি পরাজিত হলো।]

এ কবিতাটি পাঠে বুঝা যায় যে, এর রচয়িতা কোনো ফারসি জানা ভারতীয় কবি হবেন। কারণ, কেবল ফারসি ভাষাতেই ইব্রাহিমকে বারাহিম বলা হয়। (মোস্তফা খান, ১৯৯৩: ৩২)

দক্ষিণ ভারতে উর্দু কবিতা

মোগলসম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) এবং তাঁর রাজ দরবারের কবি-সাহিত্যিকগণ যখন ফারসি ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন তখন দক্ষিণ ভারতের শাসকদের দরবারে উর্দু সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য হিসাবে চর্চিত হচ্ছিলো। দক্ষিণ ভারতের শাসকগণ ছিলেন উর্দু সাহিত্যের অনেক বড় সংগঠক। উর্দু সাহিত্যের এ প্রাথমিক যুগে তাঁরা সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন না করলে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান রঙ্গ ও রূপ ভিন্ন প্রকৃতির হতো। মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.), সুলতান মুহাম্মদ কুতুব শাহ (১৫৯৩-১৬২৬ খ্রি.), আব্দুল্লাহ কুতুব শাহ (১৬১৪-১৬৭২ খ্রি.), আবুল হাসান কুতুব শাহ (১৬০০-১৬৯৯ খ্রি.)সহ দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডার একাধিক শাসকগণ গজল (غزل), রুবায়ি (رباعی), কাসিদা (قصیدہ) ও মারসিয়া (مرثیہ) লিখে উর্দু সাহিত্যকে মজবুত করেন।।

দক্ষিণ ভারতের আরেকটি রাজ্য বিজাপুরের শাসক দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদেল শাহ (১৫৫৬-১৬২৭ খ্রি.) এবং প্রথম আলি আদেল শাহও (১৫৫৮-১৫৯০ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের বড় মাপের কবি ছিলেন। এ সময় দক্ষিণ ভারতে মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.), মোল্লা নুসরাতি (মৃত্যু ১৬৮৩ খ্রি.) এবং ইবনুন নাশাতিসহ (মৃত্যু ১৬৫৫ খ্রি.) অনেক কবি-সাহিত্যিক উর্দু ভাষার উন্নয়নে কাজ করেছেন। যুগচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সাহিত্যকর্মগুলো যদিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু উর্দু সাহিত্যের ক্রমবিকাশে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। সূচনাপর্বে উর্দু সাহিত্যে ফারসির চেয়ে উপমহাদেশীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলোর প্রভাব বেশি ছিলো। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে।

চেঙ্গিস খান (১১৬২-১২২৭ খ্রি.) কর্তৃক আব্বাসীয়গণের ক্ষমতার পতন ঘটলে ইরানে চেঙ্গিস খানের (১১৬২-১২২৭ খ্রি.) বংশধর তাতারদের অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। তাতারদের অত্যাচারের কারণে ইরান থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী, লেখক-গবেষক, আলেম-উলামা ও শিক্ষিত নাগরিক দিল্লি ও আশ-পাশের এলাকায় পূর্ব থেকেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে করে ফারসিভাষী কবি-সাহিত্যিকদের সাথে ভারতীয়দের সখিত্ব গভীর হয়। সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ইরানি কবি-সাহিত্যিকগণ মোগল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ফারসিভাষীদের প্রতি সম্রাট বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) সহানুভূতি প্রবল ছিলো। ফলে মোগলসম্রাটগণ ইরান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত ফারসিভাষীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হন। বলা হয় সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) ও তাঁর বংশধরদের

রাজত্বকালে মোগল রাজদরবারে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষতা সাধিত হয়। (পাল, ১৯৫৪: ৮৯)

বাবর পুত্র সম্রাট হুমায়ুনের (১৫০৮-১৫৫৬ খ্রি.) শাসনামলে রাজদরবারে ফারসি কবিদের কদর বেড়ে যায়। তৎকালে সম্রাট হুমায়ুনের (১৫০৮-১৫৫৬ খ্রি.) প্রিয়পাত্র ছিলেন ফারসি কবি শেখ গুদায়ি। যিনি ফারসি কবিতার পাশাপাশি অনেক সময় রিখতা (ফারসি মিশ্রিত উর্দু) ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। (হুসাইন খান, ১৯৬৬: ১১৪) সম্রাট হুমায়ুনের (১৫০৮-১৫৫৬ খ্রি.) শাসনামলে ইরান থেকে প্রচুর কবি-সাহিত্যিক মোগল রাজদরবারে আসেন। এ কারণে উপমহাদেশের ভাষাগুলোর উপর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং সাথে সাথে মোগল দরবারে ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের মন-মানসিকতার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে থাকে।

মোগল আমলে ভারতবর্ষে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ফারসির প্রভাব

সম্রাট হুমায়ুনের (১৫০৮-১৫৫৬ খ্রি.) মৃত্যুর পর মোগল দরবারে ফারসি সমাদৃত ভাষা হয়ে উঠে । কারণ, তৎকালের শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ইরানের শৌর্য-বীর্য ছিলো চোখে পড়ার মতো। তুঘলক, আইবেক, শের শাহসহ অনেকেই দিল্লি ও ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন; কিন্তু তারা পেশিশক্তি ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হলেও চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তেমন কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হননি। ফলে তারা ভারতীয়দের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) শাসনামলে ইরান থেকে আগত ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে ভারতীয়দের মাঝে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার এক জোয়ার সৃষ্টি হয়। সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) নিজেও ফারসি ভাষাচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) দিল্লিতে প্রচলিত হিন্দাভি তথা উর্দু ভাষাটিও জানতেন। রাজপুত ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী স্ত্রীদের সাথে তিনি এ ভাষাতেই কথাবার্তা ও ভাববিনিময় করতেন। সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) এ ভাষাতে কথা বলার সময় প্রচুর পরিমাণ আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন। কালের আবর্তে এভাবে কথা বলা একটি রীতি হয়ে দাঁড়ায় এবং এ ভাষাটিই উর্দু ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে। তাই বলা যায় ভারতবর্ষে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ইরান ও ফারসি ভাষার অবদান অপরিসীম। (জালিবি, ১৯৮৬: ১৮)

সম্রাট আকবরের শাসনামলে উর্দু ভাষার বিভিন্ন নাম

সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.)-এর শাসনামলে মৌলাভি আবুল ফজল কর্তৃক রচিত *আইনে আকবরি* (آیئن اکبری) নামক গ্রন্থে উর্দু ভাষাকে যাবানে রোজেগার (زبان روزگار) প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ভাষা, যাবানে হিন্দাভি (زبان ہندوی) হিন্দ-সিন্ধু প্রদেশের ভাষা এবং যাবানে ওয়াক্ত (زبان وقت) যুগের ভাষা নামে অভিহিত করা হয়েছে। (জালিবি, ১৯৮৬: ৫৯)

সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) রাজমহলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাণীদের বিনোদনের জন্য ভারতীয় কবিতা ও সঙ্গীতচর্চার আসর বসতো। সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) ও ফারসিভাষীদের জন্য এ আসরগুলোকে উপভোগ্য করার লক্ষ্যে কবি-সাহিত্যিক ও সঙ্গীত শিল্পিগণ তাঁদের কবিতা ও বক্তব্যে প্রচুর পরিমাণ ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন। ফলে উর্দু ভাষা ফারসি শব্দভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হয়। বলা যায়, জাতিভেদে ভারতের বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রনে সর্বজনগ্রাহ্য ভাষাই হলো উর্দু।

সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) নিজেও উর্দু ভাষায় কবিতা চর্চা করেছেন। একটি কবিতায় সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) বলেন:

جاکو جس ہے جگت میں جگت سراہے جاہی　　تاکو جنم سپھل کہت اکبر ساہی

(জালিবি, ১৯৮৬: ৫৯।)

[পৃথিবীতে যার যত খ্যাতি, সে তত সুখি। তার জন্ম সফল, এ কথাটি সম্রাট আকবর বলেছেন।]

আরেকটি কবিতায় সম্রাট বলেন:

پیتھالا سو مجلس گئی، تان سین سو راگ　　ہانسی بو، رمی بو، بولی بو، گیسو بیر بل ساتھ

(হুসাইন খান, ১৯৯৪: ১১৮)

[পিথালা থাকলে গল্পের আসর জমে, তানসেন থাকলে সঙ্গীত জমে, আর গেসুবিরবল থাকলে হাসি-কৌতুক ও আড্ডা জমে।]

সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) শাসনামলে রাজধানী দিল্লি থেকে আগ্রায় স্থানান্তরিত হলে উর্দু ভাষা তার আদিমূল আর্যভাষার পরিশীলিতরূপ সংস্কৃত ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরবর্তীকালে রাজ্যের অর্থব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা রাজা টোডরমল রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা হিন্দু-মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে ফারসি ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক করেন। যার ফলে ফারসি ভাষার প্রচুর পরিমাণ শব্দ, পরিভাষা ও প্রবাদ-প্রবচন উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে। এতে করে ফারসি ভাষার সাথে উর্দু ভাষার সম্পর্কের আরো উন্নয়ন ঘটে এবং ফারসি সাহিত্যের ছোঁয়ায় উর্দু সাহিত্য নান্দনিকতার রূপ লাভ করে।

সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) শাসনামলে তাতারদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বহু সংখ্যক ফারসিভাষী দিল্লিতে পাড়ি জমান। ফারসিভাষী ইরানি পণ্ডিত-ব্যক্তিবর্গের সাহিত্যগুণে পূর্ব থেকেই সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) প্রভাবিত ছিলেন। ইরানি ঐতিহ্যের অনুসরণে সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) রাজদরবারে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার আয়োজন করেন। ফলে মোগল রাজমহল শিল্প-সাহিত্য, মুশায়েরা বা কাব্যচর্চা, নৃত্য আর সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় । (আব্দুল্লাহ, ১৯৬৭: ১৩)

সম্রাট আকবরের শাসনামলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের ফারসি সাহিত্যচর্চা

সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) শাসনামলের পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে তেমন কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হননি। কিন্তু সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) শাসনামলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হন। এ সময় হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে আঞ্চলিকভাষা উর্দু ব্যাপকভাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। আঠারো শতকের শেষের দিকে এসে আমরা ফারসি ও উর্দু ভাষায় হিন্দু সম্প্রদায়ের কতিপয় সাহিত্যসেবীকে ব্যাপক কাজ করতে দেখতে পাই। (জালিবি, ১৯৮৬: ৬১) তবে এ সময় ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় অনুবাদের কাজ বেশি হয়েছে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে উর্দুর উপর ফারসির প্রভাব

আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর (১৫৬৯-১৬২৭ খ্রি.) জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতিচর্চায় সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.)-এর চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। এ সময় রাজ দরবারে ফারসিভাষী ইরানিদের প্রভাব আরো বেড়ে যায়। ফারসি ভাষাচর্চার সাথে সাথে উর্দু ভাষাচর্চার এক আবহ সৃষ্টি হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৫৬৯-১৬২৭ খ্রি.) মাওলানা মুহাম্মদ মির নামক একজন বিখ্যাত আলেমকে উর্দু ভাষায় সহজ ও সকলের বোধগম্য করে পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের অনুবাদের নির্দেশ দেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৭০, খণ্ড ২: ৪৩)

সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে উর্দুর উপর ফারসির প্রভাব

সম্রাট শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬ খ্রি.)-এর মা ভারতীয় ছিলেন। তিনি মোগলদের মাতৃভাষা চাগতাই তুর্কি ভাষা কিছুই বুঝতেন না। তবে সম্রাট শাহজাহন (১৫৯২-১৬৬৬ খ্রি.) চাগতাই তুর্কি বুঝতেন কিন্তু তুর্কি ভাষাচর্চায় তিনি কখনো আগ্রহী হয়েছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সম্রাট শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬ খ্রি.)-এর শাসনামলে পণ্ডিত চন্দরভান রচিত ফারসি পঙ্‌ক্তি মিশ্রিত উর্দু কবিতামালার সন্ধান পাওয়া যায়। সম্রাট শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬ খ্রি.)-এর শাসনামলে উর্দু ভাষার দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। এর মাঝে একটি ছিলো উত্তর ভারতীয় ধারা। এ ধারায় ফারসি ভাষার প্রভাব বেশি ছিলো। আর অপর ধারাটি ছিলো দক্ষিণ ভারতীয় ধারা। এ ধারায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি ছিলো।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় দু'ধারার মিলনকেন্দ্র ছিলো বন্দরনগর গুজরাট। গুজরাট বন্দর নগর হওয়ার কারণে ইরান থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকগণ সর্বপ্রথম এ নগরে পাড়ি জমাতেন। গুজরাটের ভাষা ছিলো গুজরি; কিন্তু লেন-দেন এবং প্রচলিত কথ্যভাষা হিসাবে হাটবাজারে সকলের কাছে সমাদৃত ভাষা ছিলো ফারসি মিশ্রিত উর্দু। পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ গুজরাটে কম থাকায় উর্দু কবি-সাহিত্যিকগণ আদিলশাহি (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) ও কুতুবশাহি (১৫০৮-১৬৮৭ খ্রি.) রাষ্ট্রের আশ্রয়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন।

গুজরাটে উর্দু ভাষা

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.) দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ দখল করার বহুকালপূর্বে গুজরাট নগরী সাহিত্যউর্বর অঞ্চল ছিলো। ইরান থেকে আগত সুফি-সাধকদের কারণে উর্দু সাহিত্য এক নতুনমাত্রায় পৌঁছায়। ফারসি মিশ্রিত উর্দু কাব্যে সৃষ্টি হয় এক নতুন দিগন্ত। মোগলদের দিল্লির মসনদ দখল করার বহুকাল পূর্ব থেকেই গুজরাট, মুলতান, দিল্লি ও আশপাশের অঞ্চলগুলোর আঞ্চলিক ভাষাসমূহে ফারসি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। মোগলদের দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলসমূহ দখল করার পূর্বপর্যন্ত এখানে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি ছিলো।

এ সময় উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারত উর্দু সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রকাশনায় অনেকটা এগিয়ে ছিলো। উত্তর ভারতে আঠারো শতক পর্যন্ত সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গির সেমনানি (মৃত্যু, ১৪০৫ খ্রি,) বিরোচিত *রিসালায়ে নসর* (*رسالہ نثر*) আর আফজল ঝাঞ্জানাভি বিরোচিত মসনবি *রিসালায়ে বুক্‌ট কাহানি* (*رسالہ بکٹ کہانی*) ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়না। অথচ দক্ষিণ ভারতে চৌদ্দশতক থেকে শুরু করে আঠারো শতক পর্যন্ত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অসংখ্য বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিলো বলে প্রমাণ মিলে।

শেখ আইনুদ্দিন গাঞ্জুল ইল্‌ম (১৩০৬-১৩৯৩ খ্রি.), খাজা বান্দা নাওয়াজ সৈয়দ মুহাম্মদ গেসু দারাজ (মৃত্যু ১৪২২ খ্রি.), আবদুল্লাহ হুসাইনি (জন্ম ১৪৯৬ খ্রি.) ও মিরানজি শামসুল উশ্‌শাক (জন্ম, ১৪৯৬ খ্রি.) প্রমুখ এ সময়ে দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ উর্দু কবি-সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এদের প্রত্যেকের রচিত গ্রন্থাবলি তখন দক্ষিণ ভারত থেকে প্রকাশিত হয়ে গোটা ভারতে সমাদৃত ছিলো। এদের রচিত গ্রন্থাবলিতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

দক্ষিণ ভারতে উর্দু ভাষায় ফারসির প্রভাব

মোগলসম্রাট জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি বিজয়ের পূর্বে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিলো। গোলকুণ্ডায় কুতুব শাহি, বিজাপুরে আদিল শাহি, আহমদ নগরে নিজাম শাহি,বেদারিতে বারিদ শাহি এবং বেরারিতে ইমাদ শাহির শাসন ছিলো। পরবর্তীকালে ইমাদ শাহি, নিজাম শাহি এবং বারিদ শাহি শাসিত অঞ্চলগুলো আদিল শাহি দখল করে নেন।

কুতুব শাহি এবং আদিল শাহির শাসনামলে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। এ সময় দক্ষিণ ভারতের উর্দু ভাষায় দেশীয় শব্দসমাহারের যে বৈশিষ্ট্য ছিলো তা থেকে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য খানিকটা সরে আসে। ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দের পর সেলজুক আর তাতারদের অত্যাচারের কারণে ইরান থেকে আগত আলেম, শিক্ষিত সমাজ ও কবি-সাহিত্যিকগণ ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বসতি স্থাপন করেন। বিশেষত তাঁরা দক্ষিণ ভাতের আদিল শাহি (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) ও কুতুব শাহি (১৪৬৫-১৫৮৭ খ্রি.)

রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে দক্ষিণ ভারতের উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ধীরে ধীরে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে।

আদিল শাহি (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদেল শাহ (১৪৫০-১৫১০ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। তিনি নিজেও একজন ফারসি কবি ছিলেন। তাঁর ছেলে ইসমাঈল আদিল শাহও (১৪৯৮-১৫৩৪ খ্রি.) একজন ফারসি কবি ছিলেন। দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৮০-১৬২৭ খ্রি.) দক্ষিণ ভারতে উর্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেও একজন কবি ছিলেন। তাঁর রচিত *নাওবাস* (نوباس) নামক সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থটি বর্তমানে সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে সমাদৃত।

দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের পুত্র মুহাম্মদ আদিল শাহ (১৬১৫-১৬৫৭ খ্রি.) কবি না হলেও দক্ষিণ ভারতের উর্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন । গোলকুণ্ডার শাসক সুলতান কুলি কুতুব শাহ (১৪৬৫-১৫১১ খ্রি.)-এর কন্যা ছিলেন খাদিজা সুলতানা। বিয়ের সময় তিনি কয়েকজন দাস-দাসিকে আদিল শাহি রাজ্য বিজাপুরে নিয়ে আসেন। কথিত আছে যে, এই দাস-দাসির মাঝে কয়েকজন উর্দু কবি ছিলেন। মুহাম্মদ আদিল শাহ (১৬১৫-১৬৫৭ খ্রি.) এবং তাঁর স্ত্রী খাদিজা সুলতানার পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় অনেকগুলো উর্দু পুস্তক ও সহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়।

মুহাম্মদ আদিল শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ (১৬৫৭-১৬৭২ খ্রি.) নিজে একজন উর্দু কবি ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলে গোটা দক্ষিণ ভারতে উর্দু সাহিত্যচর্চার হিড়িক পড়ে যায়। ঘরে ঘরে কাব্যচর্চার আবহ সৃষ্টি হয়। মোল্লা নুসরাতি (১৬০০-১৬৭৪ খ্রি.), শাহ আমিনুদ্দিন আলা (১৫৮২-১৬৭৫ খ্রি.), সৈয়দ মিরা হাশেমি (১৬৩৫-১৬৯৭ খ্রি.), আমিন ইয়াগি (১৫৯১-১৬৭৫ খ্রি.) প্রমুখ ছিলেন এ সময়ে দক্ষিণ ভারতের উল্লেখযোগ্য উর্দু কবি। (হাশেমি, ১৯৫২: ১৩১)

দক্ষিণ ভারতের সাধারণ জনগণের ভাষা ছিলো উর্দু। কিন্তু আদিল শাহি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ (১৪৫০-১৫১০ খ্রি.) রাষ্ট্রভাষা করেন ফারসি। এরপর প্রথম ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৭০-১৬২৭ খ্রি.) ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রভাষা করেন উর্দু। প্রথম আলি আদিল শাহ (১৫৫৮-১৫৮০ খ্রি.) ক্ষমতায় এসে আবার রাষ্ট্রভাষা করেন ফারসি। দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৮০-১৬২৭ খ্রি.) ক্ষমতায় এসে পুনরায় রাষ্ট্রভাষাকে উর্দু করেন। এরপর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু আদিল শাহি সাম্রজ্যের পতন পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। রাষ্ট্রভাষার এ টানাপোড়েনের ফলে সাধারণ জনগণ উর্দু ভাষাচর্চার পাশাপাশি ফারসি ভাষাচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়।

উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ ভারতে আদিল শাহি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে উর্দু ভাষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। কিন্তু আদিল শাহি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ে যখন ভারতীয় ভাষাগুলো একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলো তখন উর্দু ভাষা নিজের আঞ্চলিক সীমারেখা পার করে ফারসি ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এ প্রভাবের কারণেই উর্দু ভাষা একটি সর্বজনীন ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

উর্দু ভাষার প্রথম কাব্য গ্রন্থকার

দক্ষিণ ভারতে কুতুব শাহি (১৫১৮-১৬৮৭ খ্রি.) রাষ্ট্রের আটজন রাষ্ট্রপ্রধান ফারসি ও উর্দু ভাষার কবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) ছিলেন উর্দু কাব্যের প্রথম গ্রন্থকার। কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) প্রায় এক লক্ষ কবিতা রচনা করেছিলেন। যার উল্লেখযোগ্য অংশ *কুল্লিয়াতে কুতুব শাহ* (کلیات قطب شاہ) নামক কাব্যসমগ্রে প্রকাশিত হয়েছে।

কুলি কুতুব শাহ-এর কবিতার বৈশিষ্ট্য

কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে কাব্য চর্চা করেছেন। তাঁর কবিতায় ভারতে ধর্ম পালনের রীতিনীতি, আনন্দ-বিনোদন, সাধারণ জনগণের দুঃখ-কষ্ট এবং বসবাসের বৈচিত্রময়তার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত কবিতায় ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমের সাম্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও মিশ্র সংস্কৃতিচর্চার আবহ পরিলক্ষিত হয়। (ইহতেশাম হুসাইন, ১৯৮৩: ৩৯)

মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর উত্তরাধিকারীদের মাঝে আরো তিনজন উর্দু কবি ছিলেন। এ সময়ের ভারতীয় কবিদের মাঝে অন্যতম হলেন মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.)। ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) রচিত ফারসি কবিতা তখন সকলের মুখে মুখে। ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) রচিত ফারসি কাব্যগ্রন্থের অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও পদ্য উপন্যাস *মাসনাভি কুতুবে মুশতারি* (مثنوی قطب مشتری) এবং গদ্য রচনা *সবরাস* (سب رس) উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে বেশ আলোচিত গ্রন্থ। এ সময়ের আরেকজন কবি হলেন ইবনুন নাশাতি (মৃত্যু, ১৫৭৩ খ্রি.)। তাঁর রচিত উর্দু উপন্যাস *ফুল বন* (پھول بن) এ প্রচুর ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, দক্ষিণ ভারতীয় উর্দু সাহিত্যও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলো।

দক্ষিণ ভারতের আদেল শাহি ও কুতুবশাহি রাষ্ট্রে উর্দু সাহিত্যের গুণগতবৈশিষ্ট্য

গোলকুণ্ডায় কুতুব শাহি (১৫০৮-১৬৮৭) রাষ্ট্রপ্রধানগণ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে উর্দু সাহিত্যের গুণগতবৈশিষ্ট্যে ফারসির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান ও কবি-সাহিত্যিকদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো নিবিড়। তাই কুতুব শাহির (১৫০৮-১৬৮৭ খ্রি.) সময়ে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বেশি ছিলো।

পক্ষান্তরে বিজাপুরে আদিল শাহির (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) সময়ে ইরানি কবি-সাহিত্যিকদের সাথে তাঁদের তেমন সম্পর্ক না থাকায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব বেশি ছিলো। এ সময় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৭০-১৬২৭ খ্রি.) কর্তৃক বিরচিত *গানে হিন্দাভি* নামক গ্রন্থে উর্দু ভাষার আঞ্চলিক চিত্র ফুটে উঠে। অথচ কুতুব শাহি (১৫০৮-১৬৮৭ খ্রি.) গোলকুণ্ডা রাষ্ট্রে সে সময়ের কবি ফিরোজ (১৫৬৪ খ্রি.), মাহমুদ ও খিয়ালি প্রমুখের কবিতায় ছন্দরীতি, বর্ণনার ঢং এবং শব্দ চয়নে সম্পূণরূপে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। (জালিবি, ১৯৮৬, খণ্ড ১: ৩৯১)

কুতুবশাহি রাষ্ট্রে উর্দু ভাষার উপর ফারসির প্রভাব

কুতুব শাহির (১৫০৮-১৬৮৭) শাসনামলে দক্ষিণ ভারতে প্রচুর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলি উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়। ফারসি গজল (غزل), কাব্য-উপন্যাস বা মাসনাভি (مثنوی), প্রশংসাজ্ঞাপক কবিতা কাসিদা (قصیدہ), শোকগাথা কবিতা মারসিয়া (مرثیہ) উর্দু ভাষায় অনূদিত হলে দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত উর্দু ভাষা ও সাংস্কৃতিতে নবজোয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতের সাধারণ পাঠক ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের মিষ্টরস আস্বাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং ভারত ও ইরানের কৃষ্টি-কালচারের আদান-প্রদানে এক নতুন সংস্কৃতির দুয়ার উন্মোচিত হয়।

এ সময় দক্ষিণ ভারতের খ্যাতনামা কবি ফিরোজ (১৫৬৪ খ্রি.), কবি মাহমুদ ও কবি খিয়ালি প্রমুখ ভারতীয় কাব্যরীতি থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে ফারসি কাব্যরীতির আদলে উর্দু কবিতা রচনার প্রয়াস চালান। পরবর্তীকালে গোটা ভারতের উর্দু কবিগণ এ রীতি অনুসরণ করেন। মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) বিরচিত *সাবরাস* (سب رس) গ্রন্থটি ফারসি রীতির আলোকে রচিত হওয়ায় আজও তা উর্দু সাহিত্যের পাঠকগণের কাছে আদৃত একটি গ্রন্থ। *সাবরাস* (سب رس) গ্রন্থে লেখক কেবল ফারসি শব্দমালা এবং প্রবাদ ব্যবহার করেননি; বরং ফারসি গদ্যের আলোকে উর্দু গদ্যকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস চালিয়েছেন।

উত্তর ভারতে উর্দু ভাষায় ফারসির প্রভাব

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.)-এর শাসনামলে উত্তর ভারতের উর্দু সাহিত্যচর্চা আরো শাণিত হয় । ১৬৮৭ খিষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত বিজয় হলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে উর্দু সাহিত্যচর্চার সেতুবন্ধন তৈরি হয়। দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পূর্বে উত্তর ভারতে উর্দু কথ্যভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পর এখানকার কবি সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে এসে উত্তর ভারতের ফারসি কবিগণ উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করেন। ফলে উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব পড়ে এবং উত্তর ভারতে উর্দু ভাষায় সাহিত্যচর্চা জোরালো হয়।

এ সময় অঞ্চলভেদে উর্দু ভাষার নামও ছিলো ভিন্নভিন্ন। দক্ষিণ ভারতে উর্দু ভাষাকে হিন্দি (ہندی) বা দাকানি (دکنی) বলা হতো। উত্তর ভারতে বলা হতো হিন্দুস্তানি (ہندوستانی)। দিল্লি ও তার আশপাশের এলাকায় এ ভাষার নাম ছিলো উর্দুয়ে মুআল্লা (اردوئے معلی)। মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি)-এর শাসনামলে কবি সিরাজ উদ্দিন খান আরজু[৩৪] (১৬৮৭-১৭৫৬ খ্রি.) তাঁর রচিত গ্রন্থাবলিতে এ ভাষাকে সর্বপ্রথম উর্দু নামে অভিহিত করেন। (সব্‌জ ওয়ারি, ১৯৬০: ৯২-৯৩)

---

৩৪. কবি সিরাজুদ্দিন খান আরজু (১৬৮৭-১৭৫৬ খ্রি.)। ভারতের আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম সিরাজ উদ্দিন খান আরজু। ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু প্রসিদ্ধ কবিদের শিক্ষক। মূলত তিনি একজন ফারসি কবি ও ভাষা বিজ্ঞানী। ভারতের একজন ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম এ দাবি করেন যে, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষার মুল শিকড় এক ও অভিন্ন। নাদের শাহ (১৬৮৮-১৭৪৭ খ্রি.) দিল্লি আক্রমণ করলে তিনি লাক্ষ্ণৌ চলে যান। ফারসি কবি হলেও তিনি ১২৭ টি উর্দু কবিতা লিখেছেন। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে লাক্ষ্ণৌতে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং দিল্লিতে এনে তাঁকে দাফন করা হয়। উর্দু সাহিত্যের খ্যাতিমান কবিগণ যেমন মির্জা মাজহার জানেজানা (১৭০০-১৭৮০ খ্রি.), মির্জা রফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.), মির দারদ (১৭২০-১৭৮৫ খ্রি.), মির তাকি মির (১৭২৩-

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগিরের শাসনামলে উর্দু

মূলত মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.)-এর শাসনামলে এ ভাষার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। সুদূর আফগানিস্তানের কাবুল থেকে নিয়ে বাংলাদেশের চট্রগ্রাম পর্যন্ত এবং কাশ্মির থেকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিনোদন ও সাহিত্যচর্চার সমাদৃত ভাষা ছিলো উর্দু। ধীরে-ধীরে উপমহাদেশের মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির ভাষা উর্দু সকলের মন জয় করে নেয়। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষার স্থলে সর্বত্র উর্দু ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্বে যেখানে পাঠদানের মাধ্যম ছিলো ফারসি; সেখানে উর্দু হয়ে ওঠে পাঠদানের প্রধান মাধ্যম। তবে উন্নত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিচর্চার প্রধান মাধ্যম হিসাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের আবেদন তখনো বিদ্যমান ছিলো।

দিল্লিতে অলির আগমন

অলিকে (১৬৬৮-১৭৩২ খ্রি.) উর্দু কবিতার বাবায়ে আদম (بابائے آدم) খেতাব দেওয়া হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.)-এর শাসনামলে দক্ষিণ ভারত বিজয় হলে অলি (১৬৬৮-১৭৩২ খ্রি.) দক্ষিণ ভারত থেকে দিল্লি আসেন। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) তৎকালে দিল্লিতে বিনোদনের প্রধান আকর্ষণ মুশায়েরা বা কবিতা পাঠের আসরগুলোকে নিজ কবিতাগুণে মাতিয়ে তোলেন। অলি (১৬৬৮-১৭৩২ খ্রি.)-এর কবিতার মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতের কবি-সাহিত্যিকগণ দক্ষিণ ভারতের উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যলাভ করেন এবং মূলত দিল্লির কবি-সাহিত্যিকগণ অলি (১৬৬৮-১৭৩২ খ্রি.)কে এ খেতাবে ভূষিত করেন।

বাবায়ে আদম অর্থ এ নয় যে, অলি (১৬৬৮-১৭০৭ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি; বরং বাস্তবতা হলো অলি (১৬৬৮-১৭০৭)-এর পূর্বে দক্ষিণ ভারতে মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.), গাওয়াসি (মৃত্যু, ১৬২৩ খ্রি.), মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.), আলি আদিল শাহ (১৫৫৮-১৫৮০ খ্রি.), হাশেমি (মৃত্যু, ১৬৯৭ খ্রি.) ও নুসরতি (মৃত্যু, ১৬৭৪ খ্রি.)-এর মতো বহু খ্যাতিমান কবি উর্দু সাহিত্যে নিজ নিজ প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। (পাল, ১৯৬২: ৬৭)

উর্দু ভাষার জন্য ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা

১৮০০ শতকের পর দিল্লি ও তার আশপাশের অঞ্চলসমূহে প্রচলিত উর্দুকে মূলভিত মনে করে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের জন্য ব্যাকরণ সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি ও অভিধান তৈরির কাজ শুরু হয়। ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রিন্সিপাল ড. জন গিলক্রিষ্ট[৩৫](১৭৫৯-১৮৪১ খ্রি.)

১৮১০ খ্রি.) প্রমুখ তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, খণ্ড ২: ৪৮৭)

৩৫. ড.জন ব্রথউইক গিলক্রিষ্ট (১৭৫৯-১৮৪১ খ্রি.) [John Borthwick Gilchrist] হলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। তিনি ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ইডেনবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন চিকিৎসক ও ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন। ভারতে প্রচলিত ভাষাসমূহের উৎস নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তাঁর উদ্যোগে অসংখ্য বই-পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি উর্দু ভাষা শিক্ষার

সর্বপ্রথম উর্দু ভাষার জন্য ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। ড. জন গিলক্রিষ্টকে উর্দু ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নের প্রাণপুরুষ মনে করা হয়।

উর্দু ভাষার সংস্কার আন্দোলন

উর্দু ভাষা যেহেতু আর্যভাষার প্রাকৃতরূপ থেকে সৃষ্ট এবং ভারতবর্ষের বিস্তৃত এলাকার সর্বজনগ্রাহ্য একটি ভাষা; তাই স্বভাবগতভাবেই উর্দু ভাষার মধ্য দিয়ে উদারতা আর সাম্যের জয়গান গাওয়া হয়। উর্দু ভাষাচর্চায় ভারতের অধিক সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এ ভাষায় ব্যাপক আঞ্চলিকতার প্রভাব পড়ে। উর্দু ভাষায় আরবি ও ফারসি থেকে আগত মূল শব্দমালায় আসে বিকৃতি। তাসবিহ (تسبیح) শব্দের উচ্চারণ 'তে (ت), সিন (س), বে (ب), ইয়া (ی) এবং শেষে হে (ح) হবে কি না? এ নিয়ে ব্যাপক মতানৈক্য দেখা দেয়। উর্দু ভারতীয় ভাষা হিসাবে উচ্চারণের দিকে লক্ষ করলে শেষে হে (ح) অক্ষর সংযোজিত না হওয়ার কথা। এ সকল অজুহাতে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দগুলো বিকৃতরূপে ব্যবহৃত হচ্ছিলো। এমনকি অনেক স্থানে এরূপশব্দগুলো তার মৌলিকত্ব হারায় এবং অঞ্চলভেদে উর্দু ভাষার শব্দমালায় পরিবর্তন ঘটে।

মির্জা মাজহার জানেজানা (১৭০০-১৭৮০ খ্রি.)সহ উর্দু ভাষার একদল ভাষাবিজ্ঞানী এ ভাষার সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে সামনে নিয়ে উর্দু ভাষার শব্দের লিখিত রূপ ও উচ্চারণে সংস্কার আনার প্রয়াস চালান। অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মূল আরবি-ফারসি শব্দগুলোর বানানরীতিতে ফারসি বা আরবি ভাষায় যে বানান রয়েছে তারই অনুরসরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো বানানরীতি গ্রহণযোগ্য হবে না। (জুর, ১৯৬০: ১২২)

ভাষা সংস্কারের এ নীতিমালা মির্জা মাজহার জানেজানা (১৭০০-১৭৮০ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে হওয়ায় উর্দু ভাষার ইতিহাসে এ ভাষা সংস্কার আন্দোলনকে তাহরিকে মির্জা মাজহার (تحریک مرزا مظہر) বা মির্জা মাজাহারের ভাষা সংস্কার আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়।

কবি ইনশা উল্লাহ খান ইনশা[৩৬] (১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.), হায়দার আলি আতিশ (১৭৭২-১৮৪৬ খ্রি.) ও আকবর ইলাহবাদি (১৮৪৬-১৯২১ খ্রি.) এ সংস্কার নীতিমালার বিরোধিতা করেন। কবি ইনশা উল্লাহ খান ইনশা (১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.) তার লিখিত *দরইয়ায়ে লাতাফাত* (دریائے لطافت) নামক গ্রন্থে এ আন্দোলনের বিরোধিতা করে বলেন:

প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণেতা। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের প্যারিস শহরে মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, খণ্ড,১: ১৩১)

৩৬. কবি ইনশা উল্লাহ খান ইনশা (১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.) আঠারো শতাব্দীর শেষে এবং উনিশ শতাব্দীর সূচনা পর্বের একজন উর্দু কবি। তিনি উর্দু ভাষার জন্য সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, খণ্ড,২: ৬৮৯)

"جاننا چاہیے کہ جو لفظ اردو میں آیا وہ اردو ہو گیا، خواہ وہ لفظ اردو ہو یا فارسی، ترکی ہو یا سریانی، پنجابی ہو یا یورپی، اصل کے رو سے غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اردو کا لفظ ہے، اگر اصل کے موافق مستعمل ہے تو بھی صحیح اگر اصل کے خلاف ہے تو بھی صحیح، اس کی صحت اور غلطی اس کے اردو میں رواج پکڑنے پر منحصر ہے، کیوں کہ جو چیز اردو کے خلاف ہے وہ غلط ہے، گو اصل میں صحیح ہو، اور جو اردو کے موافق ہے وہی صحیح ہے خواہ اصل میں صحیح نہ بھی ہو"

(ইনশা, ১৯৩৫: ৩৫২)

[এ বিষয়টি সকলের জানা থাকা দরকার যে, যে শব্দটি অন্য কোনো ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় এসেছে তা উর্দু ভাষার শব্দ হিসাবে বিবেচিত হবে। চাই সে শব্দটি উর্দু, ফারসির, তুর্কি, হিব্রু, পাঞ্জাবি হোক অথবা ইউরোপীয় হোক। শব্দমূল হিসাবে তা ভুল হোক বা শুদ্ধ, সে শব্দটি উর্দু ভাষার শব্দ হিসাবে বিবেচিত হবে। যদি শব্দটি ধাতুমূল হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলেও শুদ্ধ আবার ধাতুমূলের বিপরীত অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ করলেও শুদ্ধ। এই শব্দের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা উর্দু ভাষায় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল। কারণ যে বিষয়টির অবস্থান উর্দু ভাষার প্রচলিত ভাষারীতির বিপরীতে তা মূলে শুদ্ধ হলেও উর্দু ভাষায় অশুদ্ধ। আবার মূলে অশুদ্ধ হলেও যে বিষয়টি উর্দু ভাষার প্রচলিত নিয়ম-রীতির অনুগামী, তাই শুদ্ধ বলে বিবেচিত।]

কবি ইনশার বিরোধিতার মূল কারণ

কবি ইনশার (১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.) এ বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিলো উর্দু বানানরীতির ক্ষেত্রে ফারসি বা অন্যকোনো ভাষার বানানরীতিকে সামনে না রাখা; বরং উর্দু বানানরীতি হবে উর্দু ভাষাভাষীর উচ্চারণবিধি বিবেচনা করে। মূলত ভাষা সংস্কারের এ সময়ে নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালির দিল্লি আক্রমণ এবং মারাঠাদের বারংবার লুটতরাজের ফলে দিল্লির নাগরিকজীবন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছিলো। মোগলসম্রাটগণ হারিয়ে ফেলেছিলো তাঁদের সমৃদ্ধি ও গৌরব। তখন দিল্লির কবি-সাহিত্যকগণ নিরাপদ জীবনের আশায় লাক্ষ্ণৌতে পাড়ি জমান। উর্দু সাহিত্য প্রতিভা লাক্ষ্ণৌর নবাবদের দরবারের প্রভাবে একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিলো। কবি-সাহিত্যিকদের স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চার সুযোগ ছিলো না। উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) ও সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) ছাড়া প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিককে নবাবদের মর্জি মোতাবেক পরাধীনভাবে সাহিত্যচর্চা করতে হয়েছিলো। উর্দু সাহিত্যে বানানরীতির ব্যাপারে তখন কবি-সাহিত্যিকগণ প্রত্যেকেই নিজেকে একজন ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে জাহির করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। ফলে উর্দু সাহিত্যের অবস্থা হয়েছিলো নিতান্তই শোচনীয়।

ইনশা উল্লাহ খান ইনশা (১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ফারসি ভাষার বাহুডোর থেকে পৃথক করে উর্দু ভাষার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন। এরপর উনিশ শতকে আবু লাইস সিদ্দিকি (১৯১৬-১৯৯৪ খ্রি.) উর্দু ব্যাকরণ ও বানানের ২৫টি নিয়ম সম্বলিত *জামিউল কাওয়ায়েদ* (جامع

القواعد) নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। বিশ শতকে উর্দু ব্যাকরণ ও বানান বিষয়ক অনেকগুলো গ্রন্থ রচতি হয়েছে। এর মধ্যে ফাতাহ মুহাম্মদ খান জালান্ধারির (১৮৬৪-১৯৩৮ খ্রি.) *মিসবাহুল কাওয়ায়েদ* (مصباح القواعد) এবং বাবায়ে উর্দু মৌলাভি আব্দুল হকে (১৮৭০-১৯৬১ খ্রি.) কর্তৃক রচিত *কাওয়ায়েদে উর্দু* (قواعد اردو)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উর্দু বানানরীতি প্রনয়নে শেখ ইমাম বখ্শ নাসিখ

শেখ ইমাম বখশ নাসিখ[৩৭] (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) এর উদ্যোগে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য ফারসি ভাষার কাঠামোতে আবার ফিরে আসে। নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। লাক্ষ্ণৌর কবি ইমাম বখশ নাসেখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে সামনে রেখে উর্দু ভাষার বানানরীতি তৈরির প্রয়াস চালান। তিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের বানানরীতির ব্যাপারে কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করেন।

১। নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) পূর্ব উর্দু ভাষাকে বিভিন্ন নামে বিশেষত রিখতা নামে অভিহিত করা হতো। নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) উর্দু ভাষাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত না করে শুধু উর্দু নাম নির্ধারণ করেন। শুরুতে এ বিষয়টি দিল্লিতে গৃহীত হয়নি। পরে অবশ্য গোটা ভারতে রিখতা নাম বর্জন করে এ ভাষাকে উর্দু নাম দেওয়া হয়।

২। গজলকে উর্দু ভাষায় রিখতি বলা হতো। কবি নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) রিখতিকে গজল বলে অভিহিত করেন। এ বিষয়টিও বহুদিন পর্যন্ত দিল্লিতে গৃহীত হয়নি। উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) নিজেও উর্দু গজলকে চিরকাল রিখতি বলেছেন।

৩। নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) রাদিফ ও কাফিয়া ছন্দরীতির ভিত্তি ক্রিয়াপদের উপর স্থাপতি করেন এবং ফারসি ছন্দরীতি অনুসরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৪। পূর্বে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত আরবি, ফারসি ও হিন্দি শব্দের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নির্ধারণে বিশৃংখলা বিরাজমান ছিলো। নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) একে এক ও অভিন্ন নিয়মের অধীনে আনার চেষ্টা করেন।

৫। উর্দু কবিতার ছন্দের নিয়মাবলি নির্ধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণরূপে ফারসি ছন্দ ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করেন।

---

৩৭. কবি নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের লাক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যজীবন লাক্ষ্ণৌতে অতিবাহিত হয় এবং লাক্ষ্ণৌতেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি আরবি ও ফারসি সাহিত্যের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চিরজীবন অবিবাহিত অর্থাৎ চিরকুমার ছিলেন। নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.)) রচিত কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। একারণে তাঁর কবিতায় ভাবগাম্ভীর্য বেশি আর রসবোধ কম। তিনি উর্দু বানানরীতির বিষয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে সামনে রেখে সংস্কার করার চেষ্টা করেন। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, ২য় খণ্ড: ৭২৭)

৬। পূর্বে উর্দু সাহিত্যে গজলকাব্য ছিলো কেবল প্রেমের বাহন। প্রেম ব্যতীত গজল রচনা হতো না। নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) গজলের বিষয়ে বৈচিত্র আনেন। এ বিষয়টি উর্দু সাহিত্যের সকল মনীষা অকপটে গ্রহণ করেন। (ইউসুফ, ১৯৬৯: ১৩০)

কবি নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.)-এর নির্দেশিত পথেই ফারসি ব্যাকরণ ও অলঙ্কাররীতিকে সামনে রেখে উর্দু ব্যাকরণ ও অলঙ্কাররীতির সকল পরিভাষা তৈরি করা হয়েছে।

ধ্বনিতত্ত্বে উর্দুর উপর ফার্সির প্রভাব

উর্দু ভাষায় নানা ভাষার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে আর্যদের আদলে প্রাচীন হিন্দুস্তানি এবং সেমেটিক ভাষাগুলোর প্রভাব রয়েছে। ভারত উপমহাদেশে আর্য, অনার্যসহ অনেক ভাষার সমারোহ রয়েছে। এর ভাষা ও জাতিবৈচিত্র্য এতদঞ্চলের ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনির পরিধিকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। উর্দু ধ্বনিতত্ত্বে ফারসি ধ্বনিতত্ত্বের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে।

ইনশা উল্লাহ খান ইনশা (১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.) উর্দু ভাষায় ৮৫ টি (صوتیہ/Phoneme) ধ্বনি আছে বলে উল্লেখ করেছেন। (খান, ১৯৮৮: ৩১) অপরদিকে বর্তমানকালের গবেষক নাসির আহমদ খান বলেন: উর্দু ভাষায় ধ্বনির সংখ্যা ৫৮টি। (রাওয়াবেত, ২০১২: ১২৪)

উর্দু ভাষায় ধ্বনির সংখ্যা নিয়ে এ মতপার্থক্যের কারণ হলো, এখন পর্যন্ত উর্দু ভাষার ধ্বনি সম্পর্কে তেমন কোনো গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি। এমন কোনো ধ্বনি নির্ণায়ক চিহ্নের সর্বসম্মত কোনো রূপরেখাও গড়ে উঠেনি– যা উর্দু ধ্বনির মূলরূপ প্রকাশে সামর্থ্য রাখে। আন্তর্জাতিক ধ্বনি সংস্থা (IPA)-এর চিহ্নগুলো উর্দু ভাষার জন্য সঙ্গত ও যথাযথ নয়। (বুখারি, ১৯৯১: ১৩)

পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য ভাষার মতো উর্দু ভাষার ধ্বনিও দুই প্রকার। যথা: (১) মুসাওয়াতে জায়িফ (مصوت ضعیف) (দুর্বলধ্বনি/স্বরবর্ণ/Vowel) (২) মুসাওয়াতে কাভি (مصوت قوی) (সবল ধ্বনি/ব্যঞ্জনবর্ণ/ Consonent)। ধ্বনিতত্ত্বেও উর্দু ভাষার উপর ফারসির প্রভাব সুস্পষ্ট। উর্দু ধ্বনিতে ফারসির সকল ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার হয়। নিম্নে ফারসি ধ্বনির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উর্দু ধ্বনিতত্ত্বের কয়েকটি নীতিমালা উল্লেখ করা হলো।

১. ফারসি ভাষায় আরবি ভাষার যেসকল ধ্বনি উহ্য থাকে উর্দু ভাষাতেও সেসকল ধ্বনি উহ্য থেকেই ব্যবহৃত হয়।

২. হামযা (ء) ধ্বনিটি আরবি থেকে ফারসিতে এসেছে এবং ফারসির হাত ধরেই এ বর্ণটি উর্দু ভাষায় প্রবেশ করেছে।

৩. আরবি যাল (ذ) বর্ণটি ফারসি ঝা (ژ) ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। উর্দু ভাষায় এটিকে ফারসির অনুসরণে ঝা (ژ)-ই উচ্চারণ করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ফারসির যেসকল পরিবর্তিত ধ্বনি বর্তমানে ফারসিতে প্রচলিত আছে, সেগুলো হুবহু উর্দু ভাষাতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন:

باد	Wad	واد
بد	Wad	ود
نامہ	Namag	نامک
آرزو	Awarzog	آورزوگ

৪. ফারসি স্বরবর্ণে যেভাবে জের, জবর, পেশ এবং আলিফ, ওয়াও এবং ইয়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। উর্দু ভাষাতেও তা সেরূপ ব্যবহৃত হয়। তবে আধুনিক উর্দু ও ফারসি ভাষায় জবর, জের, পেশ ইত্যাদি সংখ্যায় কোনো ব্যবধান না থাকলেও উচ্চারণে ব্যবধান আছে।

উর্দু ধ্বনির বিশেষ বৈশিষ্ট্য

উর্দু ধ্বনির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীর বড় বড় ভাষাগুলোর অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণ ও লেখ্যরূপ প্রকাশের সক্ষমতা উর্দু ভাষার রয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় এইরূপ দেখা যায় না। উর্দু ভাষায় হিন্দি, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি বর্ণের ধ্বনিও রয়েছে এবং এ ধ্বনিগুলো উর্দু ভাষায় সাবলীলভাবে লেখা ও উচ্চারণ করা যায়।

সরফ (صرف)-শব্দপ্রকরণশাস্ত্রের আলোকে উর্দুর উপর ফারসির প্রভাব

উর্দু ও ফারসির ব্যাকরণগত দিক থেকে পারস্পরিক বন্ধন অতি প্রাচীন ও সুগভীর। উর্দু ব্যাকরণ ফারসি ব্যাকরণের অধীনেই গড়ে উঠেছে। আর ফারসি ব্যাকরণ ও শব্দগঠন আরবি ব্যাকারণ ও শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। উর্দু ও ফারসি হলো ইন্দো-আর্য ভাষাশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তবে দুই ভাষার ব্যাকরণে সেমেটিক প্রভাব প্রবল। কারণ, উৎসগত দিক থেকে এ ভাষা দুটোর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

উর্দু ও ফারসি ব্যাকরণবিদদের মধ্যে কেবল আরবি ব্যাকরণেরই প্রভাব পরিলক্ষিত নয়; বরং ইন্দো-আর্য শ্রেণির ব্যাকরণের প্রভাবও লক্ষণীয়। এর কারণ হলো, উর্দু ও ফারসি উভয় ভাষায় যৌগিক বাক্যের বহুল ব্যবহার রয়েছে। ফলে এ ভাষা দু'টোর বাক্যের গঠনপ্রণালিতে উল্লিখিত ব্যাকরণিক নীতিমালার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে এ কথা সত্য যে, ইরানে ইসলাম আগমনের পর থেকে তিনশত বছর পর্যন্ত ইরানিদের উপর আরবদের বলিষ্ঠ প্রভাব বলবৎ ছিলো। (খান, ১৯৯৫: ২১)

ইসলাম আগমনের পূর্বে কালদানীয় (كلدانى), আরামীয় (آرامى) এবং সুরিয়ানীয় (سريانى) ভাষা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের পর তথা আরব কর্তৃক পারস্য বিজয়ের পর কুরআনের আরবি ভাষা ফারসির উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যা ছাড়া ফারসির পক্ষে সামনে চলা অসম্ভ ছিলো। ঠিক একই অবস্থা উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হয়েছে। একটা সময় ছিলো, ফারসি ব্যতীত উর্দু এক কদমও আগে বাড়তে সক্ষম ছিলো না। আরবি ভাষার যে সকল প্রভাব ফারসি ভাষায় জায়গা করে নিয়েছিলো সেসকল প্রভাবই ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় বদ্ধমূল রয়েছে। (শামিম, ২০১২: ১৩৯)

তিনশো বছর পর্যন্ত আরবি ভাষার আধিপত্যের পর ফারসি ভাষা ও সহিত্যে আবার নতুন জাগরণ সৃষ্টি হয়। ফারসি স্বীয় মহিমায় উন্নতি লাভ করতে শুরু করে। তবে সে সময় আরবির প্রভাব ফারসি ভাষায় এতো প্রবল ছিলো যে, এর থেকে দৃষ্টি ফেরানো ছিলো কঠিন । সামানি শাসনামলে (৮৭৪-৯৯৯ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্য নতুনভাবে তার চলার পথ তৈরি করে এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সে পথে অগ্রসর হয়। উপমহাদেশ তথা পাকিস্তান ও ভারতের সরকারি, জ্ঞানচর্চা এবং পঠন-পাঠনের ভাষা হিসেবে ফারসি ভাষা (১৯০০) ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। এ কারণে উর্দু ব্যাকরণ তথা নাহু-সরফ ফারসি নাহু-সরফের আদলেই গড়ে উঠেছে।

উপমহাদেশে বহু আগ থেকেই ফারসি ব্যাকরণ তথা নাহু-সরফ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা হয়েছিলো। তবে উর্দু ভাষার ব্যাকরণ রচনা হয় ঊনবিংশ শতকে। এ কারণে উর্দু ভাষার ব্যাকরণ বা নাহু-সরফ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ রচনা করে ব্রিটিশরা। ভারতবর্ষে উপনিবেশ গড়ার পর খিষ্টধর্মের প্রচার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ইংরেজরা উপমহাদেশের ভাষাগুলো রপ্ত করতে থাকে। তারা ইংরেজি ভাষাভাষী এবং তাদের সমমনা অন্যান্য জাতির মানুষকেও এ অঞ্চলের ভাষা শিখাতে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনার প্রতি মনোযোগ দেয়। তবে এ সকল গ্রন্থ তারা নিজেদের ভাষায় রচনা করে। এ গ্রন্থগুলো ফরাসী, ল্যাটিন, ইংরেজি ভাষায় লেখা হতো। (রব্বানী, ২০১৪: ৩৯৪)

এ সকল গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষায় এবং ল্যাটিন ভাষার ব্যাকরণিক স্টাইলে রচিত হওয়ায় পরবর্তীকালে উর্দু ভাষায় রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলোতে এগুলোর যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। কেননা এগুলোর রচয়িতাগণ ল্যাটিন ভাষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং ল্যাটিন ভাষার ঢঙ্গে এ গ্রন্থগুলো রচনা করেন। ফলে অন্যভাষাভাষী এ গ্রন্থগুলো থেকে তেমন উপকার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। (শামিম, ২০১২: ১৪০)

উর্দু ভাষার ব্যাকরণে ফারসি ব্যাকরণের প্রভাব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'ব্যাকরণগত দিক থেকে উর্দু ও ফারসির পারস্পরিক বন্ধন অতি প্রাচীন ও সুগভীর'। আরবি ও ফারসি ব্যাকরণবিদদের অনুকরণে উর্দুর প্রাচীন ব্যাকরণবিদগণও শব্দকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। পাঠ্যবইগুলোতেও এ শ্রেণিবিন্যাসই বহাল আছে। যেমন: ১। ইসিম (اسم)। ২ ফেয়েল (فعل) ৩। হরফ (حرف)।

তবে বাবায়ে উর্দু মৌলাভি আবদুল হক (১৮৬৪-১৯৬১ খ্রি.) উর্দু শব্দকে তার মৌলিকত্বের দিকে লক্ষ রেখে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: ১। মোস্তাকবেল (مستقبل) ও ২। গায়রে মোস্তাকবেল (غیر مستقبل)

আবার মোস্তাকবেল শব্দ ৫ প্রকার। যথা:১। ইসিম (اسم) ২। সিফাত (صفت) ৩। জামির (ضمیر) ৪। ফেয়েল (فعل) ও ৫। তামিজ (تمیز)

গায়রে মোস্তাকবেবল শব্দমালা দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য হলো হরফ তথা অব্যয়সমূহ। এগুলো ৪ প্রকার। যথা: ১। রাব্‌ত (ربط) ২। আত্‌ফ (عطف) ৩। তাখসিস (تخصیص) ও ৪। ফুজাইয়াহ (فضاییہ)। (শামিম, ২০১২: ১৩৯)

ফারসি ভাষার উপর উর্দুর ভাষার প্রভাব

উল্লেখ্য যে, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে যেমন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে; তেমনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপরও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। বিশেষত শব্দ ও রচনা শৈলীর একটি প্রভাব উর্দু থেকে ফারসি ভাষা গ্রহণ করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে উর্দুর মতো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাকরণবিদগণ শব্দকে তিনের অধিক ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। এর মূল কারণ হলো উর্দু ভাষার কতিপয় শব্দ যা ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে তা শব্দপ্রকরণে বা সারফি দৃষ্টিকোণে ইসিম, ফেয়েল না হরফ তা নির্ণয় করা অনেক সময় মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই এশব্দগুলোর পরিচয় নির্ণয়ের জন্য ফারসি ভাষায়ও শব্দকে তিনের অধিক প্রকরণে বিভক্ত করা হয়েছে। (জাওয়াদি, ২০০২: ১৮৯-১৯০)

ইসিম বা বিশেষ্য শব্দ ব্যবহারে উর্দু ভাষার উপর ফারসির প্রভাব

উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার বেশ কিছু শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ইসিম তথা বিশেষ্য শব্দের প্রচুর ব্যবহার হয়। উর্দু ভাষায় প্রাত্যহিক ব্যবহৃত শব্দাবলি, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পোষাক, প্রাণী, বিভিন্ন হাতিয়ার ও উপকরণ ইত্যাদি বিশেষ্য প্রচুর পরিমাণে হলো দেশি শব্দ। এরপরেই ফারসি শব্দাবলির ব্যবহার। উর্দু ভাষায় অন্য ভাষার ইসিম বা বিশেষ্য খুব কমই ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণ পরিসংখ্যান মতে উর্দুর বিশেষ্যগুলো শতকারা ৭০ শতাংশ হলো দেশি শব্দ, আর ৩০ শতাংশ হলো ফারসি শব্দ।[৩৮]

উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দের একটি তালিকা মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ (১৮৩০-১৯১০ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন। তা থেকে কয়েকটি শব্দ নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন: পাজামে (پا جامہ), শালওয়ার (شلوار), জেরাব (جراب), দিগচি (دیگچی), সার (سر), পিইশানি (پیشانی), নাফ (ناف), খারগোশ (خرگوش), শির (شیر) ও গান্দুম (گندم) ইত্যাদি। (আজাদ, ১৯৫০ : ৩৫-৩৮)

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, 'উর্দু ভাষা মুসলিম শাসনামলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ কারণে এতে ফারসি ইসিম বা বিশেষ্য বহুল পরিমাণে যুক্ত হয়েছে। অন্য দিকে ফারসি দারি ভাষা যা উপমাদেশের

---

৩৮. ড. ফারহাত শামিম বলেন: 'اردو میں ۷۰ فیصد الفاظ دیسی زبانوں کے اور ۳۰ فیصد فارسی کے ہیں' [উর্দু ভাষায় ৭০ শতাংশ শব্দ দেশি আর ৩০ শতাংশ শব্দ ফারসি ভাষা থেকে আহরিত।] (শামিম, ২০১২: ১৫৩)

মুসলিম শাসকদের রাজ দরবারের ভাষা ছিলো, সেটা আরবির ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠে। (শিবলি, ১৯৯১: ১৩৩) অনেক আরবি এবং তুর্কি শব্দ ফারসি দারি ভাষার মাধ্যমে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে। সুতরাং সেগুলোকেও উর্দু ভাষায় ফারসি শব্দেরই অংশ মনে করা হয়। কারণ, সেগুলো ফারসি ভাষার মাধ্যমেই উর্দু ভাষার অংশে পরিণত হয়েছে। (শামিম, ২০১২: ১৫৪)

বর্তমানে উর্দু ভাষায় সামাজিক বিষয়াদি ও দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রচুর পরিমাণে ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামাজিক অগ্রগতির বর্তমান সময়ে উর্দু ভাষায় ফারসি ও হিন্দি শব্দের আনুপাতিক হার শতকরা সত্তর ও তিরিশ ভাগ। উর্দু শব্দাবলিতে মৌলিক শব্দের বিচারে দেশি শব্দের পরিমাণ বেশি। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির এ যুগে নব সংযোজিত শব্দাবলির হিসেবে উর্দু ভাষায় ফারসি শব্দের পরিমাণ বেশি। এর কারণ হলো, ভাষা সমাজ-জীবনের প্রয়োজনের নিরিখে গড়ে উঠে। আর সামাজিক উন্নতির সাথে সাথে ভাষারও উন্নতি সাধিত হয়। উর্দু ভাষার উৎকর্ষতার যুগে শব্দের অপ্রতুলতা ফারসি শব্দের মাধ্যমেই দূরীভূত হয়েছে । কাজেই বলা যায় যে, উর্দু ভাষার উপর ফারসি শব্দের এ অনুদান সমীহ করার মতো। (ফতেহপুরি, ১৯৮৬: ২)

মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের পরিধি বুনিয়াদি প্রয়োজনের পরিধির চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে ভাষার ক্ষেত্রেও বুনিয়াদি শব্দাবলির চেয়ে সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে গঠিত ও সংযোজিত শব্দাবলির পরিমাণ বেশি। এ বিবেচনায় উর্দু ভাষায় হিন্দি শব্দাবলির চেয়ে ফারসি শব্দাবলিই বেশি বলে অনুমিত হয়।

উর্দু ভাষাচর্চায় দাক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলের প্রাধান্যের সময়ে স্থানীয় এবং হিন্দি শব্দের বহুল ব্যবহার ছিলো। কারণ, সে সময়টি ছিলো মূলত উর্দু স্বতন্ত্র একটি ভাষা হিসেবে গড়ে উঠার আরম্ভের সময়। কিন্তু আঠারো এবং উনিশ শতকে উর্দু যখন দিল্লি তথা উত্তর প্রদেশে আগমন করে তখন উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রবল প্রভাব দৃষ্টিগোচরীভূত হয়। (শামিম, ২০১২: ১৫৫)

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) থেকে মির তাকি মির (১৭২৩-১৮১০ খ্রি.)-এর সময়কাল পর্যন্ত প্রচলিত ভাষার জরিপ চালালে তাতে হিন্দি শব্দাবলি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এ ভাষা যখন লাক্ষ্ণৌর অযোধ্যায় নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে তখন সেখানে জৌলুসপূর্ণ পরিবেশে ভাষার সরল প্রকৃতিটি আর বজায় থাকেনি। এতে অনেক মেকিভাব যুক্ত হয়। ফলে উর্দু ভাষার অবনতি ঘটে। তবে এ সময় উর্দু ভাষায় নিজস্ব শব্দতাবলিতে কাট-ছাটও হয়েছে নির্দয়ভাবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ সময় উর্দু সাহিত্যে দেশি শব্দাবলির স্থলে ব্যাপকভাবে আরবি এবং ফারসি শব্দ যুক্ত করা হয় । ফলে দিল্লি থেকে আগত এ সরল ভাষাটি চাকচিক্যে ভরা একটি ভাষায় পরিণত হয়ে যায়। (বেগ, ১৯৯০: ১৬৮-১৭১)

বৃটিশ আমলে উর্দু-হিন্দি বিতর্ক এবং হিন্দু-মুসলিমের মাঝে ঘৃণা বিস্তারের ইন্ধনদাতা শাসকবর্গের চাতুর্যের প্রভাবেও উর্দু থেকে হিন্দি শব্দাবলি বের হয়ে গেছে। ফলে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত শব্দবলির উপর আরবি-ফারসি শব্দাবলির প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। অনুরূপভাবে আধুনিক হিন্দি ভাষা থেকেও আরবি ও ফারসি শব্দাবলি বের করে দেওয়া হয়েছে।

উর্দু ভাষার দু'টি রূপ

বর্তমানে উর্দু ভাষার দু'টি রূপ বিদ্যমান রয়েছে।

১। সাধারণ পরিসরে উর্দু : এখানে উর্দুর সরল রূপটি ব্যবহৃত হয়। উর্দু ও হিন্দি ভাষায় তেমন কোনো স্পষ্ট ব্যবধান এখানে নজরে পড়ে না। এরূপে স্থানীয় শব্দাবলি বেশি ব্যবহৃত হয়।

২। সাহিত্যের পরিসরে উর্দু : এটি লৌকিকতাপূর্ণ। এখানে জটিল ও ভারি শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়। উর্দু এবং হিন্দি ভাষার মধ্যে ব্যবধানও এখানে স্পষ্ট। হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষার শব্দাবলি বেশি। পক্ষান্তরে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে আরবি এবং ফারসি শব্দের ব্যবহার বেশি। (ফতেহপুরি, ১৯৮৬: ১৪)

উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার বেশির ভাগ বিশেষ্য জাতীয় শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার ক্রিয়া এবং অব্যয় জাতীয় শব্দের বেশি প্রভাব পড়েনি। (ফতেহপুরি, ১৯৮৬ : ১৩-১৪) তবে পরবর্তীকালে ফারসি ও আরবির কিছু ক্রিয়াপদ এবং অব্যয় জাতীয় শব্দ উর্দু ভাষায় সংযুক্ত হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা খুব বেশি নয়। (শামিম, ২০১২: ১৫৬-১৫৭)

উর্দু ভাষায় বিশেষ্য (اسم) শব্দাবলির উৎস

উর্দু ভাষায় ইসিম বা বিশেষ্য নির্দেশক শব্দাবলির উৎসকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১। তৎসম (সংস্কৃত শব্দ) ২। তদ্ভব বা প্রাকৃত শব্দ ৩। ফারসি শব্দ (এর মধ্যে আরবি ও তুর্কি শব্দগুলোও অন্তর্ভুক্ত) ও ৪। ইংরেজি শব্দ (এর মধ্যে ফরাসি, ওলন্দাজি এবং ইউরোপীয় অন্যান্য শব্দ অন্তর্ভুক্ত)।

উল্লেখ্য যে, উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ও তুর্কি যে সকল শব্দ ফারসির মাধ্যমে উর্দু ভাষায় এসেছে তাও ফারসি ভাষা থেকে আগত শব্দ হিসেবে বিবেচিত হয়। উর্দু ভাষায় এমন শব্দের পরিমাণ প্রচুর। উদাহরণ স্বরূপ কিছু শব্দ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। ফারসি শব্দ : আতাশ (آتش), আব (آب), আবর (ابر), আরাম (آرام), বাজার (بازار), চাদর (چادر), চেরাগ (چراغ), জিগার (جگر), পিইশানি (پیشانی), খোরাক (خوراک), দোস্ত (دوست), দরদ (درد), শাখ (شاخ), শাওক (شوق) ইত্যাদি।

২। আরবি শব্দ : তানকিদ (تنقید), সরফ (صرف), কওম (قوم), মিল্লাত (ملت), হুকুম (حکم), খায়র (خیر), জরিআ (ذریعه), তাআল্লুক (تعلق) প্রভৃতি।

৩। তুর্কি শব্দ : আপা (اپا), বাঁজি (بانجی), উর্দু (اردو), খাতুন (خاتون), কাবু (قابو), বারুদ (بارود), আতালিক (اتالیق), বাবুর্চি (باورچی), সওগাত (سوغات), আগা (اغا), তমগাহ (تمغه) ইত্যাদি।

উর্দু ভাষায় সরফ (صرف) তথা শব্দ প্রকরণগত পরিভাষার আলোকে ফারসির প্রভাব

উর্দু ভাষায় শব্দ প্রকরণগত পরিভাষাগুলো হুবহু ফারসি শব্দ প্রকরণের পরিভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন ইসিম (اسم) বা বিশেষ্য পরিভাষাগত নামটি উর্দু ভাষায় ফারসি পরিভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে শব্দটি কোনো কালের সাথে সীমাবদ্ধ না হয়ে নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করে তাকে ইসিম (اسم) বলে। এই ইসিম (اسم) কে ফারসি ব্যাকরণ অনুসারে উর্দু ভাষায় চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(১) শব্দের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে ইসম (اسم) তিন প্রকার। যথা এক. জামিদ (جامد) দুই. মাসদার (مصدر) তিন. মুশতাক (مشتق)।

(২) নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট অর্থপ্রকাশক হিসেবে ইসিম (اسم) দু'প্রকার। যথা এক. মারিফা (معرفه) বা নির্দেশক অর্থজ্ঞাপক শব্দ দুই. নাকিরা (نكره) বা অনির্দেশক অর্থজ্ঞাপক শব্দ ।

(৩) লিঙ্গ (جنس) হিসেবে ইসিম (اسم) দু' প্রকার। যথা এক. মুজাক্কার (مذكر) বা পুংলিঙ্গ শব্দ দুই. মুআন্নাস (مونث) বা স্ত্রীং লিঙ্গ শব্দ।

(৪) বচন হিসেবে ইসিম (اسم) দু' প্রকার। যথা এক. এক বচন (واحد) দুই. বহু বচন (جمع)।

ড. সুহাইল বুখারি (১৯১৪-১৯৯০ খ্রি.) উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত ইসমে জামিদ সম্পর্কে বলেন:

> 'উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত সকল ইসমে জামিদ ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। এর মূল কারণ হলো উর্দু ভাষায় স্বতন্ত্র কোনো ইসমে জামিদ নেই। বর্তমানে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত ইসমে জামিদ (جامد) গুলো যেমন: সুরাজ (سورج), বাগ (باغ) বাদাম (بادام), বাজার (بازار), জানোয়ার (جانور), চেরাগ (چراغ), জায়েল (ذيل), নামাজ (نماز), রোজা (روزه), দামান (دامن), জাঙ্গ (جنگ) এবং আফতাব (آفتاب) ইত্যাদি শব্দ ফারসি থেকে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।' (বুখারি, ১৯৯১: ২৭৪)

অনুরূপভাবে উর্দু ভাষায় কোনো একটি শব্দকে একবচন থেকে বহুবচন তৈরির নিয়ম ফারসি ভাষার ব্যাকরণ অনুসরণে গঠন করা হয়েছে।

উর্দু ভাষায় ইসমে মাসদার (اسم مصدر) এর ব্যবহার

উর্দু ভাষায় ইসমে মাসদার (اسم مصدر) বা ক্রিয়ামূলের বড় উৎস হলো হিন্দি ভাষা। তবে বহু আরবি এবং ফারসি মাসদারের উপস্থিতি রয়েছে উর্দু ভাষায়– যা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন: دفن فرمودن বাক্যটি সামান্য পরিবর্তন হয়ে উর্দু ভাষায় دفنانا তথা দাফন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া ফারসি মাসদারে মুরাক্কাবাত (مصدرمركبات) বা যৌগিক ক্রিয়ামূলের সাথে کرنا এবং ہونا ইত্যাদি যুক্ত হয়ে বহু আরবি ও ফারসি শব্দ উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো সাধারণত আরবি থেকে ফারসির মাধ্যমে উর্দু মাসদারে (مصدر) পরিণত হয়েছে। এমনকি এগুলোর প্রভাবে অনেক উর্দু মূল মাসদার বা ক্রিয়ামূলের ব্যবহার কমে গেছে বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (শামিম, ২০১২: ১৬২)

উর্দু ভাষায় এমন কিছু ফারসি মাসদারে মুরাক্কাবাত (مصدرمركبات)-এর ব্যবহার আছে যেগুলো উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যবহার করা হয়। যেমন: ফারসি دم زدن থেকে উর্দু ভাষায় دم مارنا (ধর্মঘট করা) ফারসি مراد يافتن থেকে উর্দু ভাষায় مراد پانا (উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া) এবং ফারসি آرزو داشتن থেকে উর্দু ভাষায় آرزو رکھنا (আশা রাখা) ইত্যাদি।

উপরিউক্ত মুরাক্কাবাত বা যৌগিক মাসদারগুলোর মাঝে আরবি ইসিম ও সিফাতও রয়েছে। এ গুলো আরবি থেকে প্রথমে ফারসি এবং পরে ফারসি থেকে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। (সিদ্দিকি, ১৯৭১: ৪৫১)

উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার অনুকরণে ইসমে মুশতাক (اسم مشتق)-এর ব্যবহার

ফারসি শব্দ প্রকরণের অনুকরণে উর্দু শব্দ প্রকরণের পরিভাষায় ইসমে মুশতাক ৭ প্রকার। যথা: (১) ইসমে ফায়েল (اسم فاعل) বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য (২) ইসমে মাফউল (اسم مفعول) বা কর্মবাচক বিশেষ্য (৩) ইসমে হালিয়্যা (اسم حالیہ) বা অবস্থাসূচক বিশেষ্য (৪) ইসমে হাসেলে মাসদার (اسم مصدرحاصل) বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (৫) ইসমে জারফ (اسم ظرف) বা স্থান বা কাল নির্দেশক বিশেষ্য (৬) ইসমে আলা (اسم آلہ) উপকরণবাচক বিশেষ্য এবং (৭) ইসমে মুআওয়াজা (اسم معاوضہ) বা বিনিময় অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য।

(১) কর্তৃবাচক বিশেষ্য (اسم فاعل)

ফারসি ভাষায় ইসমে ফায়েল তথা কর্তৃবাচক বিশেষ্য পদ দুই প্রকার। উর্দু ভাষাতেও ইসমে ফায়েল তথা কর্তৃবাচক বিশেষ্য পদ দুই প্রকার। যথা:

(ক) ইসমে ফায়েল কেয়াসি (اسم فاعل قیاسی) এবং (খ) ইসমে ফায়েল সেমায়ি (اسم فاعل سماعی)।

(২) কর্মবাচক বিশেষ্য (اسم مفعول)

اسم مفعول বা কর্মবাচক বিশেষ্যকে ফারসি ব্যাকরণের পরিভাষায় সিফাতে মাফউলি বলে। উর্দু ভাষায় ফারসির অনেক ইসমে মাফউল ব্যবহৃত হয়। ফেয়েলে মাজি বা অতীতকাল নির্দেশক ক্রিয়ার শেষে হা (ہ) অক্ষর যুক্ত করে ফারসি ইসমে মাফউল বানানো হয়। যেমন ফারসি মাসদার رفتن (যাওয়া) থেকে মাজি বা অতীতকাল নির্দেশক ক্রিয়া হলো رفت (সে গিয়েছিলো)। এই رفت থেকে কর্মবাচক বিশেষ্য হলো رفتہ (যাওয়ার কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ গমনকৃত)। এ ধরনের বিপুল পরিমাণে কর্মবাচক বিশেষ্য জাতীয় শব্দ ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) অবস্থাসূচক বিশেষ্য (اسم حالیہ)

ইসমে হালিয়া এমন বিশেষ্যকে বলা হয় যা ফায়েল বা মাফউলের অবস্থা প্রকাশ করে। উর্দু ভাষায় অধিকাংশ ইসমে হালিয়া হিন্দি নিয়মে গঠিত হলেও কিছু কিছু ফারসি ইসমে হালিয়াও উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: گریاں (ক্রন্দনরত অবস্থা) শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় বহুল ব্যবহৃত।

(৪) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (اسم مصدرحاصل)

উর্দু ভাষায়ও হিন্দি ভাষার ন্যায় অনেক আরবি ও ফারসি মাসদার এবং হাসেলে মাসদার বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য নির্গত হয়।

নিম্নে ফারসি মাসদার থেকে নির্গত উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত কয়েক ধরনের ইসমে মাসদারে হাসেল (اسم مصدرحاصل) ও তার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(ক) ফারসি ফেয়েলে মাযি মুফরাদ [فعل ماضی مفرد] (একক অতীতকাল নির্দেশক ক্রিয়া) :

ফারসি ভাষার কিছু ফেয়েলে মাযি মুফরাদ (فعل ماضی مفرد) উর্দু ভাষায় ইসমে মাসদারে হাসেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ফারসি মাসদার باختن (খেলা করা) উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত ফেয়েলে মাজি মুফরাদ (فعل ماضی مفرد) একক অতীতকাল নির্দেশক باخت ক্রিয়াপদটি অনেক সময় মাসদারে হাসেল বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (রশিদ, ১৯৯৬: ৪১)

(খ) ফারসি মাযি মাতলাকের শেষে گی যুক্ত করে ইসমে মাসদারে হাসেল গঠন করা হয়:
ফারসি ইসমে মাসদারে হাসেল ফেয়েলে মাযি মুতলাকের শেষে گی যুক্ত করে উর্দু ভাষায় ইসমে মাসদারে হাসেল গঠন করা হয়। যেমন: آزردن (কষ্ট দেওয়া) ফারসি মাযি মুতলাকের শেষে گی যুক্ত করে উর্দু ভাষায় ইসমে মাসদারে হাসেল গঠন করা হয়েছে। آزردگی মাসদারে হাসেল হিসেবে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৫) স্থান বা কাল নির্দেশক বিশেষ্য (اسم ظرف)

ফারসির অনেক ইসমে জারফ (اسم ظرف) উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ফারসির মতো উর্দু ভাষায়ও ইসমে জারফ (اسم ظرف) দুই প্রকার।

ক) ইসমে জারফে মাকান (স্থান নির্দেশক বিশেষ্য)। যেমন: ইসলামাবাদ (اسلام آباد), হায়দারাবাদ (حیدرآباد), মুরাদাবাদ (مراد آباد) ইত্যাদি স্থানের নামসমূহ উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার অনুকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ) ইসমে জারফে জামান (কাল নির্দেশক বিশেষ্য)। যেমন: মিলাদ (میلاد) ও মিআদ (میعاد) ইত্যাদি শব্দ উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার অনুকরণে ইসমে জারফে জামান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৬) উপকরণ বাচক বিশেষ্য (اسم آلت)
উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষা থেকে গৃহীত অনেকগুলো ইসমে আলাত (اسم آلت)-এর ব্যবহার রয়েছে। তবে ফারসি ভাষায় ইসমে আলাত সাধারণত দান (دان) শব্দ বা অনুসর্গ যোগে গঠিত হয়। যেমন: قلمدان (কলমদান), نمکدان (নামকদান), عطردان (আতরদান)। (সিদ্দিকি, ১৯৭১: ৩৩৯)

(৭) বিনিময়সূক অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য (اسم معاوضہ)
উর্দু ভাষার অধিকাংশ ইসমে মুআওয়াজা (اسم معاوضہ) উর্দু মাসদার থেকেই নির্গত হয়ে থাকে। তবে ফারসি ভাষার অনুকরণে কিছু কিছু ইসমে মুআওয়াজা উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন: مالکانہ (মালিকানা), جُرمانہ (জরিমানা) এবং نذرانہ (নজরানা) ইত্যাদি ফারসি ইসমে মুআওয়াজা শব্দগু বর্তমানে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

নাহু (نحو) তথা ব্যাকরণশাস্ত্রের পরিভাষার আলোকে উর্দুর উপর ফারসির প্রভাব

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে নাহু তথা ব্যাকরণ শাস্ত্রের পরিভাষার আলোকে ফারসি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন ফারসি ভাষায় শব্দ বা কালিমা (کلمہ) তিন প্রকার। যথা : (১) ইসিম (اسم), (২) ফেয়েল (فعل) ও (৩) হরফ (حرف)।

উর্দু ভাষার প্রাচীন ব্যাকরণ বই-পুস্তকে ফারসি ব্যাকরণের অনুসরণে কালিমাকে তিন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বাবায়ে উর্দু মৌলাভি আব্দুল হক[৩৯] উর্দু শব্দ প্রকরণের আধুনিকায়ন এনে শব্দসমূহকে প্রধানত দু' প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এক. মেস্তাকবেল (مستقبل) ভবিষ্যত অর্থজ্ঞাপক শব্দ। দুই. গাইরে মোস্তাকবেল (غیر مستقبل) অভবিষ্যত অর্থজ্ঞাপক শব্দ। (শিবলি, ১৯৯১: ২৭৪)

বাক্যগঠন প্রণালীকে উর্দু ব্যাকরণে নাহু বলা হয়। নাহুর ক্ষেত্রেও উর্দুর উপর ফারসির প্রভাব ব্যাপক। উর্দু ও ফারসি ভাষায় বাক্যকে মুরাক্কাব (مرکب) বা জুমলা (جملہ) বলা হয়। ফারসি ব্যাকরণ অনুসরণ করে উর্দু ব্যাকরণেও বাক্য দু' প্রকার। ১। মুরাক্কাবে নাকেস (مرکب ناقص) : অপূর্ণ বাক্য। ২। মুরাক্কাবে তাম (مرکب تام): পূর্ণবাক্য। উর্দু ভাষায় ফারসি ব্যাকরণের অনুকরণে আরো অনেক মুরাক্কাবের ব্যবহার দেখা যায়। এগুলো ফারসির হাত ধরে উর্দু ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে। যেমন:

মুরাক্কাবে এজাফি (مرکب اضافی)

উর্দু ভাষায় ফারসি মুরাক্কাবে এজাফি বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয়। ড. ফারহাত শামিম বলেন: 'উর্দু ভাষায় যত মুরাক্কাব ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে ফারসি মুরাক্কাবই সবচে বেশি।' (শামিম, ২০১২: ২৪৫)

ফারসি মুরাক্কাবে এজাফি (مرکب اضافی) গঠন করতে সাধারণত এজাফতে কাসরা বা যের ব্যবহৃত হয়। আর মুজাফের শেষে আলিফ বা ওয়াও সাকিনের পূর্বেও হরফ জুম্মা (পেশ) বিশিষ্ট হলে তবে এজাফতের কাসরাটি ইয়া (ی) যের আকারে লেখা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে উর্দু ভাষায় ইয়ায়ে মারূফের (ي) পরিবর্তে ইয়ায়ে মাজহুল (ی) লেখা হয়। যেমন ফারসি বাক্য شیر جوی উর্দু ভাষায় شیر جوئے আকারে লেখা হয়। (শামিম, ২০১২: ২৪৬)

মুরাক্কাবে জারি (مرکب جاري)

মুরাক্কাবে এজাফির পরে ফারসির মুরাক্কাবে জারি উর্দু ভাষায় বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। আধুনিক ফারসি ভাষায় হরুফে জারকে (حروف جار) হুরুফে এজাফি (حروف اضافی)ও বলা হয়। ফারসি ভাষায় হুরুফে জার (حروف جار) স্বীয় মাজরুর (مجرور)-এর পূর্বে ব্যবহার হয়, কিন্তু উর্দু ভাষার প্রচলিত ব্যাকরণে এর গঠন সম্পূর্ণ উল্টো হলেও ফারসি ভাষার অনুসরণে উর্দু ভাষায়ও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন: উর্দু ভাষায় অনেক স্থানে کثرت سے এর স্থলে بکثرت এবং اندازے سے -এর স্থলে با اندازہ ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। (শামিম, ২০১২ : ২৪৭)

---

৩৯. মৌলাভি আব্দুল হক হলেন উর্দু ভাষা-বিজ্ঞানের একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত। তিনি ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশ মিরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি করাচি ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬১ খিষ্টাব্দে তিনি করাচিতে মৃত্যুবরণ করেন। (হক, ২০০৪: ৪৩৯)

মুরাক্কাবে আতফি (مرکب عطفی)

ফারসি ভাষার অনুকরণে মুরাক্কাবে আতফি (مرکب عطفی)ও উর্দু ভাষায় প্রচুর ব্যবহার হয়। উর্দু বাক্যগঠনে হরফে আতফ (حرف عطف) আওর (اور) ব্যবহার হয়– যা মূলত ফারসি ওয়াও (و)-এর অনুবাদ।

মুরাক্কাবে সাবেকি (مرکب سابقی)

উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার অনেক মুরাক্কাবে সাবেকি (مرکب سابقی) ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ফারসি ভাষায় একে বলা হয় পিশাওয়ান্দ (پیشاوند) বা উপসর্গ। (খাজায়িলি, ১৩৪৯ সৌ: ১৫৫)

মুরাক্কাবে লাহেকি (مرکب لاحقی)

উর্দু ভাষায় ফারসির অনেক মুরাক্কাবে লাহেকি (مرکب لاحقی) ব্যবহৃত হয়। উর্দু ও ফারসি পরিভাষায় যাকে পিশাওয়ান্দ (پیشاوند) বা উপসর্গ বলা হয়। উর্দু ভাষায় লাহেকা দুই প্রকার:

১। মুফরাদে লাহেকা (مفرد لاحقه) এগুলোতে লাহেকা (لاحقه) কেবল একটি হরফ হয়। যেমন খুশা (خوشا) এর শব্দের মাঝে ব্যবহৃত আলিফটি।

২। মুরাক্কাব লাহেকা (مرکب لاحقه) সাধারণত দুই বা ততধিক হরফ বিশিষ্ট হয়। যেমন: দারদমান্দ (دردمند), আকলমান্দ (عقلمند), খিরাদমান্দ (خردمند)।

ফারসি মুফরাদে লাহেকা (مفرد لاحقه) উর্দু ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন: (১) আলিফে ওয়াসফি (وصفی): দানা (دانا), বিনা (بینا)। (২) আলিফে নেদা (الف ندا): পারওয়ারদেগার (پروردگار), শাহরে ইয়ার (شہر یار)। (৩) আলিফে তাকসির ওয়া তায়াজ্জুব (الف تکثیر و تعجب): খুশা, বেসা (خوشا، بسا)। (৪) আলিফে কসম (الف قسم): হাক্কান (حقاً), রাব্বান (رباً) প্রভৃতি।

মুরাক্কাবে তাওসিফি (مرکب توصیفی)

সিফাত (صفت) ও মওসুফ (موصوف) মিলে যে মুরাক্কাব হয় তাকে মুরাক্কাবে তাওসিফি (مرکب توصیفی) বলে। উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত অনেক মুরাক্কাবে তাওসিফির (مرکب توصیفی) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

মুরাক্কাবে আদাদি তাওসিফি (مرکب عددی توصیفی)

সংখ্যার মান বা বিশেষণবাচক মুরাক্কাব। উর্দু ও ফারসি উভয় ভাষাতেই এ জাতীয় মুরাক্কাবের ব্যবহার হয়ে থাকে।

বালাগাত (بلاغت) তথা অলংকারশাস্ত্রে উর্দুর উপর ফারসির প্রভাব

বালাগাত (بلاغت) তথা অলংকার শাস্ত্রেও উর্দু ভাষার উপর ফারসির প্রভাব লক্ষণীয়। বালাগাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ইলমে বায়ান (علم بیان)। উর্দু ভাষায় ইলমে বায়ান ফারসি ইলমে বায়ানের নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। উর্দু এবং ফারসি ইলমে বয়ানের পরিভাষা এবং সংজ্ঞাগুলো এক ও অভিন্ন।

ইলমে বয়ানের সংজ্ঞা

সায়্যিদ আবেদ আলি আবেদ ইলমে বায়ানের যথার্থ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

علم بیان وہ علم ہے جو مجاز، تشبیہ، استعارہ مجاز مرسل اور کنایہ سے اس طرح بحث کرتا ہے کہ اس پر حاوی ہونے کے بعد فنکار، انشاپرداز یا خطیب اپنے مفہوم کے ابلاغ تام میں کامیاب ہو سکے۔

[ইলমে বায়ান এমন শাস্ত্রকে বলা হয় যা মাজায (مجاز), তাশবিহ (تشبیہ), ইস্তেআরাহ (استعارہ), মাজাযে মুরসাল (مجاز مرسل) এবং কিনায়া (کنایہ) সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা করে যাতে এগুলো রপ্ত করার পর শাস্ত্রজ্ঞ, লেখক ও বাগ্মী ব্যক্তি নিজের মনের ভাবকে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়ে উঠে]। (আবেদ, ১৯৮৯: ২৪)

বালাগাত শাস্ত্রে ইলমে বায়ানের মৌলিক অংশগুলো হলো : ১। তাশবিহ (تشبیہ) ২। ইস্তেআরাহ (استعارہ) ৩। মাজাযে মুরসাল (مجاز مرسل) ও ৪। কেনায়া (کنایہ)।

তাশবিহ বলা হয় কোনো বস্তুকে কোনো বিশেষগুণের ভিত্তিতে অন্যকোনো বস্তুর অনুরূপ সাব্যস্ত করা। তাশবিহের ৫টি রুকন রয়েছে। যথা : ১। মুশাব্বাহ (مشبہ) ২। মুশাব্বাহ বিহি (مشبہ بہ) ৩। আদাতে তাশবিহ (اداۃ تشبیہ) বা হরফে তাশবিহ (حرف تشبیہ) । ৪। ওয়াজহে শিবাহ (وجہ شبہ) ৫। গরজে তাশবিহ (غرض تشبیہ) বা তাশবিহের উদ্দেশ্য।

ইস্তিআরাহ (استعارہ) এর সংজ্ঞা

ইস্তিআরাহ বলা হয় সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্কের কারণে কোনো শব্দকে তার হাকিকী তথা মূল অর্থের পরিবর্তে মাজাযি তথা রূপক অর্থে ব্যবহার করা।

ইস্তেআরার রুকন ৩টি। যথা: ১। মুস্তাআর মিনহু (مستعار منہ) ২। মুস্তাআর লাহু (مستعار لہ) ৩। ওয়াজহে জামে (وجہ جامع)।

উল্লিখিত ব্যবহার-প্রণালিগুলোতে উর্দু-ফারসির মাঝে মিল ও সামঞ্জস্য খুবই ব্যাপক। ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত তাশবিহ ও ইস্তিআরার রীতি-নীতি অনুসরণ করে এ ধারার প্রায় সবকিছুই উর্দু অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় ব্যবহার হয়ে আসছে।

মাজাযে মুরসাল

মাজাজে মুনসাল (مجاز مرسل) হলো কোনো শব্দকে তার হাকিকি (মূল) অর্থের পরিবর্তে মাজাজি তথা রূপক অর্থে এমনভাবে ব্যবহার করা যে, এ দুই অর্থের মাঝে তাশবিহ ভিন্ন অন্যকোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়। ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত মাজাজে মুরসালের মতো উর্দু ভাষায়ও মাজাজে মুরসালের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে।

কেনায়া (کنایہ)এর ব্যবহার

কেনায়া হলো কোনো শব্দের আভিধানিক ও রূপক অর্থের মাঝে রূপক অর্থটি উদ্দেশ্য করার মতো কোনো কারিনা বা কারণ বা সূত্র না থাকা অবস্থায় যদি অনিবার্য কারণে রূপক অর্থটি উদ্দেশ্য করা আবশ্যক হয়ে যায়; তখন তাকে কেনায়া বলা হয়। কেনায়ার ক্ষেত্রেও উর্দুর উপর ফারসির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উর্দু ভাষায় ফারসি ধাতুমূলের ব্যবহার

বর্তমানে উর্দু ভাষায় ফারসি ধাতুমূল এবং ক্রিয়াপদ নিজস্বরূপে ব্যবহার কম হয়। এ কারণে উর্দু ভাষায় ফারসি পরিভাষাগুলোও নিজস্বরূপে ব্যবহার হতে কম দেখা যায়। তবে গালিবের সময়কাল পর্যন্ত পরিভাষার ক্ষেত্রে উর্দু ও ফারসি ভাষায় একই রকম পরিভাষার ব্যবহার সমানমাত্রায় লক্ষ করা যায় । দিওয়ানে গালিব (دیوان غالب)-এর কিছু কবিতায় ধাতুমূলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے ☆ مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا

(গালিব, ১৮৬২: ১)

[আমার কবিতার মর্মবোঝার যতোজাল বিছাওনা কেনো? শ্রোতার জন্য তা আনকা পাখিতুল্য।]

উল্লিখিত কবিতায় শানিদান (شنیدن) শব্দটি ফারসি ধাতুমূল। গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)-এর সময়কাল পর্যন্ত উর্দু কবিগণ প্রচুর পরিমাণে ফারসি ধাতুমূল নিজেদের কবিতায় ব্যবহার করতেন। কিন্তু গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) পরবর্তীকালে আধুনিক উর্দু কবিতায় এ প্রবণতা খুবই কম দেখা যায়। তবে এ ব্যবহার একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি। বর্তমানে ফারসির ধাতুমূলের মিশ্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ শব্দের কিছু অংশ ফারসি আর কিছু অংশ হিন্দি এ দু'য়ের মিশ্রণে উর্দু ভাষায় শব্দ তৈরি হচ্ছে। যেমন:

উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত কিছু মিশ্রশব্দ

উর্দু	অর্থ	ফারসি
افطار کرنا	ইফতার করা	افطار کردن
ختم کرنا	শেষকরা	ختم کردن
دوست رکھنا	বন্ধুত্ব রাখা	دوست داشتن

شور کردن	হইচই করা	شور کرنا
قلم بند کردن	লেখা	قلم بند کرنا

উর্দু ভাষায় ফারসি প্রবাদের ব্যবহার

উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত ফারসি প্রবাদ-প্রবচন ৩ প্রকার। যথা: (১) যে প্রবাদগুলো পুরোপুরিভাবে ফারসি ভাষায়ও বিদ্যমান রয়েছে। (২) যে প্রবাদগুলো তরজমা হয়ে উর্দুতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (৩) যে প্রবাদগুলোর ভাষাগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে উর্দু ভাষায় কেবল মমার্থ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে কিছু ফারসি কবিতাংশ উল্লেখ করা হলো– যা প্রবাদ আকারে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

ایں سعادت بزور بازو نیست ☆ تانہ بخشد خدائے بخشندہ

(১) এই সৌভাগ্য বাহুবলে নয়, যে পর্যন্ত মহানদাতা খোদাতাআলা দান না করেন।

تا تریاق از عراق آوردہ شد ☆ مار گزیزدہ مردہ شد

(২) ইরাক হতে তিরয়াক আনতে আনতে মুমূর্ষ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো।

چہل سال عمر عزیزت گذشت ☆ مزاج تو از حال طفلی نہ گشت

(৩) প্রিয় জীবনের চল্লিশটি বছর কেটে গেলো কিন্তু তোমার বাৎসল্য স্বভাব দূর হলো না।

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست ☆ در پیر شان حالی و درماندگی

(৪) প্রকৃত বন্ধু তো সেই যে সুখে-দুঃখে বন্ধুর হাত ধরে।

سگ اصحاب کہف روزے چند ☆ پئے نیکاں گرفت و مردم شد

(৫) আসহাবে কাহাবের কুকুর কয়েক দিন নেককারদের পা ধরে চলতে চলতে মানুষ হয়ে উঠেছে।
(শামিম, ২০১২: ৩১১)

শ্লোক বা খণ্ডবাক্য আকারে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত কিছু ফারসি প্রবাদের উদাহরণ:

آتش دوست و دشمن نداند

(১)আগুন শত্রু-মিত্র চিনেনা।

آدمی را آدمیت لازم است

(২) মানুষের জন্য মানবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

آفتاب آمد دلیل آفتاب

(৩) সূর্য নিজেই স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ।

آمدم بر سر مطلب

(৪) মূল কথায় আসলাম

اول طعام بعد از کلام

(৫) আগে আহার পরে কথোপাথন।
(শামিম, ২০১২: ৩১৫-৩১৭)

বর্তমানে উর্দু ভাষার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমারসহ অনেক দেশেরই বড় বড় শহরগুলোতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রচলন রয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক এলাকার উর্দু ভাষার কথাবার্তায় স্থানীয় বিভিন্ন শব্দযুক্ত হচ্ছে। পাকিস্তানে প্রচলিত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে আরবি-ফারসি ভাষার বিশেষ্য পদের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ভারতে প্রচলিত উর্দু ভাষায় হিন্দি তৎতম ও তদ্ভব শব্দ যুক্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের উর্দু ভাষায় বাংলা ভাষার প্রভার পড়ছে। তবে এ প্রভাব ভারতে ব্যবহৃত উর্দু ভাষার উপর হিন্দি ভাষার প্রভাবের মতো এতো ব্যাপক নয়। অতএব বলা যায় যে, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত উর্দু ভাষার উপর ফারসি ভাষার প্রভাব খুব গভীর।

তথ্য সূত্র

১ আ. ত .ম. মুছলেহউদ্দীন (২০০৯): *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

২ আবদুল মুহাম্মদ খান ইরানি (১৩৪৬ সৌ.): *পয়দায়েশে খাত্ত ওয়া খাত্তত্বান*, কিতাবখানায়ে ইবনে সিনা, করাচি, পাকিস্তান।

৩ আবুল কাসেম ইবন হাওকাল (৯৭৭): *সুরাতুল আরদ*, দারুস সাদির, বৈরুত, লেবানন।

৪ আবুল কাসেম রাফিঈ মাহরাবাদি (১৩৪৫ সৌ.): *খাত্ত ও খাত্তাতান*, মুওয়াস্সাসায়ে ইন্তিশারাতি আমীরে কাবীর, তেহরান, ইরান।

৫ আবুল লাইস (১৯৭১): *জামিউল কাওয়াইদ*, মারকাজি উর্দু বোর্ড, লাহোর, পাকিস্তান।

৬ আবুল লাইস (১৯৭৭): *মুকাদ্দামায়ে হিন্দুস্তানি গ্রামার*, বেনজামিন শেলজে, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

৭ আবেদ আলি আবেদ (১৯৮৯): *আল বায়ান*, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

৮ ইনশা উল্লাহ খান ইনশা (১৯৩৫): *দারইয়ায়ে লাতাফাত*, [উর্দু অনুবাদ পণ্ডিত কায়ফি], আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দুয়ে হিন্দ, আওরঙ্গবাদ এডিশন, ভারত।

৯ ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি (১৯৬৭): *বিররে আজিমে পাক ও হিন্দ কি মিল্লাতে ইসলামিয়া*, করাচি ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, পাকিস্তান।

১০ ইহতেরাম উদ্দিন শাগেল (১৯৬৩): *সহিফায়ে খুশনাভিসা*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, আলিগড়, ভারত।

১১ ইহতেশাম হুসাইন (১৯৮৩): *উর্দু আদাবকি তানকিদি তারিখ*, কাওমি কাউন্সিল বরায়ে ফারুগে উর্দু, দিল্লি, ভারত।

১২ ইহতেশাম হুসাইন (১৯৪৭): *হিন্দুস্তানি লিসানিয়্যাত কা খাকা* [অনুবাদ]), আদবি প্রেস, লাক্ষ্ণৌ, ভারত (মূল: Dr. Jhon Beames (1875): An Out line of Indian philology)

১৩ এজায রাহি (১৯৮৬): *তারিখে খাত্তাতি*, এদারায়ে সাক্বাফাত, পাকিস্তান।

১৪ কাজী আবদুর রশিদ (১৯৯৬): *মাসদার নুমায়ে ফারসি*, নিউ আর্টম্যান প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার, রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান।

১৫ খান মুহাম্মদ আতিফ (১৯৯৫): *তারিখে জবান ওয়া আদাবিয়্যাতে ফারসি*, খোদাবক্শ লাইব্রেরি, পাটনা, ভারত।

১৬ গোলাম মোস্তফা খান (১৯৯৩): *ফারসি পর উদু কা আসর*, উর্দু মারকাজ, লাহোর,পাকিস্তান।

১৭ গোলাম রব্বানী (২০১৪): *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান*, মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৮ জামিল জালিবি (১৯৮৬): *তারিখে আদবে উর্দু*, মজলিসে তারাক্কি আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

১৯ তালআত বাসারি (১৩৪৬ সৌ): *দস্তুরে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, কুতুব খানা তহুরি, তেহরান, ইরান।

২০ তারেক আজিজ (অনু): *উর্দু রাসমুল খাত্ত আওর টাইপ*, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

২১ নাসিরুদ্দিন হাশিমি (১৯৫২): *দাকান মে উর্দু*, মাকতাবায়ে মুঈনুল আদাব, লাহোর, পাকিস্তান।

২২ নাসিম হেজাজি (২০০১): *মুহাম্মদ বিন কাসেম* (অনুবাদ, আইয়ুব বিন মুঈন), আল কাউসার প্রকাশনি, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৩ নুরুদ্দিন মুহাম্মদ (১৯৭০): *তুজকে জাহাঙ্গিরি*, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান ।

২৪ নুরুল হাসান নাকাভি (২০০৪): *তারিখে আদাবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

২৫ ফরমান ফতেহপুরি (১৯৮৬): *তাদরিসে উর্দু*, মুক্তাদিরা কাওমি জবান, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

২৬ ফারহাত শামিম (২০১২): *উর্দু আওর ফারসি কে রাওয়াবেত*, আজাদ বুক ভিশন, জুম্মু, ভারত।

২৭ মাসউদ হুসাইন খান (১৯৬৬): *মুকাদ্দমায়ে তারিখে যাবানে উর্দু*, উর্দু মারকাজ, লাহোর, পাকিস্তান।

২৮ মুমতাজ হুসাইন জৌনপুরি (১৯৬১): *খাত্ত ওয়া খাত্তাতি*, একাডেমি অফ এজুকেশন রিসার্চ, করাচি, পাকিস্তান।

২৯ মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টি (১৯৯০): *বিররে সাগির মে ইসলাম কে আওয়ালে নুকুশ*, ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান।

৩০ মুহাম্মদ খুজায়েলি (১৩৪৯ সৌ.): *দাস্তুরে যাবানে ফারসি*, মারকাজে তাহকিকাতে ফারসি, ইরান।

৩১ মুহাম্মদ পালনপুরি (২০২০): *তারিখে হিন্দ*, মাকতাবতুস সালাম, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৩২ মুহাম্মদ সাজ্জাদ মির্জা (১৯৮৯): *উর্দু রাসমুল খাত্ত*, মুক্তাদিরা কাওমি যবান ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

৩৩ মুহাম্মদ সিদ্দীক খান শিবলি (১৯৯১): *তাসিরে যাবানে ফারসি বর যবানে উর্দু*, মারকাযে তাহকিকাতে ফারসি ইরান ও পাকিস্তান, ইসলামাবাদ।

৩৪ মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ (১৯৫০): *আবে হায়াত*, শেখ মোবারক আলি তাজ কুতুব আন্দুরুন, লাহোর, পাকিস্তান।

৩৫ মুহিউদ্দিন কাদেরি জুর (১৯৬০): *হিন্দুস্তানি লিসানিয়্যাত*, নাসিম বুক ডিপু, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

৩৬ মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৮৬২): *দেওয়ানে গালিব* (উর্দু), মাতবায়ে নিজামি, কানপুর, ভারত।

৩৭ মির্জা খলিল আহমদ বেগ (২০১৭): *উর্দু যাবান কি তারিখ*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

৩৮ মির্জা খলিল আহমদ বেগ (২০১৭) : *উর্দু যাবান কি লিসানি তাশকিল*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

৩৯ শওকত সব্জ ওয়ারি (১৯৬০): *দাস্তানে উর্দু* , আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দু, করাচি, পাকিস্তান।

৪০ শামসুল্লাহ কাদেরি (১৯২৭): *তারিখে যাবানে উর্দু*, নাভেল কিশোর, কানপুর, ভারত।

৪১ শেখ মুহাম্মদ ইকরাম (১৯৯২)*: আবে কাউসার* ইদারা, সাকাফাতে ইসলামিয়া লাহোর, পাকিস্তান।

৪২ সাজিদুল্লাহ তাফহিমি (অনু): *ফরহাঙ্গে ইস্তিলাহাতে উলুমে আদাবি*, (অনু)।

৪৩ সিদ্দিক খান শিবলি (১৯৯১): *তাসিরে যাবানে ফারসি বর জবানে উর্দু*, মারকাজে তাহকিকাতে ফারসি ইরান ও পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

৪৪ সুকুমার সেন (২০১৮): *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সিকাদর বাগান ষ্ট্রিট, কোলকাতা।

৪৫ সুহাইল বুখারি (১৯৯১): *উর্দু যাবান কা সওতি নেযাম আওর তাকাবুলি মুতালাআ*, মুক্তাদিরা কাওমি যাবান, ইসলামাবাদ।

৪৬ সুহাইল বুখারি (১৯৯১): *লিসানি মাকালাত*, মুক্তাদিরা কাওমি যাবান, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

৪৭ সৈয়দ আব্দুল্লাহ (১৯৬৭): *আদাবিয়্যাতে ফারসি মে হিন্দুউ কা হিস্সা*, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

৪৮ সৈয়দ আবদুল্লাহ (১৯৭৭): *ফারসি যাবান ও আদব*, মসলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

৪৯ সৈয়দ মুহাম্মদ সেলিম (১৯৮১): *উর্দু রাসমুল খাত*, মুক্তাদিরা কাওমি যাবান, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

৫০ সৈয়দ হাসান সদরুদ্দিন জাওয়াদি (১৯৯৩): *দাস্তর নাভিসিয়ে ফারসি দর শিবহে কার্‌রাহ*, মারকাজ তাহকিকাতে ফারসি, তেহরান, ইরান।

৫১ হরেন্দ্র চন্দ্রপাল (১৯৫৪): *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক অজিত চন্দ্র ঘোষ, কোলকাতা, ভারত।

৫২ হাফেজ মাহমুদ শিরানি (১৯৮৫): *মাকালাতে হাফেজ মাহমুদ শিরানি*, মজলিসে তারাক্কি আদব, লাহোর, পকিস্তান।

৫৩ E.L. Bril (1978): *TheEncyclopaedia of Islam*, New edition, , Leiden, Netherland

৫৪ G A Grierson (year not mentioned): *Liinguistic Survey of Pakistan*, Vol-1, Accurate Publisher, Lahore, Pakistan.

৫৫ India (1996): A Country Study, Federal Research Division, Library of Congress, Washington.

তৃতীয় অধ্যায়

উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে ফারসির প্রভাব

অনুবাদ-সাহিত্য সকল ভাষারই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অনুবাদ সাহিত্যের কারণে ভাষা আরো গতিশীল ও শাণিত হয়ে উঠে। অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষা সাবলীল হয়। ভাষায় আসে উদারতা। অন্যভাষার সাহিত্যরস আহরণে অনুবাদ সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উর্দু ভাষার অনুবাদ সাহিত্য ফারসি ভাষার সাহিত্যরস থেকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব গ্রহণ করেছে। তাই দেখা যায় মূল অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ হিসাবে অসংখ্য গ্রন্থ উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে। এক সময় উর্দু সাহিত্যকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুবাদ সাহিত্য বলা হতো। ফারসি ভাষার সাহিত্যরস থেকে আহরিত উর্দু অনুবাদ সাহিত্য হলো উর্দু ভাষার মূলভিত্তি। উল্লেখ্য যে, উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বলতে মূলত উর্দু গদ্য সাহিত্যে ফারসির প্রভাবকে বোঝানো হয়।

উর্দু ভাষা ইসলামি ভাবধারার ভাষা বলে অনেকে মনে করেন। এর মূল কারণ হলো উর্দু ভাষার অনুবাদ সাহিত্য। অগণিত ইসলামি ভাবধারার গ্রন্থ ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও ছিলো চোখে পড়ার মতো। অনুবাদ সাহিত্যে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় উর্দু ভাষার সমৃদ্ধিও অনেক বেশি।

উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে নাদওয়াতুল উলামার অবদান

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে উর্দু ভাষায় গ্রন্থাদির অনুবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো লক্ষ্ণৌর নাদওয়াতুল উলামা সংগঠন। ইসলামি শিক্ষাকে প্রাচীনপন্থী আলেমগণের চিন্তা-চেতনার প্রভাব মুক্ত করে জীবনঘনিষ্ঠ কারিকুলাম প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঁকড় ফারসি ও আরবি ভাষার বই-পুস্তকগুলো তাঁরা দেশীয় উর্দু ভাষায় অনুবাদের প্রয়াস চালান। তা ছাড়া মাওলানা শিবলি নোমানি কর্তৃক সম্পাদিত *আন-নাদওয়া* নামক ম্যাগাজিনে ফারসি ভাষা থেকে আহরিত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাসহ অসংখ্য কুরআনের আয়াত ও হাদিস অনূদিত হয়। এ অনুবাদ উর্দু ভাষার পাঠকদের চেতনাকে ইসলামি ঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার আবহ গড়ে উঠে এবং ১৮৩৪ মতান্তরে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মূলত এ অঞ্চলের সরকারি ভাষা ছিলো ফারসি। এ সময় ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন ভারতবাসীর কাছে শিক্ষিত এবং মার্জিত হওয়ার পরিচায়ক ছিলো। ১৮৩৭ খিষ্টাব্দে ফারসি ভাষার স্থান ইংরেজি ভাষা দখল করলেও সাধারণ মানুষ প্রেম-ভালোবাসা আর ধর্মীয় ভাষা হিসাবে ফারসি ভাষাকে আগলে রেখেছিলো আরো প্রায় এক শতাব্দীকালেরও বেশি সময়। (রিয়াজ, ১৯৭৭: ১৫-১৬)

উর্দু অনুবাদ সাহিত্যের যুগভিত্তিক বিশ্লেষণ

উর্দু ভাষার অনুবাদ সাহিত্যের কালক্রমকে আমরা তিনটি যুগে বিভক্ত করতে পারি। প্রামিক যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাথমিক যুগ হলো ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫) থেকে উর্দু সাহিত্যের প্রথম গদ্য রচয়িতা মোল্লা ওয়াজহির (মৃত্যু, ১৬৫৯ খ্রি.) *সবরাস* (سب

(رس রচনার পূর্ব পর্যন্ত। এ সময়কার উর্দু সাহিত্য বলতে মূলত ফারসি সাহিত্য থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত গ্রন্থসমূহকে বোঝানো হয়। মোল্লাহ ওয়াজহি *সবরাস* (سب رس) রচনা করেন ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে। *সবরাস* (سب رس) রচনার মাধ্যমে মোল্লা ওয়াজহি (মৃত্যু,১৬৫৯ খ্রি.) উর্দু অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যযুগের গোড়া পত্তন করেন। এ যুগের সময়কাল হলো ১৬৩৪ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়টি উর্দু ভাষার ভাবানুবাদের যুগ। উর্দুভাষী কবি-সাহিত্যিকগণ ফারসি ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের আলোচিত বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যকে আহরণ করে উর্দু ভাষায় ভাবানুবাদ করেছেন। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে উর্দু অনুবাদের আধুনিক যুগের সূচনা হয়। এ সময় উর্দু ভাষার কবি-সাহিত্যিকগণ ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

উর্দু গদ্য সাহিত্যের সূচনা

উর্দু গদ্য সাহিত্য রচনাও শুরু হয়েছিলো ফারসি গদ্যের অনুবাদের মাধ্যমে। উর্দু গদ্য সাহিত্যের জনক দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী খাজা বান্দা নাওয়াজ গেসু দারাজ (মৃত্যু ১৪২১ খ্রি.) কর্তৃক *মিরাজুল আশিকিন* (معراج العاشقين) শীর্ষক গদ্য রচনাটি মূলত একটি ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ। মাখদুম শাহ হুসাইনি বিজাপুরি রচিত *তিলাওয়াতুল ওয়াজুদ* (تلاوة الوجود) ছিলো এর মূগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি আনুমানিক এগারোশ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত। তবে এ অনুবাদে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত উর্দু ভাষার প্রভাব বেশি ছিলো। (জামিল, ২০০৫: ১৫৯-১৬০)

ভারতের বিজাপুরের অধিবাসী সুফি শামসুল উশ্‌শাক শাহ মিরানজি সুফিতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে *জলতরঙ্গ* (جل ترنگ) ও *গুলবাশ* (گل باش) গ্রন্থদ্বয় অন্যতম। গ্রন্থ দু'টি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত উর্দু ভাষায় রচিত হলেও এতে প্রচুর পরিমাণে ফারসি প্রবাদ ও পরিভাষা বিদ্যমান। ফারসি ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা ছাড়া এ গ্রন্থদ্বয়ের মূল বক্তব্য উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব।

ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত মোল্লাহ ওয়াজহির বিখ্যাত গ্রন্থ

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাগ্রে মোল্লাহ ওয়াজহি (মৃত্যু ১৬৫৯ খ্রি.) বিরচিত গদ্যগ্রন্থ *সবরাসের* (سب رس) নাম উল্লেখ করতে হয়। *সবরাস* (سب رس) মূলত একটি গদ্যানুবাদ গ্রন্থ। মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন সিবাক ফাত্তাহি নিশাপুরি কর্তৃক রচিত কাব্যগ্রন্থ *হুসন ওয়া দিল* (حسن و دل) হলো এর মূলগ্রন্থ। গ্রন্থটি মোল্লাহ ওয়াজহির (মৃত্যু ১৬৫৯ খ্রি.) পির ও মুরশিদ ওয়াজিহুদ্দিন গুজরাটির কাছে সংরক্ষিত ছিলো। (আখতার, ১৯৭১: ৬৫।) গ্রন্থটি পারস্যের সুফিতত্ত্ব বিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

মোল্লাহ ওয়াজহি (মৃত্যু ১৬৫৯ খ্রি.) মূলগ্রন্থের কাহিনীর সাথে অনেক সুফিতত্ত্ব ও উপদেশ সংক্রান্ত বিষয় সংযোজন করে গ্রন্থটিকে আরো প্রাণবন্ত করেছেন। এতে বর্ণিত কাহিনীগুলো অবান্তর হলেও গ্রন্থটি সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। মোল্লাহ ওয়াজহি ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেন। ড. হরেন্দ চন্দ্র পালের মতে মোল্লাহ ওয়াজহির (১৬৫৯ খ্রি.) *সবরাস* (سب رس) গদ্যসাহিত্যটি মূলত ফারসি ছোটগল্পের লেখক মোল্লাহ জুহরির *সে নসর* (سہ نثر)-এর অনুকরণে রচিত। (পাল, ১৯৬২: ৮১)

উর্দু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দাস্তান

এ সময় ভারতে আরো কয়েকটি দাস্তান বা গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পায়। উত্তর ভারতের অধিবাসী ঈসায়ী খান বাহাদুরের *দাস্তানে মেহের আফরোজ ওয়া দেলবার* (داستان مہر افروز و دلبر) , মির চান্দ খেতুরির *নৌ আইন* (نو آئین) এবং শাহ আলম সানি কর্তৃক রচিত *আজাইবুল কিসাস* (عجائب القصص) উর্দু দাস্তানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

এ ছাড়া প্রখ্যাত আলেম খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়ার প্রশিষ্য শেখ রোকনুদ্দিন বিন ইমাদ কাশানী স্বীয় মুর্শিদ ও পির শেখ বুরহানুদ্দিন গরিবের ফারসি উপদেশসমূহ সংগ্রহপূর্বক *নাফাইসুল আনফাস* (نفائس الانفاس) গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মিরান ইয়াকুব গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন।

উর্দু ভাষায় সুফি তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের ধারনা

সতেরো শতাব্দীর শেষের দিকে সৈয়দ শাহ মুহাম্মদ কাদেরি কয়েকটি সুফিতত্ত্ব বিষয়ক ফারসি গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আঞ্চলিক উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। উর্দু ভাষায় সুফিতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের ধারণা মূলত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে গৃহীত। সৈয়দ শাহ মির *আসরারুস সানাদিদ* (اسرار الصنادید) নামে এ সময় সুফিতত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর ভারতে উর্দু গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয় সতেরো শতাব্দীর শেষের দিকে। মাওলানা ফজলি লিখিত *দাহমজলিস* (دہ مجلس) এ যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গদ্যগ্রন্থ। এর রচনাকাল ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দ। এ গ্রন্থটিও মাওলানা হুসাইন ওয়ায়েজ কাশিফি রচিত ফারসিগ্রন্থ *রওজাতুশ শুহাদার* (روضۃ الشہداء) উর্দু অনুবাদ। *দাহমজলিসের* (دہ مجلس) লেখক মাওলানা ফজলি সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের বোধপোযোগী করে অনুবাদটি করেছেন। এটিও একটি সুফিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ।

উর্দু ভাষায় আল কুরআনের অনুবাদ

উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম আল-কুরআনের অনুবাদও হয়েছে ফারসি আল-কুরআনের অনুবাদ থেকে। আঠারো শতকের শেষের দিকে দিল্লির প্রখ্যাত আলেম শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলাভির[৪০] (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.) দু'ই পুত্র মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন (১৭৫০-১৮১৮ খ্রি.) এবং মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের (১৭৫৩-১৮১৪ খ্রি.) আল-কুরআনের দু'টি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

শাহ রফিউদ্দিন (১৭৫০-১৮১৮ খ্রি.)-এর অনুবাদটি শাব্দিক অনুবাদ হওয়ায় কিছুটা জটিল বলে মনে হয়। এ অনুবাদটি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে শাহ আব্দুল কাদেরের (১৭৫৩-১৮১৪ খ্রি.) অনুবাদটি ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ পূর্বের অনুবাদের প্রায় ৯ বছর পর প্রকাশিত হয়। এ অনুবাদটি বেশ সাবলীল বলে প্রতীয়মান হয়। মূলত এ অনুবাদটি শাহ অলি উল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.) কর্তৃক বিরচিত আল-কুরআনের ফারসি অনুবাদের উর্দু অনুবাদ। ড. আব্দুল হকের মতে ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদের সংখ্যা নব্বইটিরও অধিক। (হক, ১৯৬১: ২৪৩)

উর্দু ভাষায় আল-কুরআনের উল্লেখযোগ্য অনুবাদক

শাহ আব্দুল কাদের (১৭৫৩-১৮১৪ খ্রি.) এবং শাহ রফিউদ্দিন (১৭৫০-১৮১৮ খ্রি.) ছাড়াও স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.), ডিপুটি নজির আহমদ (১৮৩০-১৯১২ খ্রি.), শাব্বির আহমদ উসমানি (১৮৮৭-১৯৪৯ খ্রি.), আশরাফ আলি থানাভি (১৮৬২-১৯৪৩ খ্রি.), ফাতাহ মুহাম্মদ জালান্দারি (জন্ম, ১৮৬৪ খ্রি.), আবদুল মাজিদ দরইয়াবাদিসহ (১৮৯২-১৯৭৭ খ্রি.) অসংখ্য আলেম ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ সম্পন্ন করেছেন। মোল্লা হুসাইন কাশিফি রচিত *তাফসিরে হুসাইনি* (تفسیر حسینی) ফারসি ভাষায় আল-কুরআনের প্রসিদ্ধ তাফসির। *তাফসিরে কাদেরি* (تفسیر قادری) নামে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সি নভেল কিশোর প্রকাশনা সংস্থার তত্ত্বাবধানে দু'খণ্ডে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শেখ আবু মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব বিন মুহাম্মদ শাফি আল-কুরআনের ফারসি কাব্যিক অনুবাদ পেশ করেন। আলেমদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেখ বাহাউদ্দিন বাজন এর কিয়দাংশ উর্দু ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন।

আমির খসরুর বিখ্যাত গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ

১৮০০ সালে কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে উর্দু ভাষায় অনুবাদের ধারা আরো বেগবান হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফারসি কবিতা ও দাস্তান (গল্প-কাহিনী) উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বলা হয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত *করবল কথার* উর্দু অনুবাদের পরপরই আমির খসরু বিরোচিত *কিস্‌সায়ে চাহার দরবেশ* (قصئہ چہار

৪০. শাহ অলি উল্লাহের (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.) পুরো নাম হলো কুতুবুদ্দিন আহমদ ইবন আব্দুর রহিম। তিনি শাহ অলি উল্লাহ নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের বিজ্ঞ একজন ইসলামি চিনন্তাবিদ ও সংস্কারক। তিনি আধুনিক ইসলামি চিন্তার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর সংস্কামূলক চিন্তার আলোকে ইসলামি আদর্শকে নবরূপে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন।(পালনপুরি, ২০২০: ৪৭)

(درویش ফারসি গল্পগ্রন্থটি মির মুহাম্মদ হুসাইন আতা খান তাহসিন উর্দু ভাষায় ভাবানুবাদ করেন এবং *নাও তরজে মুরাসসা* (نو طرز مرصع) নামে তা প্রকাশ করেন। *নাও তরজে মুরাসসা* (نو طرز مرصع-এর প্রকাশকাল ছিলো ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ। কেউ কেউ এর প্রকাশকাল ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ বলেও উল্লেখ করেছেন। (পাল, ১৯৬২: ২১৪)

উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে বিপ্লব ও গিলক্রিষ্ট

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ড. জন গিলক্রিষ্টের (John Gilchrist) কর্মতৎপরতায় ভারতের অনেক মনীষী উর্দু অনুবাদ সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেন। স্বয়ং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে উর্দু অনুবাদ সাহিত্য আরো গতিশীলতা লাভ করে এবং উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে বিপ্লব সংঘটিত হয়। যে সকল অনুবাদক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে উর্দু অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন তাঁদের মাঝে মির আম্মান, মির শের আলি আফসোস, হুসাইনি, হায়দারি, জোওয়ান, লাল্লু লাল জি, নিহাল চান্দ, ইকরাম আলি, সৈয়দ মুহাম্মদ মনির ও মুরারী লাল গুজরাটি অন্যতম।

মির আম্মানের অনুবাদ সাহিত্য

মির আম্মান (১৭৪৮-১৮০৬ খ্রি.) ছিলেন দিল্লির অধিবাসী। আহমদ শাহ দুররানি ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি আক্রমণকালে তাঁর বাড়ি-ঘর লুট হয়। তারপর তিনি পাটনা হয়ে কোলকাতায় আসেন এবং একপর্যায়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রিন্সিপাল ড. জন গিলক্রিষ্টের ঘনিষ্ঠসাহচার্য লাভ করেন। ড. জন গিলক্রিষ্ট মির আম্মানকে (১৭৪৮-১৮০৬) ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ফারসি কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) বিরোচিত *কিসসায়ে চাহার দরবেশের* (قصصہ چہار درویش) পুনরায় অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

মির আম্মান অনুবাদকর্মটি সমাপ্ত করলে এর তারিখি (আবজাদ হাওয়াজ হিসাব মতে বা অক্ষর বিন্যাসের মান হিসাবে) বা প্রকাশনার দিন নির্দেশক হিসাবে নাম নির্ধারণ করেন *বাগ ও বাহার* (باغ و بہار)। তবে এ ক্ষেত্রে মির আম্মান (১৭৪৭-১৮০৬ খ্রি.) মির মুহাম্মদ হুসাইন আতা খান কর্তৃক পূর্বে অনূদিত *নাও তরজে মুরাস্‌সা* (نو طرز مرصع) থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। *চার দরবেশের কাহিনী* নামে এনায়েত রসুল বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং সমাচার প্রকাশনী তা প্রকাশ করে।

কিস্‌সায়ে চাহার দরবেশ (قصئہ چہار درویش) রচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হলো কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) তাঁর গুরু খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়ার (১২৩৫-১৩২৫ খ্রি.) অসুস্থতার যন্ত্রনা লাঘবের জন্য ফারসি ভাষায় *কিস্‌সায়ে চাহার দরবেশ* (قصئہ چہار درویش) নামে একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রফেসার মাহমুদ শিরানির মতে *কিসসায়ে চাহার দরবেশ* (قصئہ چہار درویش) আমির খসরুর লিখিত গ্রন্থ নয়। (মাহমুদ, ১৯৮৪: ৭৪)

গ্রন্থটি অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ফারসি গ্রন্থের ন্যায় অনূদিত গ্রন্থগুলোও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে মির আম্মান এ গ্রন্থের ভাবানুবাদ করেছেন। যেমন আমির খসরু *কিস্‌সায়ে চাহার দরবেশ*

(قصصہ چہار درویش) শুরু করতে যেয়ে লিখেছেন:

درزمان قدیم پادشاہی سرزمین خوارزم فرنماروائی می کرد کہ پادشاہی دادگر وخردمند بود۔ نام این پادشاہ آزادمرد بود۔

(খসরু, ১৩৫৮হি: ৩)

এর ভাবানুবাদ করতে যেয়ে মির আম্মান (১৭৪৭-১৮০৬) লিখেছেন:

آغاز قصہ کرتاہوں۔ ذراکان دھر کر سنواور منصفی کرو۔ سیر میں چار درویش کی یوں لکھاہے اور کہنے والے نے کہاہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا۔ نوشیروان کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخاوت اس کی ذات میں تھی۔ نام اس کا آزادبخت اور شہر قسطنطنیہ جس کو استنبول کہتے ہیں، اس کا پایۂ تخت تھا۔

(আম্মান, ২০০১: ১৭)

[গল্পটি শুরু করলাম। খুব মনযোগ দিয়ে শোন আর লিখ। চার দরবেশের ভ্রমন কাহিনী সম্পর্কে শ্রুতলিপি এমন যে, বহুদিন পূর্বে রোম দেশে এক বাদশাহ ছিলো। তিনি পারস্য সম্রাট নৌশিরওয়ানের মত ন্যায়বিচারক এবং হাতেমতায়ির মত দানশীল ছিলেন। তাঁর নাম আজাদ। কনস্টান্টিনোপল তথা ইস্তাম্বুল তাঁর রাজত্বের অধীনে ছিলো।]

মির আম্মানের এ গ্রন্থ সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতামত

মির আম্মানে (১৭৪৭-১৮০৬ খ্রি.)-এর এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আধুনিক উর্দু সাহিত্যের অন্যতম জনক স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.) বলেন:

جومرتبہ میر تقی میرکو نظم میں حاصل ہے وہی میرامن کو نثر میں ہے

[উর্দু কাব্য জগতে মির তাকি মির যে সম্মান লাভ করেছিলেন, গদ্য সাহিত্যে মির আম্মান সে সম্মান লাভের উপযুক্ত।] (পাল, ১৯৬২: ২১৭)

মির আম্মান রচিত আরেকটি উর্দু অনুবাদগ্রন্থ

গাঞ্জে খুবি (گنج خوبی) নামে মির আম্মানের (১৭৪৭-১৮০৬ খ্রি.) আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে। সেটিও মোল্লা হোসেন ওয়ায়িজ কাশিফি রচিত ফারসি গ্রন্থ *আখলাকে মুহসিনির* (اخلاق محسنی) ভাবানুবাদ। মির আম্মান (১৭৪৭-১৮০৬ খ্রি.) নিজেই *গাঞ্জে খুবির* (گنج خوبی) ভূমিকায় উল্লেখ করেন:

لیکن فقط فارسی کے ہو بہو معنی کہنے میں کچھ مزہ نہ دیکھا، اس لیے اصل کا مطلب لے کر اپنے محاورہ میں سارا احوال بیان کیا

(আম্মান, ২০০১: ১৮)

[হুবহু ফারসি অনুবাদ করলে গল্পটি এতো হৃদয়গ্রাহী হতো না। তাই মূল বক্তব্যকে সামনে রেখে নিজ ভাষায় সমগ্র বিষয়টি বর্ণনা করেছি।] (মির আম্মান, ২০০১: ১৮)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যতম অনুবাদক মির শের আলি আফসোস

মির শের আলি আফসোস (১৭৩৭-১৮০৯ খ্রি.)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যতম অনুবাদক। পূর্বপুরুষ আগ্রার অধিবাসী হলেও আফসোস ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন উর্দু কাব্যচর্চার কেন্দ্রস্থল লাক্ষ্ণৌতে আফসোস (১৭৩৭-১৮০৯ খ্রি.) বেশ কিছুদিন কাব্যচর্চা করেন। আফসোস (১৭৩৭-১৮০৯ খ্রি.) মির হাসান (১৭৩৬-১৭৮৬ খ্রি.), মির তাকি(১৭২৩-১৮১০) ও মির সৌজ (১৭২০-১৭৯৮ খ্রি.)-এর অনুসরণে কাব্য চর্চা করেন। এক পর্যায়ে ইংরেজ অফিসার কর্নেল স্কটে (Cornell Scott)-এর সাথে পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে তাঁর সুপারিশে মাসিক দুশো টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। তাঁর প্রসিদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থের নাম হলো *বাগে উর্দু* (باغ اردو)। এটি মূলত ইরানের প্রসিদ্ধ কবি শেখ সাদি শিরাজি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) রচিতগ্রন্থ *গুলিস্তানের* (گلستان) উর্দু অনুবাদ। এ অনূদিত গ্রন্থটি ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়।

সৈয়দ হায়দার বখ্‌শ হায়দারি

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আরেকজন অনুবাদক হলেন সৈয়দ হায়দার বখশ হায়দারি (মৃত্যু, ১৮২৩ খ্রি.)। ড. জন গিলক্রিষ্ট (John Gilchrist) হায়দারি (মৃত্যু, ১৮২৩ খ্রি)-এর উর্দু জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করেন। হায়দারি (মৃত্যু, ১৮২৩ খ্রি.) এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো অধিকাংশই ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিতগ্রন্থগুলো হলো:

১. *কিস্‌সায়ে লায়লা-মজনুন* (قصہ لیلی مجنون)। এটি মূলত কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) রচিত ফারসি কাব্যের গদ্যানুবাদ। এ কাজটি হায়দারি (মৃত্যু, ১৮২৩ খ্রি.) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদানের পূর্বে সম্পন্ন করেছিলেন।

২. *তুতি কাহানী* (طوطی کہانی) । গ্রন্থটি ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। এ গ্রন্থটি মূলত কবি সৈয়দ মুহাম্মদ কাদেরির ফারসি *তুতি নামা* (طوطی نامہ) গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ। স্মর্তব্য যে, ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে চণ্ডিচরণ *তোতা ইতিহাস* নামে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন। (ইউসুফ, ১৯৬৮: ৫৮)

৩. *আরায়িশে মাহফিল* (آرائش محفل)। এটি মূলত ফারসি ভাষায় রচিত *কিস্সায়ে হাতেম তায়ির* (قصہ حاتم طا ئی) উর্দু অনুবাদ।

৪. *তারিখে নাদিরি* (تاریخ نادری) । এটি মূলত মির্জা মাহদি রচিত ফারসি গ্রন্থ নাদির নামার (نادر نامہ) উর্দু অনুবাদ।

৫. *গুলে মাগফিরাত* (گل مغفرت)। হায়দারির এ অনুবাদ গ্রন্থটি ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি মোল্লা হুসাইন ওয়ায়েজ কাশিফির ফারসি গ্রন্থ *রওজাতুশ শুহাদার* (روضۃ الشہداء) উর্দু অনুবাদ।

৬. *গুলজারে দানিশ* (گلزار دانش) এটি শেখ এনায়েতুল্লাহ কর্তৃক রচিত ফারসি গ্রন্থ *বিহারে দানিশের* (بہار دانش) উর্দু অনুবাদ।

এ ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাবধানে ফারসি, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশটি। (আবু সাঈদ, ১৯৯৭: ২০)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ফরিদপুরের অধিবাসী শেখ ইজ্জতুল্লাহ কর্তৃক রচিত ফারসিগ্রন্থ *গুলে বাকা ভালি* (گل بقاء ولی) অনূদিত হয়। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে নিহাল চান্দ উর্দু ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। মূল গ্রন্থটি রচিত হয়েছিলো ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে । (পাল, ১৯৬২: ২১৯)

ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি উর্দু দাস্তান

এ সময় ফারসি দাস্তান বা ছোট গল্প লেখার ধারাকে সামনে রেখে মাজহার আলি খানের *হাফতে গুলশান* (ہفت گلشن), মির্জা কাজেম আলি জাওয়ানের *শকুন্তলা*, মির বাহাদুর আলি হুসাইনির *আখলাকে হিন্দি* (اخلاق ہندی), নিহাল চান্দ লাহোরির *মাজহাবে ইশক* (مذہب عشق) , লাল্লু লালজির *সিংঘাসন বত্তিসি* এবং বিনি নারায়নের *চাহার গুলশান* (چہار گلشن) নামক দাস্তানগুলোও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে প্রকাশিত হয়। ফলে দাস্তান রচনার এক আবহ সৃষ্টি হয় । গোটা ভারতে দাস্তান রচনার হিড়িক পড়ে যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছাড়াও অনেকে দাস্তান রচনা ও প্রকাশ করেন। শেখ আলি বখশের *কিসসায়ে নাল ওয়া দামান* (قصہ نل و دامن) , ইনশা উল্লাহ খানের *রাণী কৈতকি কি কাহানী* (رانی کیتکی کی کہانی), হাকিকত বিরলবির *হাশত গুলজার* (ہشت گلزار) মুহাম্মদ বখশ মাহজুরের *ইনশায়ে নৌ রতন* (انشائے نو رتن), রজব আলি বেগ সুরুরের *ফাসানায়ে আজাইব* (فسانہ عجائب),

শাগুফেয়ে মুহাব্বত (شگوفۂ محبت), *গুলজার* (گلزار), *সারওয়ার* (سرور) এবং *শাবিস্তানে সারওয়ার* (شابستان سرور) উল্লেখযোগ্য।

উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে নভেল কিশোর প্রকাশনা সংস্থা

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সি নভেল কিশোর প্রকাশনা সংস্থা লাক্ষ্ণৌতে প্রেস স্থাপন করে উর্দু অনুবাদ শাখায় এক নতুন জোয়ার আনে। ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় রচিত ক্লাসিক গ্রন্থগুলো নভেল কিশোর প্রকাশনা থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়। এক কথায় ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ফারসি ও আরবি গ্রন্থগুলো নভেল কিশোর প্রেস প্রকাশনা সংস্থা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে।

সম্রাট আকবরের সভাকবি মোল্লা ফয়জি রচিত ফারসি কাহিনীকাব্য *দাস্তানে আমির হামজা সাহিবকারান*(داستان امیر حمزہ صاحبقران)। এ দাস্তানে *তালাসসুমে হোশরুবা* (طلسم ہوشربا) এবং *নৌশিরওয়ান* (نوشیر وان) নামক বিপুল পরিসরের বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ উপাখ্যানগুলো স্থান পেয়েছে। এ দাস্তানগুলো নভেল কিশোর প্রকাশনা সংস্থা ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে উর্দু ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে। মূল অনুবাদক ছিলেন আব্দুল্লাহ বুলগেরামি। *দাস্তানে আমির হামজা সাহিবকারান* (داستان امیر حمزہ صاحبقران) হলো ৪৬ খণ্ডের প্রায় সতেরো হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি ফারসি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি অনেকেই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। সর্বপ্রথম অনূদিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে। অনুবাদক ছিলেন খলিলুল্লাহ আশ্‌ক। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আমানুল্লাহ খান গালিব লাক্ষ্ণাভির অনুবাদে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায়। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাসাদ্দুক হুসাইন রিজভির অনুবাদে তৃতীয় এবং ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব লাহোর, পাকিস্তান কর্তৃক রঙ্গিন কাগজে দাস্তানটির উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

নভেল কিশোর কর্তৃক প্রকাশিত আরো কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থ

উর্দু ও ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি মির তাকি মির (১৭২৩-১৮১০খ্রি.) কর্তৃক রচিত ফারসি গ্রন্থ *বোস্তানে খেয়াল* (بوستان خیال) নভেল কিশোর প্রকাশনার উদ্যোগে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। আরবি ও ফারসি দাস্তান *আলিফ লায়লা* (الف لیلی) এর উর্দু অনুবাদও এ সময় নভেল কিশোর প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। শেখ ইজ্জতুল্লাহ কর্তৃক রচিত ফারসি গ্রন্থ *গুলে বাকা ভালি* (گل بقائے ولی), বিখ্যাত কাহিনী *তুতি নামা* (طوطی نامہ) ও *কালিলা ও দিমনা* (کلیلہ و دمنہ) নভেল কিশোর প্রকাশনা সংস্থা থেকে পুনারায় অনূদিত ও মুদ্রিত হয়।

উর্দু গল্পে ফারসির প্রভাব

উর্দু গল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রায় দুশো বছরের। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে উর্দু ভাষায় যে গল্পগুলো রচিত হয়েছে তাতে প্রেম-ভালোবাসা, প্রেমিকার অন্বেষণ এবং ভ্রমন কাহিনীর আধিক্য চোখে পড়ে। এ গল্পগুলোর মূল বক্তব্যে ভালোবাসা-অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব প্রকাশ, পরোপকারিতা, শান্তি ও নিরাপত্তার

জয়গান বেশি ব্যক্ত করা হয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের গল্পগুলো যেভাবে সুস্থ্য সংস্কৃতি চর্চার আবহ তৈরি করে, তেমনি উর্দু গল্পেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। উর্দু গল্পগুলো আপন কৃষ্টির ঐতিহ্য ধরে রেখেছে নিপুণভাবে। তাতারি ও মোগোলদের অত্যাচারের কারণে ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিলো, ফারসি গল্পগুলোতে এ সমস্যা নিরসনে এক কাল্পনিক শক্তির চিত্রায়ন করা হয়েছে। উর্দু গল্পগুলো তার হুবহু অনুসরণই কেবল করেনি; বরং আরো এক ধাপ এগিয়ে কল্পনার এ স্বর্গরাজ্য তৈরিতে পাঠককে উৎসাহিত করেছে।
(জেইন, ১৯৮৭: ৫৬)

উর্দু গল্পের বৈশিষ্ট্য

উর্দু দাস্তান তথা গল্পের মূল চরিত্রগুলোতে চিন্তার প্রসারতা অনেক বেশি। এখানে চরিত্রগুলো আত্মকেন্দ্রিক নয়। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের দাস্তান যেমন *সবরাস* (سب رس), *আরায়েশে মাহফিল* (آرائش محفل), *নৌ আইনে হিন্দি* (نو آئین ہندی) *নসরে বেনজির* (نثر بے نظیر), *মাজহাবে ইশক* (مذہب عشق), *গুলজারে দানেশ* (گلزار دانش),*চাহার গুলশান* (چہار گلشن) প্রমুখ দাস্তানগ্রন্থে কেবল প্রেমকাহিনীই বর্ণনা করা হয়নি; বরং চেষ্টা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ নিজের ও সমাজের উন্নয়ন করতে সক্ষম এ বার্তাটিও দেয়া হয়েছে।

ফারসি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ শাহনামে সম্পর্কে কিছু কথা

উর্দু ভাষার সাথে ভারতের অপরাপর ভাষাগুলোর সেতু বন্ধন তৈরি করেছিলো মহাকবি হাকিম আবুল কাসেম ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *শাহনামে* (شاہنامہ)। কবি ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) ফারসি সাহিত্য জগতের এক কিংবদন্তি ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। প্রায় ৩০ বছর সময়কাল ধরে লিখিত এ গ্রন্থটি সাত খণ্ডে রচিত। এ ছাড়াও তিনি ইউসুফ-জুলেখার প্রেম কাহিনী নিয়ে আরেকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ইরানের ইতিহাস ঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হলো ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) রচিত *শাহনামে* (شاہنامہ) গ্রন্থ। নাটকীয় কায়দায় *শাহনামে*(شاہنامہ) -এর প্রতিটি বর্ণনা এমন যে, মনে হয় চোখের সামনে সব কিছু ঘটে চলছে। ইরানের আভেস্তা যুগ থেকে আরবদের ইরান আক্রমণ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস ঐতিহ্য, গল্পকাহিনীর বাস্তব চিত্র ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) মহাগ্রন্থ *শাহনামে* (شاہنامہ)-এর মধ্যে অত্যান্ত সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন। ফেরদৌসির *শাহনামে* (شاہنامہ) এমন এক গ্রন্থ যার বিকল্প অন্য কোনো সাহিত্যে পাওয়া বিরল। এতে কবি ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) রোস্তম-সোহরাবের মতো গল্পের অবতারণা করেছেন। বিষয়টি পাঠকের হৃদয়কে আলোড়িত ও ভারাক্রান্ত করে তোলে। রোস্তম-সোহরাব গল্পে কবি পিতার হাতে সন্তানের মৃত্যুর যে ব্যথাতুর চিত্র তুলে ধরেছেন তা ভোলার মতো নয়। এ উপমহাদেশে *শাহনামে* (شاہنامہ) এতো সমাদৃত ছিলো যে, মোল্লা আবুল ফজল বাদশা আকবরের দরবারে তাঁর নির্দেশে প্রত্যহ *শাহনামে* (شاہنامہ) পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। (আমির, ১৯৮৪: ১৮।)

বাল্মিকি যেমন *রামায়ণ* লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, কবি ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) তেমনি *শাহনামে* (شاہنامہ) রচনা করে বিশ্বব্যপী নন্দিত হয়েছেন। এ বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে ইতিহাস ও দর্শনরে সমাবেশ ঘটেছে। তা ছাড়া ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছেও *শাহনামে* (شاہنامہ) একটি অমূল্য সম্পদ।

শাহনামের বৈশিষ্ট্য

শাহনামে (شاہنامہ)-এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাতে ভারত ও ইরানের প্রাচীন সম্পর্কের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের নারীদের প্রশংসায় কখনো ইরানের রাজা-বাদশাহদের বিয়ের আকাঙ্খা, উপঢৌকন প্রেরণ, দাবা খেলার আয়োজন, ভারতীয় বাদশাহদের সাথে চিঠির আদান-প্রদান, সংস্কৃত ভাষায় রচিত *কালিলা ও দিমনা* (کلیلہ و دمنہ) গ্রন্থের বরাত দিয়ে ভারতের পরিচয় উপস্থাপন, উভয় দেশের বাদশাহর পারস্পরিক সাক্ষাৎ ইত্যাদির বর্ণনা এসেছে সুনিপুণভাবে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে *শাহনামা* (شاہنامہ) প্রকাশিত হয়। ভারতের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে *শাহনামে* (شاہنامہ) একশর উপর হস্তলিপি বা মাখতুতাত পাওয়া যায়। (আমির, ১৯৮৪ : ২৩।) শাহনামে (شاہنامہ) ভারতের প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মুন্সি মুলচন্দ উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম *শাহনামা* (شاہنامہ) অনুবাদ করেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে নভেল কিশোর প্রকাশনা সংস্থা তা প্রকাশ করে।

আধুনিক উর্দু সাহিত্যের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম আল্লামা শিবলি নোমানি তাঁর রচিত গ্রন্থ *শেরুল আজম* (شعر العجم) -এ *শাহনামে* (شاہنامہ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন:

فردوسی اپنی کتاب 'شاہنامے' میں ایران کے اساطیر اور قبل اسلام ایرانی تاریخ کے موضوع پر پوری ذمہ داری سے قلم اٹھایا

(শিবলি, ১৩৩৯ হি: ৪২)

[ফেরদৌসি স্বীয়গ্রন্থ *শাহনামে* (شاہنامہ) -এর মধ্যে ইরানের লোককাহিনী এবং ইসলামপূর্ব ইরানের ইতিহাস ঐতিহ্যের বিষয়সমূহ বর্ণনায় পূর্ণ দায়িত্বের সাথে কলম ব্যবহার করেছেন।]

এ প্রসঙ্গে *দাকান মে উর্দু* (دکن میں اردو) গ্রন্থের লেখক প্রফেসার মাহমুদ শিরানি বলেন:

فردوسی نے ایران کے قدیم تمدن کو تاریکی اور گمنامی کے غار سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے

(মাহমুদ, ১৯৮৪: ২৭)

[কবি ফেরদৌসি তিমির অন্ধকারের গহ্বর থেকে বের করে পৃথিবীর সকল সাহিত্য পিপাসুর সামনে ইরানের প্রচীন কৃষ্টি-কালচারকে উপস্থাপন করেছেন।]

***শাহনামের* অনুকরণে উর্দু কাব্যগ্রন্থ**

ভারতীয় কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই *শাহনামে* (شاہنامہ)-এর ছন্দে কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন। মাওলানা আবদুল মালিক উসামির ফারসি ভাষায় রচিত ভারতীয় রাজা-বাদশাহদের

বিজয়গাঁথা *ফুতুহুস্ সালাতিন* (فتوح السلاطين) গ্রন্থটি *শাহনামা* (شاہنامہ) -এর ছন্দে তথা দ্বিপদী ছন্দে রচনা করেছেন। অনেকে এ গ্রন্থটিকে *শাহনামায়ে হিন্দ* (شاہنامہ ہند) বলে থাকে। শেখ আজরদি আহমদ শাহ বাহমানির বিজয়গাঁথা *বাহমান নামে* (بہمن نامہ) *শাহনামে* (شاہنامہ) -এর আদলে লিখতে চেষ্টা করেছেন। মোল্লা ফিরোজ মোগল বাদশাহদের ইতিহাস *বিরতানাভি হিন্দুস্তান কি তারিখ* (برطانوی ہندوستان کی تاریخ) *শাহনামে* (شاہنامہ) কাব্য গ্রন্থের ছন্দে লিখেছেন।

জালিসুল মুশতাক (جلیس المشتاق) গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ আলি আমির ইনশা বলেন:

'আমি একদা কবি ফেরদৌসিকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের গল্পগুলোকে শাহনামে (شاہنامہ) -এর ছন্দে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। *জালিসুল মুশতাক* (جلیس المشتاق) হলো সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ'। (মির ইনশা, ১৯৮৭: ৪৭)

কিন্তু *শাহনামে* (شاہنامہ)-এর কোনো উপমা হয়না। *শাহনামে* (شاہنامہ)-এর উপমা *শাহনামে* (شاہنامہ) নিজেই। পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে এর কোনো বিকল্পগ্রন্থ নেই। জগৎ বিখ্যাত কালজয়ী এ গ্রন্থটি আজও পাঠক মহলে তেমনি সাড়া জাগায়, যেভাবে শতসহস্র বছর পূর্বে সাড়া জাগিয়ে ছিলো। এর আবেদন এখনো ফুরায়নি। এ বিস্ময়কর কাব্যগ্রন্থটির অনেকগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে। শাহনামে (شاہنامہ) কাব্যগ্রন্থে ইরানের পৌরানিক ইতিহাস ও সাহিত্যকর্ম সংরক্ষিত আছে।

শাহনামের (شاہنامہ) উর্দু অনুবাদ

উর্দু ভাষায় *শাহনামে* (شاہنامہ) -এর একাধিক উর্দু অনুবাদ হয়েছে। জনাব নাসির হুসাইন খিয়াল আজিমাবাদি ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের *শাহনামে* (شاہنامہ) অনুবাদ করেন। এটি খুব প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এতে অনুবাদের পাশাপাশি উর্দু ব্যাখ্যাও তুলে ধরা হয়েছে। মহাকাব্য *শাহনামে* (شاہنامہ) গ্রন্থে সোহরাব স্বীয় পিতা রোস্তমের আঘাতে ধরাশায়ী হওয়ার ঘটনাটি অত্যান্ত হৃদয়বিদারক করে তুলে ধরা হয়। কবি ফেরদৌসি বলেন:

بہ کشتی گرفتن نہادن سر گرفتند ہر دو دوآل کمر

(ফেরদৌসি, ১৩৭৪ সৌ.: ৩৪৬)

নাসির হুসাইন এ পংক্তিটির উর্দু অনুবাদ করেন:

رستم نے آخر سہراب کو پکڑا، ہچکولہ دیکر اٹھایا، سر سے اونچا کیا، چکر دیا اور دے ٹپکا۔

(নাসির, ১৯৫৯: ১০৭২)

[অবশেষে রোস্তম সোহরাবকে ধরাশায়ী করলো, ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে মাথার উপর নিলো এবং ঘুরিয়ে সাজোরে মাটিতে আঘাত করলো।]

ফারসি কবি শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের আরেকজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন শেখ ফরিদুদ্দিন মুহাম্মদ আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি)। তিনি নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় একশো বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জন্ম ১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ৮৩ বছর জীবন পেয়েছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে সুফি-সাধকদের সংস্পর্শে আসেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ সুফি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন:

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اند ر خم یک کوچه ایم

(শাফাক, ১৩৪১ সৌর.: ১২৫)

[আত্তার প্রেমের সপ্ত নগর পরিভ্রমণ করেছেন, আমরা এখনো প্রেমের গলির এককোণে পড়ে আছি।]

গোটা বিশ্বের সুফি-সাধকগণ তাঁর সুফিতত্ত্বে অবগাহন করে থাকেন। তাঁর রচিত *পান্দ নামে* (پند نامہ) এবং *মানতিকুত তায়ের* (منطق الطیر) নামক গ্রন্থদ্বয় সুফিদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

ফরিদুদ্দিন আত্তার রচিত *মানতেকুত তায়ের* (منطق الطیر) এর মূল বক্তব্য

কথিত আছে তিনি সুফিতত্ত্ব বিষয়ক প্রায় একশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত *মানতিকুত তায়ের* (منطق الطیر) গ্রন্থে সাধকদের আল্লাহ তাআলার অন্বেষণে সাতটি স্তর অতিক্রম করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার প্রথম স্তর হলো অনুসন্ধান। এরপর ইশক, মারিফাত, ইস্তিগনা, তাওহিদ, হায়রাত এবং ফানার স্তর অতিক্রমণ করে মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহকে উপলব্ধি করার সাতটি স্তরকে তিনি সাতটি উপত্যকার সাথে তুলনা করেছেন। এর প্রথম স্তর থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছলে মানুষ নিজের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়। তখন সে তাঁর মাঝে আল্লাহকে উপলব্ধি করে। আত্মপরিচয়ে বিভোর হয়ে সে আল্লাহতে লীন হয়। ফানা থেকে বাকা বা নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের স্তরে পৌঁছায়। এ গ্রন্থে প্রায় চার হাজার ছয়শ পংক্তি রয়েছে। হাকিম মতিউর রহমান নক্শবন্দির অনুবাদসহ এর একাধিক উর্দু অনুবাদ বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে।

আত্তার রচিত *পান্দ নামে* গ্রন্থ

ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত *পিন্দ নামে* (پند نامہ) উপমহাদেশের সর্বজন সমাদৃত একটি গ্রন্থ। এই উপদেশমূলক গ্রন্থটি সারা বিশ্বের কওমি তথা দেওবন্দি ধারার মাদরাসাগুলোর পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আত্তার এ গ্রন্থে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা থেকে শুরু করে খোদাভীরুতা, মুনাজাত ইত্যাদি বিষয়গুলোকে উপদেশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ভারতের মাওলানা হানিফ গাঙ্গুহি, মাওলানা জামিল আহমদসহ অনেকেই এর উর্দু অনুবাদ করেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের বর্তমান শিক্ষক মাওলানা কাফিলুর রহমান নকশেবন্দির অনুবাদ ও টীকাসহ গ্রন্থটি জিয়াউল কুরআন পাবলিশার্স কর্তৃক ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। চট্টগ্রামের দারুল মাআরিফ বাংলাদেশের প্রবীণ শিক্ষক মাওলানা সুলতান

জওক *কিন্দ খামে* (قند خامہ) নাম করণ করে গ্রন্থটি সহজ উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন। যেমন শেখ আত্তার বলেন:

نفس و شیطان زد کریما راہ من　　رحمتت باشد شفاعت خواہ من

چشم دارم از گنہ پاکم کنی　　پیش از آن کاندر جہان خاکم کنی

(আত্তার, ১৯২২: ৪)

মাওলানা সুলতান জওক এর অনুবাদে বলেন:

اے کریم نفس و شیطان نے میری راہ ماردی تیری رحمت ہی میری سفارش کار ہووے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے تو گنہ سے پاک کرے گا اس سے آگے کہ تو مجھے قبر میں مٹی کر دے گا

(সুলতান, অনুল্লেখিত: ১৭)

[হে আল্লাহ, প্রবৃত্তি এবং শয়তান আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিচ্ছে। আশা করি তোমার রহমত আমার সুপারিশকারী হবে। আশা রাখি আমি কবরে মাটি হয়ে যাওয়ার পূর্বে তুমি আমাকে গুনাহের থেকে পবিত্র করে তুলবে।]

মাওলানা মুস্তাক আহমদ যশোরি এর বাংলা অনুবাদ করেছেন।

ফারসি কবি উমর খৈয়াম ও তাঁর কবিতার উর্দু অনুবাদ

ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খ্রি.) ফারসি ভাষার আরেকজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রুবায়ি বা চতুষ্পদি কবিতাগুলো উর্দু ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলো। ওমর খৈয়াম ছিলেন সহস্র প্রতিভার অধিকারী এক সাহিত্যিক। গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। ইসলামের বর্ষপঞ্জি সংস্কারেও তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি বংশীয়ভাবে তাঁবুর ব্যবসা করতেন বলে তাঁর খৈয়াম উপাধি ছিলো। খৈয়ামের রুবায়ি কবিতা উর্দুসহ পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। উর্দু ভাষায় তার রুবায়ি কবিতার অনুবাদের সংখ্যা ৩০ টির অধিক।

সবচেয়ে মানসম্পন্ন অনুবাদ বলে ধারনা করা হয় মৌলাভি হাফেজ জালালুদ্দিন আহমদ জাফরি কর্তৃক অনূদিত রুবায়ি কাব্যগ্রন্থটি। তাঁর অনুবাদকর্মটি ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ইলাহবাদ আনোয়ার আহমদি প্রকাশনা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এটি অনেক সাবলীল ও সহজ ভাষায় অনূদিত। পাঠক মহলে এই অনুবাদটি সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছে।

প্রফেসার ওয়াকিফ মুরাদাবাদি *রুবাইয়্যাতে ওমর খৈয়াম* (رباعیات عمر خیام) -এর ছান্দিক অনুবাদ করেছেন। এই ছান্দিক অনুবাদটি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ মুরতাজা হুসাইন লাখনাভির একটি অনুবাদও বর্তমানে বহুল সমাদৃত।

উমর খৈয়ামের রুবায়ি কবিতার বৈশিষ্ট্য

ওমর খৈয়ামের রুবায়ির ভাষা অতিসরল, ছন্দ অতিমধুর আর ভাব অতি আবগেপূর্ণ। তাঁর কবিতায় সুফি চিন্তাধারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। তবে ভাবের গভীরতা ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) , জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.) ও কবি হাফিজ (মৃত্যু, ১৩৮৯ খ্রি.)-এর তুলনায় অনেক কম। যেমন একটি কবিতায় উমর খৈয়াম বলেন:

این یک دو سہ روز نوبت عمر گذشت چون آب بجوے بار و چون باد بدشت

ہرگز غم دو روز مرا یاد نگشت روزی کہ نیامدہ ست و روزی کہ گذشت

(ওমর, ১৯৬৫: ১২২)

এর ছান্দিক অনুবাদে প্রফেসার ওয়াকিফ মুরাদাবাদি বলেন:

بے مدت عمر بس دوروزہ گویا ندی کا سا پانی ہے کہ صحرا کی ہوا

دو دن کا کبھی غم نہیں ہوتا ہے مجھے اک دن جو نہیں آیا اک دن جو گیا

(ওয়াকিফ, ১৯৬৫: ১৫২)

[জীবনের এই সীমিত সময় নদীর পানি আর মরুর লু-হাওয়ার মত অতিবাহিত হয়েছে। যেদিন চলে গেছে আর যেদিন আসবে এ দু' দিনের ব্যাপারে আমার কোনো ভাবনা নেই।]

ফারসি কবিতায় সুফিভাবের প্রবণতার কারণ

ইরানিগণ তাতারি ও মোগলদের অত্যাচারের প্রতিবাদের সুযোগ না পেয়ে এক পর্যায়ে আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেদের সব অভিযোগ-অনুযোগের কথা প্রকাশ করেছে। যে কারণে ইরানে খ্রিষ্টীয় হাজার থেকে ষোলশতকের কবিদের মাঝে এই সুফিভাবের প্রবণতা অনেক বেশি। ঠিক ভারতবাসী যখন ইংরেজদের কাছে পরাজিত ও অত্যাচারে নিষ্পেষিত,তখন তারা ইরানি এই সুফিবাদের মরমি কবিতায় নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজেছেন। ভারতবাসীকে এর সন্ধানও দিয়েছেন ইরান ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকগণ। তখন সময়ের তাগিদে এ উপমহাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের উপর ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.), উমর খৈয়াম (মৃত্যু, ১৩৮৯ খ্রি.) অন্যান্য কবির ভাষার চেয়ে আবেগের অনেক বেশি প্রভাব পড়েছিলো। তৎকালে উর্দু কবিতা পাঠের আসরগুলোতে ফারসি কবিতাও পঠিত হতো। (পাল, ১৯৫৪: ৭২)

উর্দু অনুবাদ সাহিত্য ও ফারসি কবি শেখ সাদি

ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যে সকল কবি-সাহিত্যিক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো তাঁদের মধ্যে আবু মুহাম্মদ শরফুদ্দিন মুসলেহ উদ্দিন আব্দুল্লাহ শেখ সাদি শিরাজি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) অন্যতম। কবি শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) -এর প্রকৃত নাম শরফুদ্দিন। উপাধি মুসলেহ

উদ্দিন এবং কবি নাম হলো শেখ সাদি। সাদি নামটি কবি তৎকালীন বাদশা আতাবুক সাআদ জাঙ্গির নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছিলেন। তিনি মধ্যযুগের ইরানের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিতগ্রন্থ *বুস্তান* ও *গুলিস্তান* (بوستان و گلستان) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ১০০ টি গ্রন্থের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। (পাল, ১৯৫৪: ৬১)

শেখ সাদি রচিত গ্রন্থ *বুস্তান* ও *গুলিস্তানের* বৈশিষ্ট্য

এ গ্রন্থ দু'টির ভাষা ও বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। *গুলিস্তান* (گلستان) গ্রন্থে মোট আটটি অধ্যায়ে লেখক বিভিন্ন উপদেশমূল ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা উল্লেখ করেছেন। হালাকু খান ও মোগলদের আঘাতে মধ্যপ্রাচ্য যখন বিধ্বস্ত, তখন শেখ সাদির *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* (گلستان و بوستان) পৃথিবীময় শান্তির আবহবার্তা নিয়ে এসেছিলো। *বুস্তান* (بوستان) গ্রন্থে লেখক মোট দশটি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। এ অধ্যায়গুলোতে ন্যায় পরায়ণতা, অপরের উপকার সাধন, খোদার প্রতি প্রেম ইত্যাদি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) *বুস্তান* (بوستان) রচনা করেন ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর এক বছর পর তিনি উপদেশপূর্ণ গল্প তথা গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে *গুলিস্তান* (گلستان) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

বুস্তান ও *গুলিস্তানের* উর্দু অনুবাদ

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় *গুলিস্তান* (گلستان) ও *বুস্তান* (بوستان) গ্রন্থ অনুবাদ হয়েছে। আনুমানিক পনেরো শতকের পূর্বেই গ্রন্থদুটি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। মিসরের বিখ্যাত লেখক জিবরাইল সর্বপ্রথম পুরো *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* (گلستان و بوستان) আরিব ভাষায় অনুবাদ করলে সিরিয়া, লিবিয়া, মিসরসহ গোটা আরব বিশ্বে তা সমাদৃত হয়। (হালি, ১৮৮৮: ৬৭-৬৮।) পরবর্তীকালে এ গ্রন্থগুলো বাংলা, ইংরেজি, তুর্কিসহ অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হয়।

শের আলি আফসোস (১৭৩৭-১৮০৯ খ্রি.) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাধানে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* (گلستان و بوستان) গ্রন্থদ্বয় সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু এ অনুবাদটি খুববেশি প্রাঞ্জল ও সাবলীল হয়নি। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ *বুস্তান* ও *গুলিস্তান* (گلستان و بوستان) এর উর্দু অনুবাদ ও ব্যখ্যা করেছেন। উর্দু ব্যাকরণগত কিছু সমস্যা থাকলেও অনুবাদটি খুবই প্রাঞ্জল। যেমন *গুলিস্তান* (گلستان) -এর অষ্টম অধ্যায়ের শুরুতে শেখ সাদি বলেন:

> مال از بہر آسایش عمر ست۔ نہ عمر از بہر گرد کردن مال. عاقلے را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت! نیکبخت آنکہ خورد و کشت و بدبخت آنکہ مرد و ہشت۔

(সাদি, ১৩৫৪ হি.: ২২০-২২১)

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ এর সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করে বলেন:

مال زندگی کے آرام کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ لوگوں نے ایک عقلمند کو پوچھا نیک بخت کون ہے اور بد بخت کیا ہے؟ اس نے کہا نیک بخت جو کھایا اور بویا اور بد بخت جو کہ مر گیا اور چھوڑ دیا۔

(মুহাম্মদুল্লাহ, ১৪৩২ হি.: ৪২১)

উপরের অনুবাদটি দারুল উলুম দেওবন্দের ফারসি ভাষা বিভাগের প্রধান মাওলানা জাহিরুদ্দিন আহমদের অনুবাদের সাথে তুলনা করলে তার ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। মাওলানা জহিরুদ্দিন লিখেন:

مال زندگی کے راحت کے لیے۔ نہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ لوگوں نے ایک عقلمند سے پوچھا خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون؟ اس نے کہا نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور آخرت کے لیے بویا اور بد بخت وہ ہے جو مر گیا اور مال چھوڑ گیا۔

(জহিরুদ্দিন, অনু: ২১৭)

[অর্থ-সম্পদ জীবনের শান্তির জন্য। জীবন অর্থ-সম্পদ জমা করার জন্য নয়। মানুষেরা একজন জ্ঞানীব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলো, সৌভাগ্যবান কে, আর হতভাগা কে? তিনি উত্তরে বললেন, সৌভাগ্যবান হলো যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং পরকালের জন্য রোপন করে আর হতভাগা হলো যে মরে যায় এবং অর্থ সম্পদ ছেড়ে যায়।]

মাওলানা কাজি সাদ্দাদ হুসাইন শেখ সাদি রচিত *বুস্তান* (بوستان) ও *গুলিস্তান* (گلستان) -এর উর্দু ভাষায় প্রান্তটীকা লিখেছেন। উর্দু ভাষায় এ প্রান্তটীকাসহ এমদাদিয়া লাইব্রেরি বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। প্রজ্ঞা ও দর্শনভিত্তিক আলোচনার কারণে পৃথিবীর বহুভাষায় গ্রন্থ দু'টি অনূদিত হয়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ গ্রন্থদ্বয় সারা বিশ্বের কওমি মাদরাসার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আলেম সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বাংলাদেশের কওমি মাদরাসার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রন্থ দু'টি মাওলানা মুস্তাক আহমদ, মাওলানা আবুল কালাম মাসুম, মাওলানা আবু মূসাসহ অনেকেই বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

গুলিস্তান (گلستان) গ্রন্থটি কবির শিক্ষাজীবন ও ভ্রমণ কাহিনীর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ করে। ধারনা করা হয় যে, কবি শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) *বুস্তান* (بوستان) রচনায় কবি ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.)-এর খানিকটা অনুসরণ করেছেন। সাদির (১২০১০-১২৯১ খ্রি.) পর অনেকেই তাঁর রচনারীতিকে সামনে রেখে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু সাদির (১২১০-১২৯১ খ্রি.)

রচনা কাছেধারেও তা পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালি[৪১] তাঁর রচিত *হায়াতে সাদি* (حیات سعدی) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

> تین کتابیں میری نظر سے گزری ہے جو شیخ کے بعد گلستان کی طرز پر لکھی گئی ہیں۔ ایک مولانا عبد الرحمن جامی کی بہارستان۔ دوسری مجد الدین خوانی کی خارستان تیسری حبیب قاآنی شیرازی کی پریشان۔ ان تینوں کتابوں جب گلستان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے تو جس طرح آفتاب کے سامنے چاند اور شمع دونوں کی روشنی کافور ہو جاتی ہے اسی طرح ان تینوں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔

(হালি, ১৮৮৮: ৯২-৯৩।)

[আমার জানা মতে তিনটি গ্রন্থ সাদির রীতি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। প্রথমটি হলো মাওলানা আব্দুর রহমান জামির *বাহারিস্তান* (بہارستان)। আর দ্বিতীয়টি হলো মাজদুদ্দিন খানির *খাওয়ারিস্তান* (خوارستان) এবং তৃতীয়টি হলো হাবিব কাআনি শিরাজির *কিতাবে পারিশান* (کتاب پریشان)। যখন এ গ্রন্থগুলোকে গুলিস্তান (گلستان)-এর সাথে তুলনা করা হয়, তখন মনে হয় যে সুর্যের সাথে যেমন চাঁদ এবং মোমবাতির তুলনা চলে না তদ্রূপ গুলিস্তানের (گلستان) সামনে এ গ্রন্থগুলোর রঙ্গ বিবর্ণ মনে হয়।]

শেখ সাদির কবিতায় ফেরদৌসি ও হাকিম সানায়ির অনুসরণ

শেখ সাদি চিন্তা-চেতনা ও বর্ণনাভঙ্গিতে মহাকবি ফেরদৌসি ও হাকিম সনায়ির অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন এক কবিতায় ফেরদৌসি বলেন:

ز ناپاک زاده مدارید امید که جنگی بشستن نه گردد سفید

(আবুল কাসেম, ১৯৫৯: ৪০৬১)

[অপবিত্র সত্তা থেকে কোনো প্রত্যাশা করোনা। কারণ কালো বর্ণের কাওকে শত ধৌত করলেও সাদা হবেনা।] আর শেখ সাদি বলেন:

ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شستن از زنگی سیاهی

(শেখ সাদি, অনুল্লেখিত: ১৭০।)

[আমাকে যতই নিন্দা করোনা কেনো, আমার কালো বর্ণের মলিনত্ব কখনোই ধৌত হবেনা।] এ দুটো পঙ্‌ক্তিকে পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায়এয, শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) মহাকবি ফেরদৌসির শাহনামা অধ্যয়ন করতেন এবং তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন।

---

৪১. মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালি (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.)। আধুনিক উর্দু সাহিত্যের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পানিপথে জন্মগ্রহণ করেন। হায়াতে সাদি (حیات سعدی), হায়াতে জাভেদ (حیات جاوید) ও ইয়াদ গারে গালিব (یادگار غالب) তাঁর অন্যতম রচনা। তিনি ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথে মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, ২য় খণ্ড: ৮৬৩)

শেখ সাদির অনুকরণে কবি হাফিজ শিরাজি

শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) পরবর্তী কবিগণ শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.)কে অনুকরণ করেছেন। যেমন কবি হাফিজ শিরাজি নিজেই বলেন:

استاد سخن سعدی ست پیش ہمہ کس اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو

(শামসুদ্দিন, ১৯৯১: ১৮।)

[সকলের কবিগুরু হলেন শেখ সাদি, হাফিজের কবিতা সেই মহাত্মার অনুকরণমাত্র।]

বস্তুতুত শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.)-এর প্রশংসা পৃথিবীর সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই করে থাকেন। তিনি পৃথিবীময় সাহিত্যের যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন তা মূলত কালজয়ী। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য গতানুগতিক কোনো সাহিত্য ধারা নয়; বরং এটি শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.)-এর মতো দার্শনিক কবি-সাহিত্যিকদের পরশে পৃথিবীকে এক নতুন সাহিত্য-দ্বিগন্ত উপহার দিয়েছে। তাই বর্তমানকাল পর্যন্তও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিদ্যানুরাগীদের কাছে মহিয়ান হয়ে আছে। যারা সাহিত্য রসে আপ্লুত হতে চায়, তারা এ বিশাল সাহিত্যভান্ডারের সুধা পান করতে বাধ্য হন।

শেখ সাদি রচিত আরেকটি ফারসি গ্রন্থ

শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) রচিত *কারিমা* (کریما) নামে আরেকটি কাব্যগ্রন্থও কওমি মাদরাসার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ গ্রন্থটির একাধিক উর্দু অনুবাদ হয়েছে। হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম বড়কাটারা মাদরাসা বাংলাদেশ-এর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রশিদ এ গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ করেছেন। দানশীলতা, কৃপণতার প্রতি ভৎসনা, বিনয়-নম্রতা, অহংকার বর্জনসহ সুকোমল বৃত্তিগুলোর বিকাশ সাধনের বার্তা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) বলেন:

چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نگشت

ہمہ با ہواؤ ہوس ساختی دمے با مصالح نپر داختی

(সাদি, অনুল্লেখিত: ২)

আলোচ্য পঙক্তি দু'টির অনুবাদে মাওলানা আব্দুর রশিদ বলেন:

اے میری نفس! چالیس سال تیری پیاری عمر کا گزر گیا، تیرا مزاج لڑکپن کے حال سے نہ پھرا ہمیشہ خواہش نفسانی اور دیوانگی کے ساتھ موافقت کی تونے، کوئی دم بھلائیوں میں مشغول نہ ہوا تو۔

(রশিদ,১৩৯৭ হি.: ৪)

[হে আমার প্রবৃত্তি! চল্লিশ বছর তোমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তোমার শৈশবের চঞ্চলতা এখনো যায়নি। সবসময় নিজের ইচ্ছে মতো চলেছো। কখনো কল্যাণকর কাজে লিপ্ত হওনি।]

উর্দু কবিতায় শেখ সাদির প্রভাব

উর্দু ভাষী অনেক কবি-সাহিত্যিক শেখ সাদির কবিতা থেকে প্রভাব গ্রহণ করেছেন। মির হাসান (১৮৩৭-১৮৮৯ খ্রি.) কর্তৃক রচিত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মাসনাভি গ্রন্থ *সিহরুল বয়ান* (سحر البیان) এ কেবল শেখ সাদির *বুস্তান* (بوستان) ও *গুলিস্তান* (گلستان) এর অনুসরণই করা হয়নি; বরং কোথাও কোথাও উর্দু পঙক্তির ফাঁকে ফাঁকে *বুস্তান* (بوستان) ও *গুলিস্তান* (گلستان) -এর ফারসি পঙক্তি জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায় উর্দু ভাষায় রচিত মাসনাভিগুলোতে অতি মাত্রায় ফারসি ভাষার প্রভাব রয়েছে। যেমন শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) বলেন:

دریغا که فصل جوانی برفت به لهو و لعب زندگانی برفت

(সাদি, ১৩৭৫, সৌর : ১৭৬)

আলোচ্য পঙ্‌ক্তি দু'টির অনুকরণ করে মাসনাভি রচনাকারী মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *মাসনাভি সিহরুল বয়ানে* বলেন:

دریغا کہ عہد جوانی گذشت جوانی مگو زندگانی گذشت زہے بے تمیزی و بے حاصلی کہ از فکر دنیا و دین غافلی

(হাসান, ১৯৬৩ : ৩০-৩১)

[হায় আফসোস, যৌবনকাল চলে গেলো যৌবনকাল কেবল নয়, জীবনও চলে গোলো। কখনো শিষ্টাচারহীন এবং না পাওয়ার বেদনা নিয়ে, দুনিয়ায় মশগুল হয়ে এবং ধর্ম পালনে উদাসীন হয়ে।]

উর্দু কবিতায় মাওলানা রুমির প্রভাব

উপমহাদেশের কবি-সাহিত্যিকগণ যেসকল ফারসি কবিদের প্রভাব অধিকমাত্রায় গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩) অন্যতম। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি বলখ শহরে ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। উপনাম জালালুদ্দিন। পিতার নাম মুহাম্মদ বিন হুসাইন। পিতার উপাধি বাহাউদ্দিন। তবে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.) নামে অধিক প্রসিদ্ধ।

মাওলানা রুমি পিতার দিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর এবং মাতার দিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি-এর বংশধর। দুই রক্তধারাতেই তিনি ছিলেন এক স্বার্থক উত্তরসূরী। (রুহুল আমিন, ২০২০: ১১)

মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.)-এর দাদাও ছিলেন তৎকালীন একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও খ্যাতিমান অলি। কথিত আছে খোরাসানের বাদশাহ আলাউদ্দিন স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে স্বীয় কন্যাকে মাওলানা রুমির দাদার সাথে বিয়ে দেন। মাওলানা রুমির বাবাও ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলেম। এক সময় বাদশাহ খাওয়ারিজিম শাহের শ্যেনদৃষ্টিতে নিপতিত হলে তিনি বলখ ত্যাগ করে নিশাপুরের অলিয়ে কামিল ফারসি কবি শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের দরাবরে আসেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শেখ আত্তার মাওলানা রুমি (১২০৭-

১২৭১ খ্রি.)কে দেখে বলেন: 'এই বালক একদিন আল্লাহর প্রেমের অগ্নিশিখা সৃষ্টি করবে।' তাপর শেখ আত্তার ছয় বছরের বালক মাওলানা রুমিকে তার রচিত গ্রন্থ *আসরার নামা* (اسرار نامہ) উপহার দেন। (শিবলি, ১৯৬১: ১৪)

এ সফরে মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.) শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ারদির মতো অনেক মনীষীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। এরপর পিতার সাথে হজব্রত পালন করে সিরিয়ার লামাতিয়া ও লারেন্দ্র শহর এবং শেষ জীবন তিনি বর্তমান তুরস্কের কোনিয়াতে অতিবাহিত করেন।
মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.) কোনিয়াতে অবস্থানকালে ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত সুফি-সাধক শামসুদ্দিন তাবরিজ[৪২] (১১৮৫-১২৪৮ খ্রি.) সান্নিধ্যে আসলে তাঁর জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসে।

তিনি সুফিতত্ত্বের মূল বিষয়গুলো অনুধাবন করে বিখ্যাত গ্রন্থ *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) রচনা করেন। *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) ছাড়াও মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.)-এর আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। *দেওয়ানে শামস তাবরিজ* (دیوان شمس تبریز), *ফিহি মা ফিহি* (فیہ ما فیہ) (আরবি ভাষায় কিছু উপদেশ) ও *মাজালিসে সাবআ* (مجالس سبعۃ) (সাতটি ভাষণ সংকলন) তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম।

মাওলানা রুমি রচিত *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) সম্পর্কে কিছু কথা

মাসনাভিয়ে মানাভি (مثنوی معنوی)-এর মূল বক্তব্য হলো, মহান আল্লাহ এক। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। মানুষ কামনার বশবর্তী হওয়ার কারণে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে কামনাকে দূরীভূত করতে সক্ষম হলে মানুষ আল্লাহতে লীন হতে সক্ষম হবে। আল্লাহর গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারবে। আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহতে লীন হয়ে যাওয়া। আর আল্লাহতে লীন হতে হলে প্রয়োজন প্রেমের সাগরে অবগাহন করা। যে প্রেম সাগরে অবগাহন করে তুর পাহাড়ের মতো জড়বস্তুও জীবন পেয়ে ছিলো। এ জীবনই হলো প্রকৃত জীবন। এই প্রকৃত জীবনের সন্ধান দিতে গিয়ে মাওলানা রুমি বলেন:

جسم خاک از عشق بر افلاک شد　　کوہ در رقص آمد و چالاک شد

عشق جان طور آمد عاشقا　　طور مست و خر موسی صاعقا

(জালালুদ্দিন,১৩৭৩ সৌর.: ২৭)

---

৪২. শামস তাবরিজ (১১৮৫-১২৪৮ খ্রি.) বিখ্যাত একজন ইরানি সুফি ব্যক্তিত্ব। তিনি বিশ্ববিশ্রুত জ্ঞান তাপস জালালুদ্দিন রুমির পির বা মুরশিদ। পিতার নাম ইমাম আলাউদ্দিন। তিনিও একজন বিখ্যাত অলি ছিলেন। শামস তাবরিজ পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে আল্লাহর অলিদের সান্নিধ্যে এসে মারিফাতের চল্লিশটি স্তর নির্ধারণ করেন। এক পর্যায়ে মারিফাতের এ জ্ঞান অন্যকে জানাতে তিনি মরিয়া হয়ে উঠেন। অবশেষে স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যের খোঁজ পান। তিনি আলৌকিক নির্দেশে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির কাছে মারিফাতের জ্ঞান পৌঁছাতে স্বয়ং রুমির আবাসস্থল কোনিয়াতে আসেন এবং মাওলানা রুমিকে মারিফাতের জ্ঞানে অভিষিক্ত করেন। একপর্যায়ে কোনিয়ার জনগণ তাঁকে ভুল বুঝলে ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অন্তর্ধানে চলে যান। মাওলানা রুমি তাঁর মুরশিদের বিরহে *দেওয়ানে শামসে তাবরিজ* (دیوان شمس تبریز) শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। শামস তাবরিজের মারিফাতের আহরিত জ্ঞানের নির্যাস হলো রুমির *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) বা মাসনবি শরিফ। (তামীমদারী, ২০০৭: ৯৩)

আলোচ্য পঙক্তিদ্বয়ের উর্দু অনুবাদে মাওলানা আশরাফ আলি থানাভি বলেন :

خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچا، پہاڑ ناچنے لگا اور ہوشیار ہو گیا۔

اے عاشق! عشق طور کی جان بنا، طور مست بنا اور موسی بیہوش ہو کر گرے

(থানাভি, ১৪২৬হি.: ৪৪-৪৫)

[মাটির শরীর ভালোবাসার শক্তির জোরে আকাশে পৌঁছতে সক্ষম হয়। পাহাড় নেচে ওঠে এবং সচল হয়। হে প্রেমিক, ভালোবাসার জোরে তুর পাহাড় প্রাণবন্ত হয়ে যায় আর মুসা নবি বেহুশ হয়ে পড়ে যায়।]

মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত অনেক কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনার সারসংক্ষেপ তাঁর *মাসনাভি* (مثنوی) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক প্রচলিত ও অপ্রচলিত গল্পও বলেছেন তাঁর দর্শনকে সহজবোধ্য করার জন্য। গল্প বর্ণনা তাঁর মূল লক্ষ্য নয়; বরং উপলক্ষ্য মাত্র। তাই দেখা যায় তাঁর গল্প বলার ধারা একটানা নয়। কখনো একটি গল্পের অবতারণা করে আবার চলে গেছেন অন্য প্রসঙ্গে। আবার কখনো চলে গেছেন দর্শনতত্ত্ব বিশ্লেষণে কিংবা সুফি তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে। এ ভাবেই তাঁর গ্রন্থ *মাসনাভি* (مثنوی) গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে শরিয়ত এবং তরিকতকে এক করে দেখানো হয়েছে। তিনি শরিয়ত ও তরিকতের সেতুবন্ধন তৈরি করে সমস্ত কাজে মহান আল্লাহকে অনুভব করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। আর এ বিষয়টি অনুভব করাই হলো সুফি তত্ত্বের মূল বিষয়।

উর্দু ভাষায় রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) *মাসনাভি* (مثنوی)-এর একাধিক অনুবাদ রয়েছে। এক সময়ে রুমির (১২০৭-১২৭১ খ্রি.) *মাসনাভি* (مثنوی)-এর নির্বাচিত অংশ-বিশেষ উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উর্দু ভাষায় এর একাধিক ব্যাখ্যা গ্রন্থও ছিলো। আল্লামা শিবলি নোমানি স্বীয় গ্রন্থ *সাওয়ানেহে মওলানা রুম* (سوانح مولانا روم) -এ *মাসনাভি* (مثنوی) -এর ১৪ টি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। (শিবলি, ১৯৬১: ৬৫-৬৬) কাজি সাজ্জাদ হুসাইন *মাসনাভি* (مثنوی) এর ১৯ টি অনুবাদ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। (সাজ্জাদ, ১৯৬১: ১১) সবচেয়ে বৃহৎ ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন মাওলানা আশরাফ আলি থানাভি। তাঁর লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম *কিলিদে মাসনাভি* (کلید مثنوی)। ২৪ খণ্ডের প্রায় ২৬ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.)-এর সুফিদর্শনকে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। আলেমদের কাছে অনুবাদটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ ছাড়া কাজি সাজ্জাদ হুসাইন কর্তৃক রচিত ৬ খণ্ডের অনুবাদ গ্রন্থ *মাসনাভিয়ে মাওলাভিয়ে মানাভি* (مثنوی مولوی معنوی) নামে ১৯৭৮ সালে আজম প্রেস লাক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। এটি সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মাওলানা হাকিম আখতার কর্তৃক রচিত *মায়ারিফে মাসনাভি* (معارف مثنوی) নামে

আরেকটি অনুবাদ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এ অনুবাদে হাকিম আখতার নিজস্ব চিন্তা ধারার আলোকে রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.) কে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।[৪৩]

রুমির মাসনাভির উর্দু অনুবাদ

মাসনাভিয়ে মানাভি (مثنوی معنوی) এর সর্বপ্রথম উর্দু অনুবাদ করেন মুহাম্মদ ইউসুফ আলি শাহ। এটি ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূলত এ গ্রন্থটি হলো আপন পির ও মুরশিদ আব্দুর রহিম শাহ দরবেশের আক্ষরিক অনুবাদের ছন্দবদ্ধ অনুবাদ। এই ছন্দবদ্ধ অনুবাদটি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। তবে ছন্দবদ্ধ অনুবাদের কারণে অনেক স্থানে মূল লক্ষ্যের বিচ্যুতি ঘটেছে এবং অনুবাদে প্রাচীন উর্দুর প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। এর একটি কপি দিল্লি ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) এর আরেকটি উর্দু অনুবাদ হলো *বুস্তানে মারিফাত* (بوستان معرفت)। মৌলাভি আবদুল মাজিদ খান বিন আব্দুর রহমান কর্তৃক অনূদিত এ গ্রন্থটি ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে নভেল কিশোর প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত মৌলাভি আব্দুল আলি কর্তৃক বিরচিত *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی)-এর ফারসি ব্যাখ্যা গ্রন্থ *বাহরুল উলুম* (بحر العلوم) এর উর্দু অনুবাদ।

***মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) আঙ্গিকে রচিত উর্দু মাসনাভি**

উর্দু ভাষায় রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.)এর *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) অনুকরণে শাহ মোবারক আবরু (১৬৮৩-১৭৩৩ খ্রি.), শাহ জহিরুদ্দিন হাতেম (১৬৯৯-১৭৯১ খ্রি.), মির তাকি মির (১৭২৩-১৮১০ খ্রি.), মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.), গোলাম হামদানি মুসহাফি (১৭৫১-১৮২৪ খ্রি.), মুমিন খান মুমিন (১৮০০-১৮৫১ খ্রি.), মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) *মাসনাভি* আঙ্গিকের কবিতা রচনা করেছেন। আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)-এর ফারসি কাব্যগ্রন্থ *আসরারে খুদি* (اسرار خودی)সহ অসংখ্য উর্দু-ফারসি কবিতার পরতে পরতে রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.) রচিত *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) -এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এ সকল কবি-সাহিত্যিকদের বিরচিত মাসনাভির প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, উর্দু মাসনাভির উপর ফারসি মাসনাভির প্রভাব কত বেশি।

ফারসি কবি হাফিজ শিরাজি

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে যে সকল ফারসি কবি-সাহিত্যিকের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিদ্যমান তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজি (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)। কবি হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) ইরানের শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার কারণে তিনি হাফিজ নামে খ্যাতি লাভ করেন। কবি হাফিজ গোটা জীবন শিরাজে কাটিয়েছেন এবং সুফিতত্ত্বসহ নানা বিষয় সম্পর্কে কবিতা রচনা করেছেন।

---

৪৩. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যারয়ের অধ্যাপক ড. মাসুম গোলামি *মাসনাভি মানাভি কে উর্দু তারাজিম ও শুরুহ* (مثنوی معنوی کے اردو تراجم و شروح) শিরোনামে পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হাফিজের কবিতার মূল বক্তব্য

হাফিজের কাব্যগ্রন্থে মাসনাভি, কাসিদা ও রুবায়ি প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ থাকলেও মূলত হাফিজ একজন গজল (প্রেমসঙ্গীত) রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। গজল রচনায় হাফিজকে ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠপুরুষ বলা যায়। তিনি অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় সুফিতত্ত্ব বিষয়ক গজল রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতায় প্রেম, প্রেমাস্পদের অমলিন সৌন্দর্য, বসন্ত, গোলাপ, বুলবুল পাখির গান, মদ আর যৌবনের বর্ণনা অনুরণিত হয়েছে। তাঁর এ সকল কবিতায় ইশকে হাকিকি তথা আল্লাহর প্রকৃত প্রেমে লীন হয়ে যাওয়ার অপূর্ব কাহিনী বর্ণনা করাই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) বলেন: 'সুফিবাদ সর্বজনীন। এতে কোনো গোঁড়ামির স্থান নেই'। এ কারণে তাঁকে লিসানুল গায়েব (لسان الغائب) বলা হয়। ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি সম্পর্কে হাফিজ বলেন:

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بنہ　　چو ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

(হাফিজ, ১৩৭৬ সৌর.: ১৭৮)

[এ বাহাত্তর জাতের সাম্প্রদায়িকতাকে অপারগ মনে কর। কারণ তারা সত্যকে উপলব্ধি করেনি। তাই মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলছে।]

হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) উদারতার কথা বলেন। তিনি বলেন: 'শুদ্ধ প্রেম দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া যায়। এখানে কোনো চালাকির স্থান নেই। যে নিজেকে উৎসর্গ করে আল্লাহকে ভালোবাসে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, সেই আল্লাহর প্রেমাসক্ত হওয়ার উপযুক্ত'। (পাল, ১৯৫৪: ১২২)

হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) আরো বলেন:

آتش زہد و ریا خر من دی خواہد سوخت　　حافظ این خرقہ پیش مینہ بیند از وبرو

(পাল, ১৯৬২: ১২৯)

[ভণ্ড ও লৌকিকতার আগুন ধর্মের গোলাঘরকে পুড়িয়ে দেবে। হাফিজ এই দরবেশি পোষাক ছাড়ো এবং অগ্রসর হও।]

হাফিজের (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) কবিতায় ছন্দের ব্যবহার ছিলো সুনিপুণ। হাফিজ কেবল ভাষার কারণে নয়; বরং তাঁর কবিতায় প্রেয়সীকে পাওয়ার যে তাড়না, প্রেয়সীকে উপলব্ধি করার যে ব্যাকুলতা ও দর্শন রয়েছে তা উর্দু সাহিত্যকে আলোড়িত করেছে বহুকাল ধরে।

ড. সায়্যিদ আব্দুল্লাহ বলেন:

> اردو شاعری از بسکہ فارسی شاعری کی گود میں پلی ہے۔ اس لیے اردو شاعری کو فارسی شاعری کے حوالے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنا شاید مناسب ہو گا۔

[উর্দু কবিতা যেহেতু ফারসি কবিতার কোলে লালিত-পালিত হয়েছে, তাই উর্দু কবিতাকে ফারসি কবিতার আলোকে বোঝা এবং অন্যকে বোঝাতে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ বলে মনে হয়।] (আব্দুল্লাহ, ২০০৫: ১৯)

উর্দু কবিতা বুঝতে হলে ফারসি কাব্য সাহিত্য বিশেষ করে কবি ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.), মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭১ খ্রি.), শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) এবং হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) রচিত কবিতাসমগ্র অধ্যয়ন করতে হবে।

উর্দু কবিদের হাফিজের অনুসরণ

উর্দু ভাষার অনেক কবি-সাহিত্যিকই কবিতা রচনায় হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) কে অনুসরণ করেছেন এবং হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর ভাবশিষ্য ছিলেন। মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ও আল্লামা ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮খ্রি.) কাছে হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) ছিলেন পরম অনুকরণীয়। মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)-এর উর্দু *দেওয়ান* (*دیوان*) এবং আল্লামা ইকবালে (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) কবিতা গ্রন্থ *বাঙ্গেদারা* (*بانگ درا*) ও *পায়ামে মাশরিক* (*پیام مشرق*) গ্রন্থদ্বয়ের কয়েকটি কবিতা পাঠে মনে হয়, এ যেনো খাজা হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯খ্রি.)-এর কবিতার ভাবানুবাদ।

আল্লামা ইকবালের কবিতায় হাফিজের সমালোচনা

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) রচিত *আসরারে খুদি* (اسرار خودی) গ্রন্থের কয়েকটি কবিতার বাহ্যিক আলোচনায় খাজা হাফিজে (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর নিন্দা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)-এর কবি নজির আকবরাবাদির নিকট প্রেরিত এক চিঠিতে এর উত্তর দিয়েছেন। আল্লামা ইকবালের সে চিঠির মূল বক্তব্য হলো কবি হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)কে অনুধাবন করা দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর কবিতা উপলব্ধি করতে সক্ষম না হওয়ায় অনেকেই এর বিকৃত ব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়ে যান, যা মোটেই কাম্য নয়। (আব্দুশ শাকুর, ২০১৬: ২৫৫)

কথিত আছে যে, মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) তাঁর 'তন্জ ও মজাহ' (طنز و مزاح) রম্যকবিতা রচনায় কবি হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর ভাবশিষ্য ছিলেন। *দেওয়ানে গালিব* (*دیوان غالب*) পাঠ করলে মনে হয় গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) পারস্য কবি হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর সুরেই কথা বলেছেন। যেমন কবি হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) বলেন:

منکہ ملول کشتمی از نفس فرشتگان　　قال و مقال عالمے میکشم از برائے تو

(হাফিজ, ১৩৭৬ সৌর.: ২৩৩)

মনে হয় গালিব (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) যেনো এই কবিতারই ভাবানুবাদ তুলে ধরেছেন। কবি গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) স্বীয় উর্দু কবিতায় বলেন:

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

(গালিব, ১৯২২: ১১৭)

{আজ এ অপছন্দনীয় লাঞ্ছনার কেন শিকার হচ্ছি। ফেরেশতাদের নেতিবাচক মন্তব্যই কি তাহলে সঠিক হলো?।}

উর্দু ভাষায় দেওয়ানে হাফিজের অনুবাদ

উর্দু ভাষায় কবি হাফিজের *দেওয়ান* (دیوان)-এর একাধিক ব্যাখ্য ও অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *লিসানুল গাইব* (لسان الغیب)। অনুবাদক হলেন মির অলি উল্লাহ। অনুবাদটি ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কাশিরাম প্রেস, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদটির ভাষা সাবলীল ও প্রাঞ্জল। অনুবাদটি সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছিলো।

দেওয়ানে হাফিজের (دیوان حافظ)-এর আরেকটি অনুবাদ হলো *তরজমানুল গাইব* (ترجمان الغیب)। অনুবাদক হলেন মৌলাভি মুহাম্মদ ইহতেশামুদ্দিন। অনুবাদটি নিজামশাহি হায়দারাবাদ প্রকাশনা থেকে ১৩৫৭ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে। এ অনুবাদ গ্রন্থে অনুবাদক কবি হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) ফারসি পঙ্‌ক্তিমালা উল্লেখপূর্বক অনুবাদ করেছেন। এ অনূদিত গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে কবি হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর মূল ফারসি কবিতার সাথে পাঠকের এক রকমের ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যে কারণে অনুবাদটিও পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ ছাড়া *দেওয়ানে হাফিজ* (دیوان حافظ)-এর আংশিক উর্দু অনুবাদের সংখ্যা একশটিরও বেশি। (শিবলি, ১৩৩৯ হি.: ২১৫)

সাওয়ানেহে মাওলভিয়ে রোম (سوانح مولوی روم)-এ আল্লামা শিবলি নোমানি উল্লেখ করেন:

> عالم میں چار کتابیں جس قدر مقبول ہوئیں کوئی کتاب نہیں ہوئی، شاہنامہ، گلستان، مثنوی مولانا روم، دیوان حافظ، ان چاروں کتابوں کا موازنہ کیا جائے تو مقبولیت کے لحاظ سے مثنوی کو ترجیح ہوگی، مقبولیت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ علماء وفضلاء نے مثنوی کے ساتھ جس قدر اعتنا کی اور کسی کتاب کے ساتھ نہیں کی'۔

[ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চারটি গ্রন্থ বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং এই চারটি গ্রন্থ হলো *শাহনামা* (شاہنامہ), *গুলিস্তান* (گلستان) , *মাসনাভিয়ে মানাভি (مثنوی معنوی)* ও *দেওয়ানে হাফিজ* (دیوان حافظ)। এ চারটি গ্রন্থের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে রুমির *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) সবচেয়ে সমাদৃত গ্রন্থ বলে প্রধান্য পাবে। আর তা সমাদৃত হওয়ার একটি দলিল বা কারণ হলো আলেম ও শিক্ষিত মাওলানা রুমির *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) যেভাবে গ্রহণ করেছেন অন্যকোনো গ্রন্থকে সেভাবে গ্রহণ করেনি]। (শিবলি, ১৯৬১: ৫০)

উর্দু ভাষার সূচনাপর্ব থেকে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) পর্যন্ত অসংখ্য ফারসি কবিদের কাব্যগ্রন্থ উর্দু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কতিপয় ফারসি কাব্যগ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ড. ইউসুফ সেলিম চিশতিসহ অনেকেই মির তাকি মির (১৭২৪-১৮১০খ্রি.) থেকে শুরু করে মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ও আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) রচিত ফারসি কাব্যগ্রন্থগুলোর উর্দু ভাষায় ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করেছেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পরতে পরতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। এ প্রভাব উর্দু অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে আরো বিকশিত হয়েছে।

বস্তুত অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে অন্যভাষার মানুষের শিক্ষা, দর্শন, কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে উর্দু ভাষায় সমৃদ্ধি এসেছে। ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে উর্দু ভাষায় যতো অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে, অন্যকোনো ভাষায় তা হয়নি। ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল বলেন: ‘ দেশি-বিদেশি সকল ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়কগ্রন্থ উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।’ (পাল, ১৯৬২: ২)

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, উর্দু ভাষার অনুবাদ সাহিত্য ফারসি ভাষার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ফারসি ভাষার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত উর্দু অনুবাদসাহিত্য বর্তমানেও ফারসি ভাষা সাহিত্যের প্রভাব হতে একেবারে মুক্ত নয়। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল পরিমাণ শব্দ, জারবুল আমসাল তথা প্রবাদ-প্রবচন ও পরিভাষাসমূহ আজও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে সুশোভিত করে চলছে। উর্দু ভাষার দিল্লি ও লক্ষ্ণৌ ধারার কবি-সাহিত্যিকগণ নিজেদের রচনায় ফারসি ভাষা ব্যবহারের ধারাকে আকড়ে ধরে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছাড়া উর্দু ভাষা পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না।। এটি একটি ধ্রুব সত্য। এ সত্যকে সামনে নিয়েই উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রযাত্রা বিদ্যমান রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১ আবু মুহাম্মদ শরফুদ্দিন মুসলেহ উদ্দিন আব্দুল্লাহ শিরাজি শেখ সাদি (অনুল্লেখিত): *কারিমা*, আশরাফিয়া বুক ডিপু, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২. আবু মুহাম্মদ শরফুদ্দিন মুসলেহ উদ্দিন আব্দুল্লাহ শিরাজি শেখ সাদি (১৩৭৫ সৌ.): *গুলিস্তান*, ইনতেশারাতে খারিজিমি, তেহরান, ইরান।

৩. আবু সাঈদ নুরুদ্দিন (১৯৯৭)*: তারিখে আদবিয়্যাতে উর্দু*, মাগরিবি পাকিস্তান, উর্দু একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান।

৫ আবুল কাসেম ফেরদৌসি (১৩৭৪ সৌ.): *শাহনামায়ে ফেরদৌসি*, সংকলন ও সম্পাদনা, মাহদি কারিব ও মুহাম্মদ আলি বেহবুদি, ইনতিশারাতে তুস,তেহরান, ইরান।

৬ আব্দুল হক (১৯৭৬): *তরজমা ফন আওর রেওয়ায়েত*, সংকলক, ড. কামার রাইস, তাজ পাবলিকেশন হাউজ, জামে মসজিদ, দিল্লি, ভারত।

৭ আব্দুর রশিদ (১৩৯৭ হি.): *দুররে বাহায়ে কারিমা*, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা।

৮ আব্দুশ শাকুর আহসান (২০১৬): *ইকবাল কি ফারসি শাইরি কা তানকিদি জাইজা*, পাঞ্জানুব, পাঞ্জাব, পাকিস্তান।

৯ আমির খসরু (অনুল্লেখিত): *কিসাসায়ে চাহার দরবেশ*, ইনতিশারাতে আমির কারিব, তেহরান, ইরান।

১০ আলতাফ হুসাইন হালি (১৮৮৮): *হায়াতে সাদি*,মুজতোবায়ি প্রেস, লাহোর, পাকিস্তান।

১১ আশরাফ আলি থানাভি (১৪২৫ হি.): *কিলিদে মাসনাবি*, ইদারায়ে তালিফ আশরাফিয়া, চকফুওয়ারা, পাকিস্তান।

১২ উমর খৈয়াম (১৯৬৫): *আহওয়াল ওয়া রুবাইয়্যাত খৈয়াম*, শেখ গোলাম আলি পাবলিকেশন, লাহোর, পাকিস্তান।

১২ কাজি সাজ্জাদ হুসাইন (১৯৬১): *তরজমায়ে মাসনাভি মানাভি মৌলাভি*, হামেদ এণ্ড কোম্পানি, উর্দু বাজার, লাহোর, পাকিস্তান।

১৩ গিয়ান চান্দ জেইন (১৯৮৭): *উর্দু কি নসরি দাস্তান*, উত্তর প্রদেশ, উর্দু একাডেমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

১৪ জহির উদ্দিন (অনুল্লেখিত): *বাহারিস্তান*, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

১৫ জামিল জালিবি (২০০৫): *তারিখে আদবে উর্দু* (প্রথম খণ্ড), পাকিস্তান, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব।

১৬ জালালুদ্দিন রুমি (১৩৭৩ সৌ.): *মাসনাভিয়ে মানাভি*, ইরান, মুআসসিসায়ে ইনতিশারে নিগা, তেহরান, ইরান।

১৭ নাসির হুসাইন আজিমাবাদি (১৯৫৯): *দাস্তানে শাহনামা*, শাও বুকডিপু, চৌঘরা, পাটনা, ভারত।

১৮ মনির উদ্‌দীন ইউসুফ (১৯৬৮): *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯ মাহমুদ শিরানি (১৯৮৪): *দাকান মে উর্দু* , আলা প্রেস, দিল্লি, ভারত।

২০ মির অলি উল্লাহ (১৯২২): *লিসানুল গাইব* কাশিরাম প্রেস লাহোর, পাকিস্তান।

২১ মির আম্মান (১৭৭৭): *গাঞ্জে খুবি*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, দিল্লি, ভারত। [মূল : মোল্লা ওয়ায়েজ কাশিফি]

২২ মির হাসান দেহলভি (১৯২৮): *মাসনাভিযে সিহরুল বয়ান*, মাজালিসে তারাক্কি আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

২৩ মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (২০০৯): *দেওয়ানে গালিব*, ইতেকাত পাবলিকেশন্স হাউজ, দিল্লি, ভারত।

২৪ মুহাম্মদ আলি মির ইনশা (১৯৮৭): *জালিসুল মুস্তাক ভূমিকা* ইন্দোবির শেন সোসাইটি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

২৫ মুহাম্মদুল্লাহ (১৪৩২ হি.): *বাহারিস্তান*, আশরাফিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

২৬ মুহাম্মদ রিয়াজ (১৯৭৭): *ইকবাল আওর ফারসি শুআরা*, ইকবাল একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান।

২৭ রেজা জাদে শাফাক, (১৩৪১ সৌর.): *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, ইনতেশারাতে আমির কবির, তেহরান, ইরান।

২৮ রূহুল আমীন খান (২০২০): *কাব্যানুবাদ, মাসনবী শরীফ* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

২৯ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজি (১৩৭৬ সৌ.) : *দেওয়ানে হাফিজ*, মুআসসিসায়ে ফারহাঙ্গে ইরান।

৩০ শিবলি নোমানি (১৩৩৯হি.): *শেরুল আজম*, দারুল মুসান্নিফিন, শিবলি একাডেমি, মাআরিফ প্রেস, আজমগরা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৩১ শিবলি নোমানি (১৯৬১): *সাওয়ানেহে মৌলাভি রুম*, মাজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

৩২ সালিম আখতার (১৯৭১): *উর্দু আদব কি মুখতাসার তারিন তারিখ*, সাঙ্গমেইল পাবলিকেশন, লাহোর, পাকিস্তান।

৩৩ সুলতান জওক (অনুল্লেখিত): *কান্দখামা*, আশরাফিয়া বুক ডিপু, দেওবন্দ,ভারত।

৩৪ সৈয়দ আব্দুল্লাহ (২০০৫): *অলি সে ইকবাল তক*, চমন বুকডিপু, উর্দু বাজার, দিল্লি, ভারত।

৩৫ সৈয়দ আমির হুসাইন আবেদি (১৯৮৪): *হিন্দুস্তানি ফারসি আদব*,আলা প্রেস, দিল্লি, ভারত।

৩৪ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৯৬২): *উর্দু ভাষার ইতিহাস*, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৩৫ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৯৫৪): *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক অজিত চন্দ্র ঘোষ, কোলকাতা, ভারত।

৩৬ হাফিজ জালালুদ্দিন আহমদ জাফরি (১৯২২): *তরজামা রুবাইয়াতে হাকিম ওমর খৈয়াম*, আনোয়ার আহমদি ইলাহাবাদ প্রেস, ভারত।

চতুর্থ অধ্যায়

উর্দু কাব্যসাহিত্যে ফারসি কাব্যসাহিত্যের প্রভাব

প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আবেগ-অনুভূতি আছে। আবেগ-অনুভূতি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। আবেগ-অনুভূতির শৈল্পিক ও ছন্দময় প্রকাশের নাম কবিতা। ভাব-কল্পনা কবিতার মূল বিষয়। ছন্দ হলো কবিতার বাহ্যিক সৌন্দর্য। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) কবিতা প্রসঙ্গে বলেন:

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে! (ঠাকুর, ১৯৬৩: ১৭১)

উপমহাদেশের আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালার বহতান, ঝর্ণার কলতান, বাতাসের হিল্লোল, পাখির কলকাকলি সবকিছুই একজন কবির মনে শিহরণ জাগায়। বেলুচিস্তানের মরুভূমি আর কাশ্মিরের বরফ-শিলা ভারতীয়দের কবিসত্তাকে জাগিয়ে তোলে। রাজস্তানের কৃষ্ণ-ডাগর নয়না আর দিল্লির গৌর বর্ণা সিংহকটিদেশ বিশিষ্ট নারী, যে কাউকে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

যেহেতু আজকের সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'উর্দু মাসনাভি ধারার কবিতায় ফারসির প্রভাব'। তাই স্বভাবত কারণেই প্রারম্ভে ফারসি প্রভাবিত উর্দু কবিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (শাসনকাল, ১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)-এর শাসনামলে আলাউদ্দিন হাসান বাহমানি (১২৯১-১৩৫৮ খ্রি.) ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের গুলবার্গসহ কয়েকটি স্থান দখল করে নেন। এ দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। কারণ, দাক্ষিণাত্যের বাহমানি সাম্রাজ্যের অধিকাংশ সুলতান বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিশেষ করে এ অঞ্চলগুলোতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে অগ্রগণ্য করে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। বলা হয় উর্দু সাহিত্যের উন্নয়ন দিল্লি ও তার আশপাশের এলাকায় হলেও উর্দু সাহিত্যের সূচনা হয়েছিলো মূলত দক্ষিণ ভারতে।

যদিও তেরোশ খ্রিষ্টাব্দের পরে ভারতে উর্দু ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো; কিন্তু দিল্লি ও তার আশাপাশের এলাকার অধিবাসীগণ এর বহুকাল পূর্বেই উর্দুকে কথ্যভাষা হিসাবে ব্যবহার করে আসছিলো। তবে এই এলাকার অধিবাসীগণ উর্দু ভাষায় কোনো সাহিত্য বিনির্মাণে এগিয়ে এসেছে বলে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতে উর্দু ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ এলাকার অধিবাসীগণ সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করে। তাই বলা যায় যে, চৌদ্দশ শতাব্দীর সূচনাতেই দক্ষিণ ভারতে উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এ যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হলেন শেখ আইনুদ্দিন গাঞ্জুল ইল্‌ম (১৩০৬-১৩৯৪ খ্রি.)। যাঁকে উর্দু গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়ে থাকে।[৪৪]

৪৪. আইনুদ্দিন গাঞ্জুল ইল্‌ম ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সুফি-সাধকদের সাহচর্যে জ্ঞান অর্জনের পর ১৩৭১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে আসেন। বাহমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসান বাহমানি (১২৯১-১৩৫৮ খ্রি.)সহ চারজনের রাজ্য শাসন তিনি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। হরেন্দ্র চন্দ্র পাল তাঁকে উর্দু গদ্যসাহিত্যের জনক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭২

ফারসি কাব্য দ্বারা প্রভাবিত উর্দু কবিতার ক্রমবিকাশের ধারা

উর্দু কাব্যের সূচনা কখন হয়েছিলো তার দিন-তারিখ হিসাব করে বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে এ কথা অকপটে বলা যায় যে, উর্দু সাহিত্যের সূচনালগ্নে যাঁরা উর্দু কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ফারসি কাব্য রচনার মহানায়ক। উর্দু কাব্যচর্চার প্রাথমিক যুগের তিনটি কাল তথা বাহমানি (১৩৪৭-১৫২৫ খ্রি.), আদিল শাহি (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) ও কুতুব শাহি (১৫০৮-১৬৮৭ খ্রি.)-এর শাসনামলে উর্দু সাহিত্য ফারসি সাহিত্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত ছিলো। উর্দু কাব্যচর্চার সূচনাকালের কবিদের কাছে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্য অনুসরণের সুযোগ ছিলো না বললেই চলে। তখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য হয়তো উর্দু ভাষার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারতো; কিন্তু যাঁদের হাতে উর্দু কাব্যচর্চার বাগডোর ছিলো তাঁরা ছিলেন মূলত ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু উর্দু ভাষা যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হতো তবে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও কাব্যপ্রেমীরা কাব্যজগতের নতুন নতুন ভাবনা আর কল্পনার সুশোভিত কাব্যরস থেকে হয়তো বহুকাল বঞ্চিত থাকতো।

যুগভিত্তিক উর্দু কাব্যসাহিত্যে ফারসির প্রভাব

উর্দু কাব্যসাহিত্যে ফারসি ভাষার যে প্রভাব রয়েছে তাকে তিনটি যুগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন: ১. প্রাচীন যুগ, ২. মধ্যযুগ ও ৩. আধুনিক যুগ।

প্রাচীন যুগ

১৩৪৭ থেকে ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে প্রাচীন যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাচীন যুগে ভারতের প্রসিদ্ধ তিনটি সাম্রাজ্যে উর্দু ভাষার ব্যাপক অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধিত হয়। এ সাম্রাজ্যগুলো হলো যথাক্রমে বাহমানি (১৩৪৭-১৫২৫ খ্রি.), আদিল শাহি (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) ও কুতুব শাহি (১৫০৮-১৬৮৭ খ্রি.) সাম্রাজ্য।

বাহমানি শাসনামল ছিলো ১৩৪৭ থেকে ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। মূলত বাহমানি সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় মাহমুদ শাহ বাহমানি (১৪৮২-১৫১৭ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে। এ সময় রাজ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। অবশেষে ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে এ বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গোলকাণ্ডায় কুতুব শাহি, বিজাপুরে আদিল শাহি, আহমদ নগরে নিজাম শাহি, বেদারিতে বারিদ শাহি এবং বেরারিতে ইমাদ শাহির শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে ইমাদ শাহি, নিজাম শাহি এবং বারিদ শাহি কর্তৃক শাসিত অঞ্চলগুলো আদিল শাহি (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) দখল করে নেন। প্রায় দু'শো বছরের এ সময়কালকে উর্দু ভাষায় কাহিনী-নির্ভর মাসনাভি তথা দ্বিপদী কবিতা রচনার যুগ বলা হয়ে থাকে। (জাফরি, ১৯৪০: ১৯৪)

টি। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম হলো *আতইয়ারুল আবরার* (اطیار الابرار)। তিনি ফারসি ও দক্ষিণ ভারতীয় উর্দু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। (পাল, ১৯৬২: ৪৩)

মধ্যযুগ

মধ্যযুগ হলো উর্দু ভাষার প্রসিদ্ধ কবি অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ও তাঁর পরবর্তীকালের কবিদের যুগ। এটি মূলত গজল রচনার যুগ। এ যুগটি ১৬৮৭ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে ফারসি কাব্যের প্রায় সবকটি কাব্যরীতিই উর্দুকাব্যে অনুসৃত হয়েছে। (জালিবি, ১৯৭৭: ৬১)

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগ বলতে মূলত ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ ও এর পরবর্তী যুগকে বোঝায়। এ যুগে উর্দু গদ্য ও অনুবাদ সাহিত্যে ফারসির প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে অনেকে এ সময়টিকে ভারতীয় উর্দুভাষীদের জন্য চরম হতাশার যুগ বলে মনে করেন। বিশেষত ভারতবর্ষ যখন ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজদের দ্বারা পুরোপুরি পরাজিত হয় তখন ভারতীয় মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার মানসে উর্দুকাব্যে ফারসিকাব্যের ছন্দ ও ভাব অনুসরণ করাকে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করতেন। (জাফরি, ১৯৪০ : ১৯৫)

এ যুগে উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চার জন্য ফারসি ভাষা ও ছন্দশাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক ছিলো। এ সময় উর্দু সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রভাবও দেখা যায়। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফলে উর্দুভাষী প্রগতিশীল লেখক ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাবও ঘটে এ সময়ে। তাঁরা উর্দু সাহিত্যকে ফারসি ভাষার গণ্ডি থেকে বের করে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বিশ্বময় পরিচিত করার প্রয়াস চালায়। অপর দিকে এ কালের এক শ্রেণির লেখক উর্দু সাহিত্যকে ফারসির প্রভাবমুক্ত করলে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে মনে করে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে আরো বেশি অনুসরণ ও অনুকরণ করার জোর প্রয়াস চালায়। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব কেন্দ্রিক নতুন চেতনা ও গতি সঞ্চারিত হয়। ফলে ইংরেজি ও ফারসি এ দু'টি ধারার প্রভাব নিয়ে উর্দু সাহিত্যে নবযুগের সূচনা ঘটে। (জালিবি, ১৯৭৭: ৯৪)

উর্দুকাব্যে ফারসি কাব্যশৈলীর অনুসরণ

উর্দু কাব্যের প্রথাগত সংস্কার, শব্দমালা, ব্যাকরণগত নীতিমালা, অলংকার আর ছন্দরীতি এ সবই এসেছে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে। উর্দু ভাষার কবি সাহিত্যিকগণ ফারসি ভাষার কবি সাহিত্যিকদের অনুসরণ করেছেন দু'টি পদ্ধতিতে।

ড. আব্দুল হকের (মৃত্যু, ১৯৬৪ খ্রি.) বর্ণনা মতে 'উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্য ও ছন্দের প্রভাবকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত উর্দু কাব্যে হুবহু ফারসি ছন্দের অনুকরণ ও অনুসরণ। যেমন মাসনাভি (مثنوی), গজল (غزل) , কাসিদা (قصیدہ) ও রুবায়ি (رباعی)।

দ্বিতীয়ত ছন্দ নয়, কেবল ভাবের অনুসরণ-অনুকরণ। যেমন মারসিয়া[৪৫] (مرثیہ) , ওয়াসুখত[৪৬] (واسوخت) ও শাহরে আশুব[৪৭] (شہر آشوب) ।' (হক, ১৯৬১:২০)

শৈলী বিজ্ঞানের আলোকে ফারসি কাব্যশৈলীকে রচনার ধরন ও যুগ হিসেবে পাঁচটি যুগে ভাগ করা যায়।[৪৮] যথা (১) খোরাসানি রচনাশৈলী (سبک خراسانی), (২) ইরাকি রচনাশৈলী (سبک عراقی), (৩) ভারতীয় রচনাশৈলী (سبک هندی) , (৪) পুনঃপ্রতিষ্ঠা যুগের রচনাশৈলী (سبک باز گشت) ও (৫) আধুনিক যুগের রচনাশৈলী (سبک نو) ।

(১) খোরাসানি যুগের রচনাশৈলীর সময়কাল ৯০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে ফারসি ভাষা তার দেশীয় শৈলীতে আবর্তিত হয়েছে। এ সময় ফারসি ভাষায় আরবি শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.), শাহিদ বালখি (৯৯৬ খ্রি.), ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.), আনোয়ারি (১১৮৭ খ্রি.) খাকানি (১১৯৮ খ্রি.) ও নিজামি গাঞ্জাভি (১২০৩ খ্রি.) এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের কবি কুলি কুতুব শাহ (১৪৬৫-১৫১০ খ্রি.), নুসরাতি (মৃত্যু, ১৬৮৩ খ্রি.) ও গাওয়াসি (মৃত্যু ১৬৫৬ খ্রি.) সাবকে খোরাসানি বা খোরাসানি রচনাশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। (হক, ১৯৬২: ৬৫)

(২) ইরাকি রচনাশৈলীর সময়কাল ১২০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময় ফারসি ভাষায় বিপুল পরিমাণ তুর্কি, মোঙ্গলীয়, আরবি শব্দ ও ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ যুগটি চরম হতাশার যুগ। ফারসিভাষী বহু কবি-সাহিত্যিক তাতারদের আক্রমণ আর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে এ সময় উপমহাদেশে পাড়ি জমান।

সানায়ি (মৃত্যু,১১৪০ খ্রি.), ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.), মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) ও হাফেজ শিরাজি (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি। উর্দু সাহিত্যের মহান কবি আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.), সাআদাত ঈয়ার খান রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.)সহ বহু কবি সাবকে ইরাকি বা ইরাকি রচনাশৈলী দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলেন। (শামিম, ২০১২: ৩৫৬)

(৩) ভারতীয় রচনাশৈলীর যুগটি ১৫০০ থেকে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের ফারসি ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো এ সময় ফারসি সাহিত্যে ধর্মতত্ব, ভ্রমণ কাহিনী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি, ভারত

---

৪৫. প্রচলিত অর্থে কোনো মৃতব্যক্তির বীরত্বগাথা নিয়ে কাব্য রচনাকে 'মারসিয়া' বলে। (তামীমদারী, ২০০৭: ৯৯)

৪৬. প্রেমিক প্রেমিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে উভয়ের মাঝে যে বিরহ ও জ্বালা তৈরি হয়, তাকে 'ওয়াসুখ্ত' বলে। (তামীমদারী, ২০০৭: ৯৯)

৪৭. প্রেমিকার সৌন্দর্যে গোটা শহরে প্রেমিকদের দগ্ধীভূত হওয়ার যে ভাব তৈরি হয়, তাকে 'শাহরে আশুব' বলে। (তামীমদারী, ২০০৭: ৯৯)

৪৮. ড. আহমাদ তামীমদারী এ শৈলীকে আট ভাগে বিভাজন করেছেন। যথা (১) খোরাসানি রচনাশৈলী, (২) সালজুকি রচনাশৈলী, (৩) ইরাকি রচনাশৈলী, (৪) মধ্যবর্তী সাহিত্যরীতি, (৫) ভারতীয় রচনাশৈলী, (৬) পুনঃপ্রতিষ্ঠা যুগের রচনাশৈলী, (৭) মাশরুতে ও মধ্যবর্তী যুগের রচনাশৈলী ও (৮) আধুনিক যুগের রচনাশৈলী। (তামীমদারী, ২০০৭: ৭৩)

ও ইরানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, ভারতের রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা, অধ্যাত্মবাদ ও দর্শনের আলোচনা বেশি হয়েছে। এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন তালিব আমুলি (মৃত্যু, ১৬২৬ খ্রি.), কালিম কাশানি (মৃত্যু, ১৬৫০ খ্রি.), সায়েব তাবরিজি (১৬৬৯ খ্রি.) ও আবদুল কাদের বেদিল (মৃত্যু, ১৭২০ খ্রি.) প্রমুখ।

উর্দু সাহিত্যের প্রাচীন কবি বাবায়ে আদম অলি (১৬৮৬-১৭৪৪ খ্রি.), সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি), মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.), মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)সহ অধিকাংশ কবি এ রচনাশৈলীর বেশি অনুসরণ করেছেন। এ যুগে উর্দু সাহিত্য ফারসি সাহিত্য দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলো। এ সময়ের উর্দু সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো ইস্তিখদাম বা বিভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার, ইহাম বা দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য, তামসিল বা প্রতীকাশ্রয়ী বক্তব্য ও তালমিহ ইঙ্গিতসূচক বাক্য ব্যবহার ইত্যাদি।

(৪) ১৮৩৭ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের রচনাশৈলীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ বলা হয়ে থাকে। (৫) ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ফারসি সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা। এ সময় উর্দু সাহিত্য ফারসির তুলনায় ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। (শামিম, ২০১২: ৩৫৭)

উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্যের প্রভাবের কারণ

উর্দু ভাষার বিকাশে কবিদের যথাক্রমে সংস্কৃত, হিন্দি ও ফারসি ভাষা থেকে প্রভাব গ্রহণের সুযোগ ছিলো। কিন্তু উর্দু ভাষার অধিকাংশ কবি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না। এ ছাড়া হিন্দি ভাষার সাহিত্য তখনো ব্যাপকতর হয়ে উঠে নি। তাই সাহিত্য ও দর্শনের ভাষা হিসাবে ফারসি ভাষাই ছিলো তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। তৎকালে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য ছিলো শিল্প-সাহিত্য ও ভাব-দর্শনের ভাষা হিসাবে পৃথিবীময় সমাদৃত। উপমহাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে কবি ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.), শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.), আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) ও হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) প্রমুখ ছিলেন অতি পরিচিত নাম। তাঁদের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মগুলো স্বাভাবিক কারণে উর্দু ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পরতে পরতে বিশ্লেষিত চরিত্র গঠন, প্রজ্ঞা, সুফিতত্ত্ব ও দর্শনের আবেশে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনায় এ উপমহাদেশের শাসকশ্রেণি অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের রাজদরবারগুলোতে ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের অধিক যাতায়াত ছিলো। তাই উর্দু ভাষার কবি-সাহিত্যিকগণ ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে নিজেদের মাতৃভাষা উর্দুর সমৃদ্ধির জন্য পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে নেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাসিরুদ্দিন হাশিমি (মৃত্যু, ১৯৬৪ খ্রি.) বলেন:

> دکن میں جب بہمنی سلطنت (۱۳۴۷ء) میں قائم ہوئی تو اس وقت فارسی شاعری ترقی کے سب مدارج طے کر لیے تھے۔ اس تاریخی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس اسلامی سوسائٹی نے ہندوستان اور دکن میں نشو و نما پائی۔ اسکا اصلی سرچشمہ ہندوستان سے باہر وسط ایشیا اور ایران میں واقع تھا۔اور یہ بہمنی، عادل شاہی اور قطب شاہی زمانہ کی تاریخ ادبیات سے مربوط ہیں، اس لحاظ سے جب دکنی

ارباب ادب نے فکر و تخیل کو الفاظ کا جامہ پہنانا چاہا۔ تو ان کے سامنے فارسی شاعری کا پیکرموزون موجودتھا۔ دکنی شاعروں نے بھی فارسی مثنوی، فارسی قصیدہ اور فارسی غزل کا چربہ اتارنا شروع کردیا۔

(হাশিমি, ১৯৩৯: ১০৯-১১০)

> [দক্ষিণ ভারতে যখন বাহমানি সাম্রাজ্য (১৩৪৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো তখন ফারসি কাব্য উন্নতির সবকটি স্তর অতিক্রম করেছিলো। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, ভারতবর্ষে তথা দক্ষিণ ভারতে যে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করেছিলো তার মূলে ছিলো ভারতের বাহিরে মধ্য-এশিয়া ও ইরানি সোসাইটি বা সমাজ। বাহমানি (১৩৪৭-১৫২৫ খ্রি.), আদিল শাহি (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) ও কুতুব শাহি (১৫০৮-১৬৮৭ খ্রি.)-এর যুগের সাহিত্য ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের অধিকাংশ সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু ছিলো ইরান ও মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস সম্পর্কিত। এদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে কবিসাহিত্যিকগণ যখন নিজেদের ভাবনাগুলোকে শব্দমালা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন তখন তাঁদের হাতের কাছে ছিলো ফারসি কাব্যরীতি ও ছন্দশাস্ত্র। ফলে ফারসি মাসনাভি, কাসিদা ও গজল থেকে আহরিত উপাদানগুলো নিয়ে তাঁরা সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন।]

এটি বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফারসি-কাব্য ও এর ছন্দশাস্ত্রীয় অনেক নিয়ম-কানুন হুবহু উর্দু কাব্যে ব্যবহৃত হতে থাকে।

উর্দু কবিতায় ফারসি কবিতার নানামুখী প্রভাব

কাব্যশৈলী বিজ্ঞান পর্যালোচনা করলে উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্যের নানা ধরণের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রভাবগুলোকে শব্দগত, ভাবগত, উপাদানগত, বৈশিষ্ট্যগত, চিন্তাগত, ধর্মীয়, শৈলীগত, বিষয়বস্তুগত, প্রেম ও প্রণয় সংক্রান্ত প্রভাব বলে বিবেচনা করা যায়।

ড. ফারহাত শামিম বলেন: 'উর্দু ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রায় তিরিশ শতাংশ'। উর্দু কাব্যের আলোচ্য বিষয়, বর্ণনার ঢং, ভাবনা ও দর্শন, অলংকার ও ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যের ব্যবহার, প্রবাদ-প্রবচন, বিভিন্ন পরিভাষা ও অনুপ্রাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও উদাহরণ প্রয়োগ এ সব কিছুই ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রাম বাবু সাক্সেনা[৪৯] বলেন:

اردو شاعری پر بھی فارسی کا بڑا اثر پڑا اور وہ بھی فارسی کے قدم بقدم چلنے لگی۔ فارسی بحریں استعمال ہونے لگیں

৪৯. রামবাবু সাক্সেনা। জন্ম ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাক্সেন নামক স্থানে। *History of Urdu Literature* নামে ইংরেজি ভাষায় উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনা করে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, খণ্ড, ২: ২৫৬)

ان کے علاوہ مضامین، طرز بیان، تخیل، تلمیحات، خاص خاص محاورے اور مثلیں یہ سب کچھ فارسی زبان سے لیاگیا۔

(সাক্সেনা, ১৯৪০: ৩-৪)

[উর্দু কবিতার উপরও ফারসির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এক পর্যায়ে উর্দু ভাষা ফারসি ভাষার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে শুরু করে। ফারসি বাহার তথা ছন্দরীতি ব্যবহৃত হতে থাকে। তা ছাড়া মূল বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য, বর্ণনাভঙ্গি, ভাবনা, ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যালংকার, বিশেষ বিশেষ পরিভাষা ও উদাহরণ বর্ণনা ইত্যাদি সকল কিছুই ফারসি থেকে গৃহীত হয়েছে।]

এ ছাড়া ফারসি কাব্যে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ হুবহু উর্দু কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে ড. আব্দুল হক বলেন:

> شعرائے فارسی نے یوسف زلیخا، لیلی و مجنون، شیرین و فرہاد، طور و موسی، بلقس و ہدہد، خاتم سلیمان، آتش خلیل، رستم و سہراب، آئینۂ سکندر، دم عیسی، عصائے موسی، صبر ایوب، دیدۂ یعقوب وغیرہ ہزاروں تلمیحوں سے اپنی نظم کو مزین کیا تھا۔ اس دور کے شعرائے اردو شاید نظم کی آرایش و زبائش کے لیے اکثر انہیں زیوروں کا استعمال کیا ہے۔

(হক, ১৯৬২: ৯৬-৯৭)

[ফারসিভাষী কবিগণ ইউসুফ-জুলেখা, লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, তুর পাহাড় ও মুসা নবি, রানি বিলকিস ও হুদহুদ পাখি, নবি সুলাইমানের আংটি, নবি ইব্রাহিম ও তাঁর আগুন সংক্রান্ত ঘটনাবলি, রুস্তম ও সোহরাব, সিকান্দারের আয়না, নবি ঈসার ফুৎকার, মুসা নবির লাঠি, আইয়ুব নবির সবর, ইয়াকুব নবির স্বপ্ন ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনার দ্বারা নিজেদের কাব্যজগৎকে আলোকিত করেছেন। কবিতা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য উর্দু কবিগণও এসকল অলংকার ব্যবহার করেছেন।]

উর্দু কাব্যে ফারসি ছন্দ ও ভাবগত প্রভাব

উর্দু কাব্যসাহিত্য ফারসি কাব্যরীতির অনুসরণে পরিপুষ্ট ও নন্দিত হয়েছে। এ অনুসরণের কথা উর্দু সাহিত্যের কবিগণ অকপটে স্বীকারও করে গেছেন। উর্দু সাহিত্যের প্রথম যুগের কবি শেখ ওয়াজিহুদ্দিন ওয়াজদি (মৃত্যু.১১৩৮ হি.) তাঁর *পাঞ্ছি বাছা* (پنچھی باچھا) নামক কাব্যগ্রন্থে এ কথা স্বীকার করে বলেন:

شیخ صاحب دل فرید نامور خاص جن کا ہے لقب عطار کر

تھا ولے جو فارسی میں یو کلام کم سمجھ سکتے تھے اس کو خاص و عام

قصد کر دکنی زبان میں لیکے آؤں تا رہے دنیا میں میرا بھی ناؤں

(হক, ১৯৬১: ৪০)

[শেখ ফরিদ নামে প্রসিদ্ধ একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন।
যাঁর বিশেষ উপাধি ছিলো আত্তার।
তাঁর (হৃদয় নিংড়ানো) যে বাণীগুলো ফারসি ভাষায় ছিলো,
তা সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ কম বুঝতেন।
সে কারণে দক্ষিণ ভারতের উর্দু ভাষায় তা অনুবাদ করলাম।
যেনো এ পৃথিবীতে আমার নামও বেঁচে থাকে।][৫০]

উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্যের উপাদানগত প্রভাব

উর্দু কাব্যে ফারসি কাব্যের উপাদানগত প্রভাব বিদ্যমান। এ সম্পর্কে মোল্লা ওয়াজ্‌হি[৫১] (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.)-এর একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওয়াজ্‌হি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) বলেন:

مہابت کے سامان میں جم جم ہے جیوں شجاعت کے کامان میں رستم ہے جیوں
انگوٹھی سلیمان کی تجھ ہات میں کہ تاثیر عیسی کی تجھ بات میں

(ওয়াজ্‌হি, ১৯৩৮:২৪)

[শ্রেষ্ঠত্বের উপকরণে জমজমের মতো সুধা পান করে জীবন ধারণ করো। বীরত্বের কামানে রুস্তমের প্রেরণা নিয়ে জীবন বাজি রাখো। তোমার হাতে নবি সুলাইমানের যুদ্ধ জয়ের আংটি আছে। আর নবি ঈসার কথার মতো তোমার কথায় প্রভাব আছে।]

মোল্লা ওয়াজহির (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) আলোচ্য উর্দু কাব্যে উল্লিখিত জমজম, বিখ্যাত বীর রুস্তম, নবি সুলাইমানের আংটি ও ঈসা (আ.)-এর কথার প্রভাব ইত্যাদি উপাদানগুলো ফারসি সাহিত্য থেকে গৃহীত। উর্দু কাব্যচর্চায় সর্বপ্রথম ফারসি কাব্যরীতির কোন্ ছন্দ অনুসৃত হয়েছিলো তা নিয়ে ব্যাপক মতানৈক্য আছে। তবে *দাকান মে উর্দু* গ্রন্থের লেখক নাসিরুদ্দিন হাশিমি (মৃত্যু,১৯৬৪ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন, 'উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চার সূচনা হয়েছিলো ফারসি মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা অনুসরণের মাধ্যমে।' (হাশিমি, ২০০২: ২২)

---

৫০. *পাঞ্ছি বাছা* (پنچھی باچھا) কাব্যগ্রন্থটি মূলত ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) বিরচিত *মান্‌তেকুত তায়ের* (منطق الطیر)-এর উর্দু অনুবাদ। *মান্‌তেকুত তায়ের* (منطق الطیر) সুফিতত্ত্ব বিষয়ক একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। (পাল, ১৯৬২: ৪৯)

৫১. মোল্লা ওয়াজহির পুরো নাম হলো মোল্লা আসাদুল্লাহ ওয়াজহি। তিনি ছিলেন উর্দু ও ফারসি ভাষার একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ কুলি কুতুবশাহের (১৫৬৫- ১৬১১ খ্রি.) যুগে তিনি একজন খ্যাতিমান সভাকবি ছিলেন। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নাকভি, ২০০৪: ৩৮)

মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মাসনাভি (مثنوی) আরবি শব্দ। অর্থ দুই-দুই। মাসনাভি হলো দ্বিপদী ছন্দের এমন কবিতা যার মাধ্যমে বিস্তারিত কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয়। যেমন গদ্যে উপন্যাসের মাধ্যমে বিস্তারিত কোনো ঘটনার বর্ণনা উল্লেখ থাকে।

মাসনাভি মূলত কাহিনীকাব্য। উর্দু ভাষায় মাসনাভি ছন্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিলো ফারসি মাসনাভি ছন্দের অনুসরণে। কারণ, মাসনাভি হলো এমন ছন্দ, যেখানে স্বাধীনভাবে কাব্যচর্চা করা যায়। এতে অন্ত্যমিলের বাধ্যবাদকতা নেই এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর ইতিটানা আবশ্যক নয়। মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা সম্পর্কে আধুনিক উর্দু সাহিত্যের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম আল্লামা শিবলি নোমানি[৫২] (১৮৫৭- ১৯১৪ খ্রি.) বলেন:

> فارسی میں تاریخی نظمیں کثرت سے ہیں، عربی میں ایک بھی نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات مثنوی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے اور عربی میں مثنوی سرے سے نہیں۔

(নোমানি, ১৯৪০, খণ্ড ৪: ২২৬-২২৭)

> [ফারসি সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উপর নির্ভর করে অধিক কাব্যচর্চা হয়েছে। পক্ষান্তরে আরবি সাহিত্যে এমন কাব্যচর্চার নমুনা একটিও নেই। এর যৌক্তিক কারণ হলো, ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উপর নির্ভর করে কাব্যচর্চা মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা ছাড়া হয়ে উঠে না। আরবি ভাষায় মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যচর্চা একেবারেই নেই।]

সম্রাট নসর বিন আহমদ সামানি (৯১৩-৯৪২ খ্রি.)-এর অনুরোধে কবি আবু আব্দুল্লাহ জাফর বিন মুহাম্মদ রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.) সংস্কৃত ভাষায় রচিত *কালিলা ওয়া দিমনা* (کلیله ودمنه) গ্রন্থটিকে কাব্যাকারে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদে কবি মাসনাভি ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। এর পূর্বে ইরানে মাসনাভি ছন্দের প্রচলন থাকলেও কবি রুদাকির (৯০০-৯৪০ খ্রি.) মাধ্যমে ইরানে মাসনাভি ছন্দ ব্যবহারের আবহ সৃষ্টি হয়। ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইরানে মাসনাভি ছন্দ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মাসনাভি ছন্দের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আল্লামা শিবলি নোমানি (১৮৫৭-১৯১৪ খ্রি.) বলেন:

---

৫২. আল্লামা শিবলি নোমানি ছিলেন ভারতবর্ষের একজন কবি, দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা, প্রাবন্ধিক, জীবনীকার, সাহিত্য সমালোচক, বাগ্মী এবং ইসলামি পণ্ডিত। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশ আজমগরে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু ভাষায় আধুনিক ইতিহাস রচনার ধারা তৈরি করেন। তাঁকে উর্দু সাহিত্যের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম এবং উর্দু সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক সমালোচক মনে করা হয়। তিনি দেওবন্দি ধারার আলেম ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে 'শামসুল উলামা' বা আলেমদের ভাস্বর উপাধি প্রদান করে। শেরুল আজম (شعر العجم), আল ফারুক (الفاروق) ও সীরাতুন্নাবি (سیرۃ النبی) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (রব্বানী, ২০১৪: ২৯১)

رودکی کے بعد اکثر شعرا نے مثنویاں لکھیں اور فردوسی سے پہلے مثنویوں کا ایک بڑا ذخیرہ تیار ہوگیا

(নোমানি, ১৯৪০, খণ্ড ৪: ২৫০)

> [কবি রুদাকির পর ইরানের অধিকাংশ কবি মাসনাভি ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন এবং কবি ফেরদৌসির আগমনের পূর্বেই মাসনাভি ধারার রচনার এক ভাণ্ডার ফারসি ভাষায় তৈরি হয়ে যায়।]

উর্দু ভাষার সাহিত্য কাঠামো তৈরির বহু পূর্বেই ফারসি ভাষায় ঐতিহাসিক যুদ্ধ, প্রেম-ভালোবাসা, প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা, উত্তম চরিত্র, গল্প, সুফিতত্ত্ব ও দর্শন নির্ভর বহু মাসনাভি ধারার কবিতা রচিত হয়েছিলো। উর্দু কবিগণ ফারসি মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতার প্রজ্ঞাপূর্ণ উপাদান আহরণ করে উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বিপুলভাবে।

উর্দু ভাষায় প্রথম মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থ

উর্দু ভাষায় প্রথম মাসনাভি রচিত হয় দক্ষিণ ভারতে। ফখরুদ্দিন নিজামি *কদম রাও পাদাম রাও* (قدم راؤ پدم راؤ) নামে একটি মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এ মাসনাভি গ্রন্থটি আনুমানিক ১৪২১ থেকে ১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালের মধ্যে রচিত। ফখরুদ্দিন নিজামির জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। কেবল এতটুকু বলা যায় যে, এ গ্রন্থটি বাহমানি সাম্রাজ্যের নবম বাদশাহ আহমদ শাহ ফরাজ (শাসনামল ১৪২২-১৪৩৬খ্রি.)-এর অনুরোধে লেখা হয়েছিলো। আহমদ শাহর মূল নাম হলো আহমদ শাহ নিজাম। এ কারণে কবি ফখরুদ্দিন তাঁর নামের সাথে নিজামি যুক্ত করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

এ গ্রন্থটিতে দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে স্মর্তব্য যে, এতে আলোচিত সবগুলো গল্পের শিরোনাম ফারসি ভাষায় রচিত। ড. জামিল জালিবি (মৃত্যু ১৯৮৪ খ্রি.) ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে সহজ উর্দু ভাষায় প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, এ মাসনাভি গ্রন্থটি একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। ড. জামিল জালিবি (মৃত্যু, ১৯৮৪) সম্পাদিত গ্রন্থটিতে ১০৩৩ টি পঙ্‌ক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কুতুবশাহি যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি হলেন মোল্লা গাওয়াসি[৫৩] (মৃত্যু, ১৬৫৬ খ্রি.)। তিনি সুলতান আব্দুল্লাহ কুতুবশাহ (১৬১৪-১৬৭২ খ্রি.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। ফারসি মাসনাভি ছন্দ অনুসরণে তিনি উর্দু ভাষায় দু'টি মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

---

৫৩. মোল্লা গাওয়াসির (মৃত্যু, ১৬৫৬ খ্রি.) জীবনী সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে রাম বাবু সাক্সেনা *হিস্ট্রি অব উর্দু লিটারেচার* নামক গ্রন্থে মির হাসানের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন:

غواصی تخلص در وقت جہانگیر بود ۔ طوطی نامہ بخشی را نظم نمودہ است، بزبان قدیم نصفی فارسی نصفی هندی دیده بودم۔

[তিনি বাদশা জাহাঙ্গিরের শাসনামলে 'গাওয়াসি' উপনামটি গ্রহণ করেছেন। গাওয়াসি জিয়াউদ্দিন বখশি রচিত ফারসি *তুতি নামে* (طوطی نامہ) -এর কাব্যানুবাদ করেন। আমি এ গ্রন্থটি দেখেছি। তিনি ফারসি প্রাচীনরীতি অবলম্বন করে অর্ধেক গ্রন্থ ফারসি ভাষায় আর অর্ধেক হিন্দি তথা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন।] (সাক্সেনা, ১৯৫২: ৬০)

এদের মধ্যে প্রথমটি হলো *ফাসানায়ে সাইফুল মুলুক ওয়া বদিউল জামাল* (فسانہ سیف الملوک و بدیع الجمال)। আর দ্বিতীয়টি হলো *তুতি নামা* (طوطی نامہ)। *ফাসানায়ে সাইফুল মুলুক ওয়া বদিউল জামাল* (فسانہ سیف الملوک و بدیع الجمال) গ্রন্থটি মূলত মিসরের যুবরাজ সাইফুল মুলুক ও চীন দেশের শাহজাদি বদিউল জামাল-এর প্রেমকাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটি ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। মোল্লা গাওয়াসি (মৃত্যু, ১৬৫৬ খ্রি.) রচিত *তুতি নামা* (طوطی نامہ) মাসনাভি ধারার কাব্যগ্রন্থটি মূলত জিয়া উদ্দিন বখশি রচিত ফারসি *তুতি নামে* (طوطی نامہ)-এর কাব্যানুবাদ। এটি ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মাসনাভি ধারার কবিতার ছন্দ প্রকরণ

তারিখে মাসনাভিয়্যাতে উর্দু (تاریخ مثنویات اردو) গ্রন্থের লেখক মৌলাভি হাফেজ জালালুদ্দিন জাফরির (মৃত্যু. ১৯২২ খ্রি.) মতে মাসনাভি ধারার কবিতা রচনার জন্য অনেকগুলো ছন্দ ফারসি ও উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হলেও এর প্রচলিত ছন্দ মোট সাতটি। নিম্নে মাসনাভি ধারার কবিতার জন্য প্রচলিত সাতটি ছন্দ উল্লেখ করা হলো।

১. বাহরে সারি মুসাদ্দাসে মুতাওয়া মাওকুফ (*بحر سریع مسدس مطوی موقوف*)-এর জন্য ব্যবহৃত ছন্দ হলো:

مفتعلن مفتعلن فاعلات

মুফতাইলান মুফতাইলান ফায়েলাত।

২. বাহরে খাফিফে মুসাদ্দাসে মাকতু (*بحر خفیف مسدس مقطوع*)-এর জন্য ব্যবহৃত ছন্দ হলো:

فاعلاتن مفاعلن فعلن

ফায়েলাতুন মাফাইলান ফাউলান।

৩. বাহরে হাজাযে মুসাদ্দাসে আখরাব মাহজুফ (*بحر ہزج مسدس اخرب محذوف*)-এর জন্য ব্যবহৃত ছন্দ হলো:

مفعول مفاعلن فعولن

মাফউল মাফাইলান ফাউলান।

৪. বাহরে হাজাযে মুসাদ্দাসে মাহজুফ (*بحر ہزج مسدس محذوف*) -এর জন্য ব্যবহৃত ছন্দ হলো:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

মাফাঈলান মাফাঈলান ফাউলান।

৫. বাহরে রামালে মুসাদ্দাসে মাকসুর ইয়া মাহজুফ (*بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف*)-এর জন্য ব্যবহৃত ছন্দ হলো:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن یا فاعلات

ফাইলাতুন ফাইলাতুন ফাইলান ইয়া ফাইলাত।

৬. বাহরে মুতাকারেব মুসাম্মান মাকসুর ইয়া মাহজুফ (بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف)-এর জন্য ব্যবহৃত ছন্দ হলো:

فعولن فعولن فعولن فعل یا فعول

ফাউলান ফাউলান ফাউলান ফাআল ইয়া ফাউল

৭. বাহরে মুতাকারেব আসরাম মাকবুজ মুকাব্বাহ (بحر متقارب اثرم مقبوض مقبح)-এর জন্য ব্যবহৃত ছন্দ হলো

فاع فعولن فعولن فاع یا فعولن فعولن فعولن فاع

ফা ফাউলান ফাউলান ফা ইয়া ফাউলান ফাউলান ফাউলান ফা। (জাফরি, অনু: ২৯,৩০)

বিষয় বৈচিত্রের আলোকে ফারসি মাসনাভির প্রকারসমূহ

বিষয় বৈচিত্র্যের আলোকে ফারসি মাসনাভিগুলো কয়েক প্রকারে বিভক্ত। ১.মাসনাভিয়ে হামাসি (مثنوی حماسی) বা বীরত্বব্যঞ্জক দ্বিপদী কবিতা। ২. মাসনাভিয়ে আখলাকি (مثنوی اخلاقی) বা চরিত্র গঠনমূলক দ্বিপদী কবিতা। ৩. মাসনাভিয়ে হুস্ন ওয়া ইশক (مثنوی حسن و عشق) বা প্রেমবিষয়ক দ্বিপদী কবিতা। এই প্রেম সংক্রান্ত দ্বিপদী কবিতাগুলো আবার দুই ধরনের হয়। ক. ইশকে হাকিকি বা প্রকৃত আল্লাহর প্রেমে আপ্লুত নির্ভর দ্বিপদী কবিতা। খ. ইশকে মাজাজি বা রূপক প্রেম তথা নর-নারীর প্রেমবিষয়ক দ্বিপদী কবিতা। মাসনাভিয়ে হুস্ন ও ইশক বা প্রেমবিষয়ক কবিতায় প্রেমাস্পদ নারী না পুরুষ নাকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়টি ফারসি ভাষার মতো উর্দু ভাষায়ও সন্দেহের ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে। এই ধোঁয়াশার কারণে উর্দু মাসনাভি হয়ে উঠেছে আরো প্রাঞ্জল, গতিশীল ও হৃদয়গ্রাহী।

উর্দু সাহিত্যে ফারসি মাসনাভির ধর্মীয় চেতনার অনুসরণ

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, উর্দু সাহিত্যে ফারসি মাসনাভির অনুকরণের ধারায় কেবল ফারসি ছন্দ নয়; বরং ছন্দের সাথে সাথে ভাবের অনুসরণ ও অনুকরণ লক্ষণীয়। তবে উর্দু মাসনাভির সূচনাপর্বটি ফারসি মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতাগুলো অনুবাদের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে।

ফারসি মাসনাভিগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে সূচনাবক্তব্যে এসেছে মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, আখিরি নবি রাসুল (সা.)-এর গুণাবলির বর্ণনা, সাহাবিদের মর্যাদার বর্ণনা, আপন পির ও মুরশিদ (আধ্যাত্মিক গুরু)-এর স্তুতি বর্ণনা ইত্যাদি। এরপর বর্ণনা করা হয় মূল গল্প। ফারসি মাসনাভিগুলোর এ ধারার হুবহু অনুকরণ উর্দু মাসনাভিতে বিপুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। শেখ নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি ছিলেন খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের একজন ফারসি কবি (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.)। বিখ্যাত মাসনাভি গ্রন্থ *ইসকান্দর নামে* (اسکندر نامہ)-এর সূচনাতে মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে নিজামি গাঞ্জাভি (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.) বলেন:

اوّل او اوّل بی ابتداست آخر او آ خر بی انتهاست

(গাঞ্জাভি, ১৩৭৮ সৌ. খণ্ড, ১: ১)

[সূচনাতে তিনিই প্রথম যার কোনো শুরু নেই, তিনি এমন অন্ত্য যার কোনো শেষ নেই।]

এ সূচনা বক্তব্যের অনুসরণ করে মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) তাঁর *কুতুবে মুশতারি* (قطب مشتری) নামক বিখ্যাত উর্দু মাসনাভি গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

توں اوّل توں آخر توں قادر ہے توں مالک توں باطن توں ظاہر ہے

(ওয়াজহি, ১৯৩৭:১)

[সূচনাতে তুমি সমাপ্তিতে তুমি তুমিই সকল বিষয়ে সক্ষম
তুমি অধিপতি তুমি অভ্যন্তরে তুমি প্রকাশ্যে বিরাজমান।]

উর্দু ভাষায় অনূদিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ফারসি মাসনাভি

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে উর্দুভাষী পাঠকদের মাসনাভি পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় ইবনে হুসাম খুসফি (৭৮৩-৮৭৫ সৌ.) বিরচিত *মাসনাভিয়ে খাভের নামে* (مثنوی خاورنامہ) , আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) *হাশত বেহেশত* (ہشت بہشت) এবং ফরিদুদ্দিন আত্তারের (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) *মান্তেকুত তায়ের* (منطق الطیر)-এর উর্দু অনুবাদ পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

বাদশাহ আদিল শাহ (১৫৮০-১৬২৭ খ্রি.)-এর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী খাদিজা সুলতানার নির্দেশে কামাল খান রস্তমি *খাভের নামে* (خاورنامہ) কাব্যগ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেন। আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) *হাশত বেহেশত* (ہشت بہشت) নামক এই বিখ্যাত মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটি ১৩০২ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এ মাসনাভিটিও সম্রাজ্ঞী খাদিজা সুলতানার নির্দেশে মালিক খুশনুদ *হাশত বেহেশত* (*ہشت بہشت*) শিরোনামেই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) বিরচিত *মান্তেকুত তায়ের* (منطق الطیر)-এর উর্দু অনুবাদ করেন ওয়াজিহুদ্দিন ওয়াজদি (মৃত্যু.১১৩৮ হি.) এবং এর নামকরণ করেন *পাঞ্ছি বাছা* (*پنچھی باچھا*)।

ফারসি ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি মাসনাভি গ্রন্থ উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো *লাইলি ওয়া মজনুন* (لیلی ومجنون) ও *ইউসুফ ওয়া জুলাইখা* (یوسف وزلیخا)। অতএব, এ কথা অকপটে বলা যায় যে, উর্দু ভাষায় মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা রচনায় কবিগণ রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ফারসি মাসনাভি ধারার কবিতাকে অনুসরণ করেছেন।

রচনাশৈলী ও বিষয়-বৈচিত্রের আলোকে উর্দু মাসনাভি

বিষয়-বৈচিত্র্যের আলোকে উর্দু মাসনাভি ধারার কবিতাগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। ১. প্রেমবাদী মাসনাভি। ২. ভাববাদী বা সুফি দর্শন সম্বলিত মরমি মাসনাভি। ৩. বিবর্তনবাদী মাসনাভি এবং ৪. আখলাকি বা আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন সম্পর্কিত মাসনাভি।

উর্দু সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) বিরচিত উর্দু ভাষার বিখ্যাত মাসনাভি ধারার কাব্যগ্রন্থ *কুতুবে মুশতারি* (قطب مشتری), নুসরাতি[৫৪] (মৃত্যু, ১৬৮৩খ্রি.) বিরচিত *গুলশানে ইশক* (گلشن عشق) এর সাথে ফারসি ভাষায় রচিত মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ গুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উর্দু সাহিত্যে মাসনাভি রচনার আবহ তৈরি হয়েছিলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবেই। এটি স্পষ্ট যে, উর্দুভাষী ফারসি ভাষায় রচিত মাসনাভি ধারার কাব্যগ্রন্থকে সামনে রেখেই উর্দু ভাষায় মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা রচনা করেছেন।

উর্দু মাসনাভিতে ফারসি মাসনাভি ধারার কবিতায় বর্ণিত প্রেম ও প্রণয় সংক্রান্ত বিষয়াবলির প্রভাব

মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.)-এর বিখ্যাত কুতুবে *মুশতারি* (قطب مشتری) কাব্যগ্রন্থ এবং নুসরাতির (মৃত্যু, ১৬৮৩খ্রি.) *গুলশানে ইশক* (گلشن عشق)-এর ন্যায় মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ গুলোকে আমরা প্রেমবাদী মাসনাভি বলতে পারি। এ ধারার মাসনাভি কবিতার মূল বক্তব্য হলো মানব-মানবীর প্রেমকাহিনী বর্ণনা করা।

এ ক্ষেত্রে মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) ও নুসরাতি (মৃত্যু,১৬৮৩খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.)-এর মাসনাভি আঙ্গিকে রচিত *হাফত পেইকার* (هفت پیکر) ও *খসরু ওয়া শিরিন* (خسرو وشیرین)-এর মূল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই উর্দু ভাষায় মাসনাভি রচনা করেছেন।

উর্দু মাসনাভি ধারার কবিতাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ফারসি ও উর্দু মাসনাভি ধারার কবিতাগুলোর গল্প এক ও অভিন্ন। নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.) রচিত *খসরু ওয়া শিরিন* (خسرو وشیرین) গ্রন্থে কবি যে গল্পের অবতারণা করেছেন তা হলো এই রূপ:

نسب را در جہان پیوند می خواست به قربان از خدا فرزند می خواست

(গাঞ্জাভি, ১৩৭৮ সৌ., খণ্ড, ২: ৪)

[পৃথিবীতে তিনি তাঁর উত্তরসুরি রেখে যেতে চান। তাই আল্লাহর নিকট একটি ছেলে সন্তানের তিনি আকঙ্খা পোষণ করলেন।]

কথিত আছে যে, এক দেশে এক বাদশাহ ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান সব কিছুই দিয়েছেন; কিন্তু সন্তান-সন্ততি দেন নি। এ নিয়ে বাদশাহর হতাশার সীমা নেই। নানা ফকির দরবেশ ধরে বাদশাহ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং

৫৪. নুসরাতির পুরো নাম মুহাম্মদ নুসরাত। তিনি দ্বিতীয় আলি আদিল শাহের (১৬৫৬-১৬৭২ খ্রি.) সময়কার রাজকবি ছিলেন। *গুলশানে ইশক* (گلشن عشق), *আলি নামা* (علی نامہ) এবং *তারিখে ইসকান্দারি* (تاریخ اسکندری) তাঁর রচিত অন্যতম উর্দু গ্রন্থ। নুসরাতি ১৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (সাক্সেনা, ১৯৫২: ৬৬)

বাদশাহকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.)-এর এ বক্তব্য নুসরাতি (মৃত্যু,১৬৭৪খ্রি.) স্বীয় মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ *গুলশানে ইশক* (گلشن عشق)-এ এভাবে তুলে ধরেন:

دیا تھا خدا اس کوں سب کچھ مگر ولے سخت محتاج تھا بن پسر

(নুসরাতি, ১৬৫৭:৬২)

[আল্লাহ তাআলা তাকে সব কিছু দিয়েছেন, কিন্তু তারপরও তিনি একটি ছেলে সন্তানের মুখাপেক্ষী ছিলেন।]

এ গল্পটি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) থেকে শুরু করে উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ মাসনাভি রচনাকারী মির হাসান (১৭২৭-১৭৮৬ খ্রি.)-এর মাসনাভি কাব্যগ্রন্থে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। ফারসি ও উর্দু মাসনাভির গল্পগুলোর সূচনা প্রায় এক ও অভিন্ন হলেও প্রত্যেক মাসনাভি লেখক তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলীতে ছিলেন অনন্য। *গুলশানে ইশক* (گلشن عشق) মূলত একটি প্রেমকাব্য। এ প্রেমকাব্যে মনোহর ও মধু-মালতির প্রেমকাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর রচনাকাল ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

একটি সন্দেহের নিরসন

অনেকে *গুলশানে ইশক* (گلشن عشق) মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটিকে আক্কেল খান রাজি[৫৫] (মৃত্যু.১৬৯৬ খ্রি.) রচিত *সামা ওয়া পারওয়ানে* (سماء و پروانه) নামক ফারসি গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ বলে ধারণা করেন। কিন্তু এ তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ, আক্কেল খান রাজি (মৃত্যু ১৬৯৬ খ্রি.) রচিত *মনোহর ও মধু-মালতির* প্রেমকাহিনী প্রকাশিত হয় *গুলশানে ইশক* (گلشن عشق) প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পরে। হরেন্দ্র চন্দ্র পালের ভাষ্য মতে বিখ্যাত প্রেমকাব্য *গুলশানে ইশক* (گلشن عشق)-এর অনুকরণেই *সামা ওয়া পারওয়ানা* (سماء و پروانه) রচিত হয়েছে। (পাল, ১৯৬২: ৫৭)

নুসরাতির (মৃত্যু, ১৬৮৩খ্রি.) আরেকটি মাসনাভি কাব্য হলো *আলি নামা* (علی نامہ)। এটি একটি ইতিহাস নির্ভর মাসনাভি ধারার কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থে বাদশাহ আলি আদিল শাহ (শাসনকাল ১৬৫৭-১৬৭২ খ্রি.)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ও চরিতকথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটিকে অনেকে *তারিখে আলি আদিল শাহ* (تاریخ علی عادل شاہ) নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কবি এ গ্রন্থটিকে *শাহ নামায়ে দাকান* (شاہ نامۂ دکن) বা দক্ষিণ ভারতের শাহনামা বলে উল্লেখ করেছেন। (সাক্সেনা, ১৯৪০: ৬৬)

---

৫৫. আক্কেল খান রাজি। তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সতেরোশ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ খোরাসানের খাওয়াফ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। পিতার নাম সৈয়দ মুহাম্মদ তাকি। তিনি উর্দু ও ফারসি উভয় ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ৩৪৩)

উর্দু মাসনাভি ধারার কাব্যসাহিত্যে ফারসি মাসনাভি ধারার উপাদানগত প্রভাব

উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মাসনাভি লেখক মির হাসান দেহলাভি (১৭২৭-১৭৮৬ খ্রি.)সহ অনেকের মাসনাভির মূলগল্প বা গল্পের অংশ বিশেষ ফারসি মাসনাভি থেকে গৃহীত। যেমন মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) তাঁর বিখ্যাত মাসনাভি *কুতুবে মুশতারি* (قطب مشتری) গ্রন্থে গল্পের মূল নায়ক কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর স্বপ্নে দেখা প্রেমাস্পদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এইভাবে:

নায়ক কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) একদা একজন সুন্দরি মেয়েকে স্বপ্নে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেলো। নায়কের বাবা বাদশাহ ইব্রাহিম কুতুব শাহ (১৫১৮-১৫৮০ খ্রি.) রাজ্যের সকল কুমারী মেয়েদের ডেকে আনলেও সেখানে প্রার্থিত কুমারীকে পাওয়া যায় নি। অবশেষে বিশ্ব পরিভ্রাজক আত্তারিদ নামক একজন চিত্রশিল্পীকে ডেকে আনা হলো। বাদশাহ ইব্রাহিম কুতুব শাহ (১৫১৮-১৫৮০ খ্রি.) সেই চিত্রশিল্পীকে বললেন, 'যদি তোমার জানা থাকে তবে আমার রাজকুমারের প্রার্থিত কুমারীর ঠিকানা বর্ণনা কর'। চিত্রশিল্পী আত্তারিদ বলল, 'রাজকুমারের প্রার্থিত কুমারী বর্তমানে পৃথিবীতে দু'জন আছে। তারা হলেন বাঙলার শাহজাদি মুশতারি এবং তার বোন জহুরা'। এক পর্যায়ে আত্তারিদের কাছে শাহজাদি মুশতারির যে ছবিটি ছিলো তা শাহজাদা কুলি কুতুবশাহকে (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) দেখানো হলে তিনি বলেন: 'হ্যাঁ, আমি এই মেয়েকেই স্বপ্নে দেখেছিলাম'।

আত্তারিদ রাজকুমার কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) কে সাথে নিয়ে বাঙলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের পর আত্তারিদ মুশতারির আসা যাওয়ার পথে চিত্রাঙ্কন করতে থাকে। একদিন মুশতারি এ চিত্রাঙ্কন দেখে তার প্রাসাদকে এভাবে সাজাতে বলেন। আত্তারিদ সুযোগ বুঝে একস্থানে কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর ছবি এঁকে দেয়। সে ছবি দেখে মুশতারিও কুলি কুতুবের (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) প্রেমে পড়ে যান। অবশেষে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং ধুমধামের সাথে বিয়ে হয়।

একই রকম গল্পের অবতারণা আমরা নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.)-এর বিখ্যাত মাসনাভি *খসরু ওয়া শিরিন* (خسرو وشیرین) নামক কাব্যগ্রন্থে দেখতে পাই। নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.) বলেন: খসরুর শাপুর নামে একজন বিশ্ব পরিভ্রাজক ও চিত্রশিল্পী বন্ধু ছিলো। একদা খসরু শিরিন নামক এক নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে তার প্রেমে পড়ে যান। খসরু বন্ধু শাপুরকে শিরিনের খোঁজে পাঠালে শিরিনের প্রাসাদে শাপুর খসরুর ছবি এঁকে দেয়। শিরিন সে ছবি দেখে খসরুর প্রেমে পড়ে যান। নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১১৪৫-১২০৩ খ্রি.)- এ ঘটনা উল্লেখ করতে যেয়ে স্বীয় মাসনাভিতে বলেন:

ندیمی خاص بودش نام شاپور جهان گشته ز مغرب تا لهاور
ز نقاشی به مانی مژده داده به رَسامی در اقلیدس گشاده

(গাঞ্জাভি, ১৩৭৮ সৌ., খণ্ড, ২: ৪৮)

[তাঁর শাপুর নামের এক বিশেষ বন্ধু যিনি পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য পর্যন্ত সফর করেছিলেন, একজন চিত্রকরের আঁকা ছবি দেখালে তাঁর হৃদয়জগৎ আলোকিত হয়।]

মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.) তাঁর উর্দু ভাষায় রচিত কুতুবে *মুশতারি* (قطب مشتری) নামক মাসনাভি ধারার কাব্যগ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন:

عطارد سو نقاش کا نام تھا　　بھلا ہو و برا سب اسے کام تھا

ہر یک ملک اوپر گذر تھا اسے　　ہر شہر کا سب خبر تھا اسے

(ওয়াজহি, ১৯৩৯:৩৫)

[আত্তারিদ ছিলো একজন চিত্রকরের নাম। তিনি খারাপ-ভালো সব রকমের কাজ করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করার কারণে অধিকাংশ শহর সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিলো।]

এ ছাড়া ফারসি মাসনাভিগুলোর ন্যায় উর্দু মাসনাভি গুলোতেও দৈত্য, পরি, অজগর সাপ, তন্ত্র-মন্ত্র অলীক কাহিনীরও অবতারণা হয়েছে।

উর্দু ভাষায় রচিত কয়েকটি বিখ্যাত মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ

উর্দু ভাষায় রচিত বিখ্যাত মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো *মাসনাভিয়ে সিহরুল বয়ান* (*مثنوی سحر البیان*)। এ মাসনাভি ধারার কাব্যগ্রন্থটি মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.)-এর লেখায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত কাহিনীকাব্য *মাসনাভিয়ে সিহরুল বয়ান* (*مثنوی سحر البیان*) ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। ফারসি ভাষায় প্রচলিত ঘটনা প্রবাহ ছিলো তাঁর কাহিনীকাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) রচিত *মাসনাভিয়ে সিহরুল বয়ান* বা *কিস্সায়ে বদরে মুনির* (*قصۂ بدر منیر*) মূলত একটি প্রেমনির্ভর কাহিনীকাব্য। এ কাব্যের সূচনা পর্বে তিনি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) বিরচিত *কেস্সায়ে চাহার দরবেশ* (قصہ چہار درویش) -এ বর্ণিত গল্পটিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে নিজ ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

ঘটনা প্রবাহে দেখা যায় এক বাদশাহর প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, অর্থ-সম্পদ সব কিছু ছিলো, কিন্তু কোনো সন্তান ছিলো না। মাসনাভির সূচনা পর্ব এ ঘটনা দিয়ে শুরু করে লেখক নায়ক রাজপুত্র বেনজিরের সাথে রাজকন্যা বদরে মুনিরের প্রেম-কাহিনী তথা উপাখ্যান উল্লেখ করেছেন। এতে লেখক মাহেরুখ নামে পরিজাত সুন্দরির ঘটনা অবতারণা করে ত্রিভুজ প্রেমের এক দ্বন্দ্বমূলক কাহিনী নির্মাণ করেন। লেখক আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত *আলিফ লাইলা*-এর অনুকরণে এটি রচনা করেছেন। এতে প্রচুর পরিমাণে ফারসি শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে কোথায়ও কোথায়ও বিখ্যাত ফারসি কবি শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.)-এর *বুস্তান* ও *গুলিস্তান* গ্রন্থের অনুকরণে পঙ্‌ক্তিমালা সন্নিবেশে ঘটনাপ্রবাহকে আরো প্রাণবন্ত করেছেন।

উর্দু সাহিত্যে সাবকে ইরাকি তথা মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.)-এর রচনাশৈলীর অনুসরণে কাজি মাহমুদ বাহরি[৫৬] মাসনাভি *মনোলগন* (*من و لگن*) রচনা করেছেন। এটি মরমি চিন্তাধারাকে সামনে রেখে রচিত একটি মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থ। এটি মূলত ফারসি সাহিত্যের বিশ্ববিশ্রুত কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *মাসনাভিয়ে মানাভিয়ে মাওলানা রুম* (مثنوی معنوی مولانا روم)-এর অনুকরণে রচিত হয়েছে।

কাজি মাহমুদ বাহরি তাঁর রচিত *মাসনাভি মনোলগন* (*مثنوی من و لگن*)-এ রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ভাবশিষ্য হয়ে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি, আল্লাহ তাআলার পথে পরিচালিত পথিকের বিভিন্ন অবস্থা তথা ফানা ফিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর প্রেমে লীন হওয়া, ফানা ফিশ্ শাইখ তথা আপন পিরে (আধ্যাত্মিক গুরু) বিলীন হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ফানা ফিল্লাহ বা আল্লাহর মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার অনেকগুলো উদাহরণ মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) তাঁর *মাসনাভিয়ে মানাভিয়ে মাওলানা রুম* (مثنوی معنوی مولانا روم) শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ভাষায় ফানা ফিল্লাহের উদাহরণ হলো এমন যে, লোহা আগুনে উৎতপ্ত হলে লাল রঙ্গ ধারণ করে। এ অবস্থায় লোহা আগুন হয়ে য়ায় না; কিন্তু আগুনের সকল গুণাগুণ তার মধ্যে বিরাজমান থাকে। অনুরূপভাবে ফানা ফিল্লাহের অবস্থায় মানুষের মধ্যে এমন একটি অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যেমন মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) বলেন:

رنگ آهَن مَحوِ رَنگِ آتشَست   زِ آتشَی می لا فَدُ و خَامُشوش است
چُون به سُرخی گشت همچون زَرِّکان   پَس اَنَا النَّار است لَافَش بِی زَبَان....
آدمی چون نور گیرد از خدا   هست مسجود ملائک ز اجتبا

(রুমি, ১৩৭৩ সৌ.: ২৪)

[লোহার রঙ্গ আগুনের রঙ্গে বিলীন হয়ে যায়, আগুন থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তা নিভে যায়। যেমন স্বর্ণ যখন লাল হয় তখন সে অবলা হয়ে আমিই আগুন বলে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। মানুষ যখন আল্লাহ থেকে আলো গ্রহণ করে তখন নির্বাচিত হওয়ার কারণে সে ফেরেশতাদের সেজদাপ্রাপ্ত হয়।]

৫৬. কাজি মাহমুদ বাহরি একজন সুফি-সাধক ছিলেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কোনো সঠিক তথ্যা পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয় ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আদিল শাহি শেষ সম্রাট সেকান্দর আদিল শাহের (শাসনকাল ১৬৭২-১৬৮৬ খ্রি.) দরবারে এসে দু'বছর অবস্থান করেছিলেন। আদিল শাহি সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে পড়লে তিনি হায়দারাবাদ চলে আসেন। তিনি ফারসি ও দক্ষিণ ভারতীয় উর্দু ভাষায় গজল, কাসিদা, মাসনাভি ও রুবায়ি ধারার কবিতা লিখেছেন। তাঁর *মনোলগন* (*من و لگن*) নামে একটি উর্দু মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই এই মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটিকে *আসরারুল এরফান* (اسرار العرفان) নামে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। (হক, ১৯৬২: ৫৩)

মাহমুদ বাহরি মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) এই ফানা ফিল্লাহ মতবাদে প্রভাবিত হয়ে এবং তাঁর মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতার ভাবধারাকে সামনে রেখে *মনোলগন* (مثنوی من و لگن) নামক মাসনাভি ধারার কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি বলেন:

واحد کہنا تجھ ساجے شاہد تجھے بولنا بڑا جے
مطلق تو علیم علم تیرا ہر دل کے بھیتر دیا ہے ڈیرا
تو یک یو تمام رنگ تیرے تو جل ہے پر جل ترنگ تیرے

(বাহরি, ১৯৫৫: ৬২)

[তোমার মতো সত্তাকেই এক বলা সাজে। আমি বড়াই করে তোমার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছি। তুমি স্বাধীন সত্তা, তুমি সর্বজ্ঞানী, সকল জ্ঞান তোমার। সকল হৃদয়ে আছে তোমার অধিষ্ঠান। তুমি একক, আর সকল রঙ্গ তোমার। আমার হৃদয়ে তুমি জল, আর জলতরঙ্গের ধ্বনিও তোমার।]

লাক্ষ্ণৌভিত্তিক সাহিত্যচর্চায় উর্দু ভাষায় আরো কিছু মাসনাভি রচিত হয়েছে। এর মধ্যে পণ্ডিত দয়া শঙ্কর[৫৭] (১৮১১-১৮৪৫ খ্রি.) রচিত *মাসনাভিয়ে গুলজারে নাসিম* (مثنوی گلزار نسیم) অন্যতম। এ মাসনাভি গল্পটি মূলত ইজ্জতুল্লাহ বাঙ্গালি রচিত ফারসি গল্প *কেসসায়ে গুলে বাকাভালি* (قصه گل بکاولی) থেকে আহরিত। গ্রন্থটি ইজ্জতুল্লাহ খান[৫৮] ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান ড. জন গিলক্রিষ্টের অনুরোধে মুন্সি নেহাল চন্দ্র লাল ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি গল্পটিকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। পণ্ডিত দয়া শঙ্কর (১৮১১-১৮৪৫ খ্রি.) গল্পটিকে মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতায় রূপান্তরিত করেন। এ ক্ষেত্রে দয়া শঙ্কর (১৮১১-১৮৪৫ খ্রি.) মূলভাব ঠিক রেখে অনেক স্থানে লাক্ষ্ণৌভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন। এ মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থে দয়া শঙ্কর (১৮১১-১৮৪৫ খ্রি.) নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ করে নর্তকী ও পতিতাদের সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেছেন।

ঘটনা প্রবাহে দেখা যায়, জাইনুল মুলুক নামে এক বাদশাহর চারজন ছেলে সন্তান ছিলো। সব চেয়ে ছোট ছেলেটির নাম ছিলো তাজুল মুলুক। তাঁর ব্যাপারে বাদশাহকে গণকগণ একদা বললেন, 'বাদশাহ যদি তাজুল মুলুকের দিকে তাকান, তবে তিনি অন্ধ হয়ে যাবেন।' ঘটনা চক্রে একদিন বাদশাহ শিকার করে ফেরার পথে তাজুল মুলুকের দিকে তাকালে অন্ধ হয়ে যান। বহু চিকিৎসার পর একজন চিকিৎসক

---

৫৭. পণ্ডিত দয়া শঙ্কর ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের লাক্ষ্ণৌতে এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। লাক্ষ্ণৌতে শিক্ষা লাভের পর তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। মির হাসানের বিখ্যাত মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থ *সিহরুল বয়ান* (سحر البیان)-এর পরই দয়া শঙ্করের মাসনাভি গ্রন্থ *গুলজারে নাসিম* (گلزار نسیم)-এর স্থান। দয়া শঙ্কর (১৮১১-১৮৪৫ খ্রি.) মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা ছাড়াও গজল লিখেছেন। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (সাক্সেনা, ১৯৫২: ২৪৯)

৫৮. ইজ্জতুল্লাহ খান একজন ফারসি ভাষা সাহিত্যিক। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করলেও বর্তমানে কেবল *তাজুল মুলক গুলে বাকাভালি* নামক গ্রন্থটি পাওয়া যায়। এ গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় গদ্যাকারে রচিত। গ্রন্থটির একটি পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে (এইচ/৬৬.৭) সংরক্ষিত আছে।

বাদশাহকে বাকাভালি নামক স্থানের বিশেষ ফুল চোখে স্পর্শ করলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন বলে আশ্বাস দেন। রাজপুত্র তাজুল মুলুক সেই বাকাভালি নামক স্থানে ফুল সংগ্রহরে জন্য গিয়ে দেখেন সে ফুল এক পরির অধিকারে আছে। তাজুল মুলুক সে ফুল সংগ্রহ করতে যেয়ে পরির প্রেমে পড়ে যান। একদা সে কৌশলে পরির থেকে সেই ফুল সংগ্রহ করে ফিরে আসলে পরি সর্বস্ব হারিয়ে বলে:

ہے ہے میرا پھول لے گیا کون ہےہے مجھے خار دے گیا ہے کون؟

(দয়া শঙ্কর, ২০০৭: ২২)

[হায় আফসোস, আমার ফুল কে নিয়ে গেলো? হায়, হায়, কে আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে গেলো?]

এ ছাড়া নবাব মির্জা শাউক[৫৯] (১৭৭৩-১৮৭১ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যে মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। মির্জা শাউক (১৭৭৩-১৮৭১ খ্রি.) রচিত প্রসিদ্ধ মাসনাভি ধারার কাব্যগ্রন্থ হলো *জাহরে ইশক, ফারিবে ইশক, লাজ্জাতে ইশক ও বাহারে ইশক*। এ মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থগুলো অশ্লিলতার কারণে পাঠক মহলে সমাদৃত হতে পারে নি।

উর্দু সাহিত্যের প্রগতিশীল কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) *কাদের নামা* (قادرنامہ) নামক একটি মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা রচনা করেছেন। শিশুরা যেনো ভাষাজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয় সে বিষয়টিকে সামনে রেখে গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) এ মাসনাভিতে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত অসংখ্য আরবি ও ফারসি সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন গালিব বলেন:

ادر اور اللہ اور یزداں خدا ہے نبی مرسل پیمبر رہنما

(গালিব, ১৯৬৮: ৩৯৪)

[সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তিনিই প্রতিপালক, তিনিই খোদা। আর নবি হলেন প্রেরিত, বার্তাবাহক ও পথ নির্দেশক।]

আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) *সাকি নামা* (ساقی نامہ) নামক মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা রচনা করেছেন। মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) অনুসরণে রচিত এ কাব্যে কবি ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) ভারতের মুসলিম জাতিকে অলসতা ছেড়ে আবার নিজেদের কৃষ্টি-কালচারকে আঁকড়ে ধরে উজ্জীবিত হতে বলেছেন। যেমন ইকবাল বলেন:

تمدن، تصوف، شریعت، کلام بتان عجم کے پجاری تمام

حقیقت خرافات میں کھوگئی یہ امت روایات میں کھوگئی

(ইকবাল, ১৯৫২: ৩৪৩)

[কৃষ্টি-কালচার, আধ্যাত্মিকতা, শরিয়ত আর কালাম শাস্ত্র। সকলই এখন অনারবদের পুজারী হয়েছে। বাস্তবতা এখন কুসংস্কারে হারিয়ে গেছে।]

---

৫৯. মির্জা শাওকের আসল নাম তাসাদ্দুক হুসাইন খান। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লাক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাক্ষ্ণৌর নাবাব ওয়াজেদ আলি শাহের দরবারের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (সাক্সেসা, ১৯৫২: ২৮৫)

এ জাতি (আজ) মুখরোচক বর্ণনায় নিমজ্জিত আছে।]

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, উর্দু সাহিত্যে মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতায় ফারসি মাসনাভির প্রভাব ব্যাপকতর। বিশেষত ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতার প্রভাব উর্দু সাহিত্যে অধিক বলে পরিলক্ষিত হয়। এটি মূলত ফেরদৌসির (৯৪০-১০২০ খ্রি.) *শাহনামে* (شاهنامه) থেকে রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) *মাসনাভিয়ে মানাভিয়ে মাওলানা রুম* (مثنوی معنوی مولانا روم) রচনার সময়কাল বা যুগ। উর্দু সাহিত্যে মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা রচনার ধারণা এসেছে মূলত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে। উর্দু সাহিত্যে মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্যগ্রন্থ গুলোর মধ্যে মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) রচিত *সিহরুল বয়ান* অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্তমানে উর্দু সাহিত্যে মাসনাভি ধারার কাব্যচর্চা অনেক সীমিত পরিসরে হয়ে থাকে। কিন্তু যেভাবেই চর্চিত হোক না কেনো ফারসি ভাষায় রচিত মাসনাভি ধারার কবিতার ভাব ও চেতনার প্রভাব এখানো উর্দু সাহিত্যে বিরাজমান।

উর্দু কাব্যে ফারসি গজলের প্রভাব

ফারসি কাব্যরীতি থেকে আহরিত উর্দু ভাষার আরেকটি কাব্যরীতি হলো গজল (غزل)। গজল (غزل) কে উর্দু কাব্যসাহিত্যের মূল উপাদান বা প্রাণ বলা চলে। গজল (غزل) শব্দটি আরবি। অর্থ নারীদের সাথে কথা বলা বা নারী সম্পর্কে কথা বলা, প্রেম নিবেদন করা, নারীর প্রতি ভালোবাসা ও রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায় গজল (غزل) হলো একটি সুনির্দিষ্ট কাব্যরীতি; যাতে সাধারণত সাতটি পঙ্‌ক্তি থাকে এবং প্রতিটি পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল একই রকম হয়ে থাকে। গজল (غزل) -এর প্রথম পঙ্‌ক্তিকে মাতলা (مطلع) এবং সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিকে মাকতা (مقطع) বলা হয়। (রশিদি ২০০৬:১৪)

গজলের প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রেমাস্পদের অনুপম সৌদর্যের বর্ণনা এবং তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাই গজলের প্রতিপাদ্য বিষয়। তবে সময়ের বিবর্তনে গজলের অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে গজলের ভাব নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উর্দু ভাষায় গজল সমাদৃত হওয়ার মূল কারণ হলো গজলের মূল বক্তব্যে ভালোবাসার ব্যঞ্জনা বা অভিব্যক্তির প্রকাশ করা। উর্দু সাহিত্য সূচনা লগ্নে ফারসি মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতা দ্বারা বেশি প্রভাবিত হওয়ার কারণে উর্দু গজল ফারসি গললের দ্বারা আত্মিক দিক দিয়ে যতটা প্রভাবিত হয়েছে রূপের দিক থেকে ততটা হয়নি। কারণ গজলচর্চা ব্যাপকতর হতে হতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য তার মূল কাণ্ডে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। তাই মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতার ব্যাপারে যেমন বলা থাকে অনেক উর্দু মাসনাভি আঙ্গিকের কাব্য ফারসি মাসনাভি আঙ্গিকের কবিতার নিছক অনুবাদ কিন্তু উর্দু গজলের ব্যাপারে তেমনটি বলা যায় না।

গজল কবিতার রচনার সূচনা হয়েছে মূলত আরবি কাসিদাকাব্য (قصیده) থেকে। প্রশংসাসূচক কবিতাকে কাসিদা (قصیده) বলে। কাসিদা (قصیده)-এর প্রথম পঙ্‌ক্তিকে তাশ্‌বিব (تشبیب) এবং এর প্রারম্ভিকাকে তাগায্‌যুল- (تغزل) বলে। তাশ্‌বিব শব্দটি আরবি শাবাব (شباب) থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো পূর্ণযৌবন। কাসিদা (قصیده)- এর প্রথম অংশে বাদশাহদের প্রশংসার কারণে এক প্রকারের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আরবি এই তাশ্‌বিব (تشبیب) ও তাগায্‌যুল (تغزل)ই পরবর্তীকালে গজল (غزل) নামে স্বতন্ত্র ধারার কবিতার অস্তিত্ব লাভ করে। যার পূর্ণরূপ আমরা ফারসি কবিদের রচনায় বহুলাংশে দেখতে পাই। (রশিদি, ২০০৬: ৭)

আরবি কাসিদা (قصیده)-এর তাশ্‌বিব (تشبیب) থেকে ফারসি কবিগণ গজল (غزل) রচনা করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। গজল (غزل) কবিতায় এক ধরনের গীতিব্যঞ্জনা বা সুরের ধারা রয়েছে। এ ধরনের কবিতা আমরা ফারসি কবি শাহিদ বাল্‌খি[৬০] (মৃত্যু ৯৩৬ খ্রি.) এবং রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.)-এর রচনায় দেখতে পাই। কবি শাহিদ বাল্‌খি (মৃত্যু ৯৩৬ খ্রি.) তাঁর গজলের (غزل) এক স্থানে বলেন:

دانش و خواسته است نرگس و گل   که به یک جای نشگفند بهم
هر که را دانش است خواسته نیست   و آن که را خواسته است دانش کم

(পাল, ১৯৫৪: ৩০)

[নার্গিস ও গোলাপ হলো জ্ঞান ও বিমর্ষতার প্রতীক। এ সকল কখনো এক সাথে বাগানে ফুটে উঠে না। যে জ্ঞানী সে কখনো বিমর্ষ হয়না। যে বিমর্ষ হয় সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়।]

গজলকাব্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট

গজল ইরানের ফারসি সাহিত্য জগতে শাহিদ বাল্‌খি (মৃত্যু ৯৩৬ খ্রি.) এবং রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.)-এর হাত ধরে হাজার খ্রিষ্টাব্দ অতিবাহিত করে। নব্য ইরানি যুগ থেকে গাজনাভি (৯৭৭-১১৮৬ খ্রি.) যুগে এসে গজলের আবেদন আরো বেড়ে যায়। মহাকবি ফেরদৌসি (৯৬১-১০২০ খ্রি.)-এর কাছে এসে তার ভিত আরো মজবুত হয়। এ সময় তাতারদের আক্রমণে ইস্পাহান, বাগদাদ উজাড় হতে শরু করে। ইরানি বাদশাহদের জৌলুশ নিঃশেষ হয় প্রায়। বাদশাহদের স্তুতিমূলক কাব্যচর্চা তথা কাসিদার আবেদন কমতে আরম্ভ করে। শুরু হয় গজল কাব্যচর্চার বিপুল সম্ভাবনা। (তামীমদারী, ২০০৭ : ১৭৪-১৯৫)

ফারসি ও উর্দু সাহিত্যে গজলের মূল আলোচ্য বিষয় হলো তাসাউফ বা সুফিবাদ চর্চা। শুরুতে গজলচর্চা মানবিক-প্রেম নির্ভর হলেও হাজার খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে গজলের উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তাসাউফ ভাবধারা। তাসাউফ নির্ভর গজলচর্চায় সাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। নশ্বর প্রেমাস্পদের চেয়ে

৬০. শাহিদ বাল্‌খির পুরো নাম আবুল হাসান শাহিদ বিন হুসাইন জহুদানকি বাল্‌খি। তিনি বর্তমান আফগানিস্তানের বালখ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনী সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সামানী (৮১৯-৯৯৯ খ্রি.) রাজদরবারের তিনি অন্যতম কবি ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি রুদাকির (৯০০-৯৪০ খ্রি.) সমসাময়িক কবি ছিলেন। ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। (তামীমদারী:

অবিনশ্বর সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেম নিবেদন সাহিত্য জগতকে আলাদা মাত্রায় আলোড়িত করে। তাসাউফের প্রভাবে প্রেমাস্পদের জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলোর প্রতীকী ব্যবহারে সাহিত্যে সূচনা ঘটে ইহাম গুয়ি তথা দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য। এ বিষয়টি গজল আঙ্গিকের কবিতাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে।

কবি মাজদুদ্দিন সানায়ি (মৃত্যু ১১৪০ খ্রি.), উমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১), শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.), মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), শেখ সাদি শিরাজি (১২১০-১২৯১ খ্রি.), হাফিজ শিরাজি (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) রচিত গজল গোটা বিশ্বসাহিত্যকে আলোড়িত করেছে। ফলে সুদূর মিসর থেকে উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে ফারসি গজলচর্চার আবহ তৈরি হয়েছে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত ফারসি কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) ফারসি গজলের আদলে উর্দু কাব্যসাহিত্যে গজলের ধারা প্রবর্তন করেন। আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) স্বীয় মাতৃভাষা উর্দুকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপন করেছেন ফারসি ভাবধারায় রচিত কবিতার মধ্য দিয়ে। ফারসির গজল কাঠামো এবং ফারসি বাক্যমালাকে সংযুক্ত করে আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) উর্দু গজলকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যান। আমির খসরু বলেন:

زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں

کہ تاب ہجراں ندارم اے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں

(কাদেরি, ১৯২৯:৩১)

[প্রিয়, অসহায়ের অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টি এড়িয়ে যেওনা। নয়নে নয়ন রেখে তোমার সাথে কথা বলবো। বিচ্ছেদের জ্বালা আমি যে আর সইতে পারছি না হৃদয়ে রক্তক্ষরণ বুকের পাঁজরে লেগে আছে।]

এ গজলকে অনেকে উর্দু ভাষার প্রথম কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন এবং আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) কে উর্দু কাব্যসাহিত্যের প্রথম কবি বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) নিজেই তাঁর রচিত *গুররাতুল কামাল* (غرة الكمال) গ্রন্থে খাজা মাসউদ সাআদ সালমানকে (১০৪৬-১১২১ খ্রি.) উর্দু কাব্যসাহিত্যের প্রাচীন কবি বলে উল্লেখ করেছেন। আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) বলেন:

پیش از ی از شاہان سخن خواج ہ مسعود سعد سلمان را س ہ دیوان است، یکے بہ ترکی، یکے بہ پارسی و یکے بہ ہندوی۔

(খসরু, অনু:৬৬)

[আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) -এর হিন্দভি (উর্দু ভাষার আদি নাম) ভাষায় কবিতা রচনার পূর্বে খাজা মাসউদ সাআদ সালমান (১০৩৪-১১২১ খ্রি.)- এর তিনটি দেওয়ান বা কাব্যসমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ ছিলো। একটি তুরকি ভাষায়, একটি ফারসি ভাষায় এবং একটি হিন্দভি তথা উর্দু ভাষায়।]

উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি

উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি কে? এ নিয়ে ব্যাপক মতানৈক্য আছে। হরেন্দ্র চন্দ্র পাল বলেন:

'মাসউদ সাআদ সালমান হলেন সম্ভবত প্রথম কবি যিনি ফারসি বর্ণমালায় হিন্দুস্তানি তথা উর্দু কবিতা রচনা করেছেন। তিনি সুলতান মাহমুদের পৌত্র ইব্রাহিম (১০৩৩-১০৯৯ খ্রি.)-এর রাজ দরবারের কবি ছিলেন। ১১২৫-১১৩০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর উর্দু কবিতা বস্তুত কোন প্রকৃতির ছিলো তা ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় নি।'(পাল,১৯৬২ : ৩৪)

যদিও ড. আবু সাঈদ মুহাম্মদ নুরুদ্দিন (১২৯-১৯৯৯ খ্রি.) খাজা ফরিদুদ্দিন গাঞ্জে শেকার (১১৭৩-১২২৫ খ্রি.) কে উর্দু ভাষার প্রথম কবি বলে উল্লেখ করেছেন।[৬১](নুরুদ্দিন ১৯৯৭, খণ্ড২: ৩১৮) তবে আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) এই গজলটিকে সন্দেহাতীতভাবে উর্দু সাহিত্যের প্রথম গজল বলা যায়।

উর্দু গজলে ফারসি গজলের প্রভাব

গজল (غزل) ফারসি কবিতার একটি প্রসিদ্ধ কাব্যরীতির নাম। এ কাব্যরীতি ও পরিভাষাটি ফারসিকাব্যরীতি থেকে উর্দু ভাষায় এসেছে। তাই দেখা যায় ফারসি কাব্যে যেমন গজল (غزل) -এর প্রথম লাইনকে মাতলা (مطلع) এবং শেষ লাইনকে মাকতা (مقطع) বলে, উর্দু ভাষায়ও অনুরূপ বলা হয়ে থাকে। গজল (غزل)-এর সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিতে সাধারণত কবি নিজের নাম উল্লেখ করে থাকেন। ফারসি ভাষায় এ রীতিটিকে তাখাল্লুস (تخلص) বলে। উর্দু ভাষায়ও এ ধরনের তাখাল্লুস (تخلص)-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গজল (غزل)এ অন্ত্যমিল হয়ে থাকে। ফারসি ও উর্দু কাব্যরীতির পরিভাষায় এ অন্ত্যমিলকে রাদিফ (ردیف) বলে। রাদিফ (ردیف) হলো পঙ্‌ক্তির শেষে প্রদত্ত ধারাবাহিক বর্ণ যা ছন্দের মাত্রা বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। রাদিফ (ردیف)- এর ঠিক পূর্বের শব্দকে কাফিয়া (قافیہ) বলে। গজল (غزل)-এর সর্বোৎকৃষ্ট পঙ্‌ক্তিকে বায়তুল গজল (بیت الغزل) বলে।

তাতারদের অত্যাচারের কারণে যে সকল বিখ্যাত ইরানিকবি ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি উরফি[৬২], নাজির[৬৩], সায়েব এবং কালিম হামাদানির[৬৪] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতে

---

৭১. খাজা ফরিদুদ্দিন গাঞ্জে শেকার (১১৭৫-১২২৫ খ্রি.) উর্দু কবিতা হলো,

وقت سحر وقت مناجات ہے خیز در آن وقت کہ برکات ہے

[শেষরাত প্রার্থনা কবুল হওয়ার সময়। কারণ এ সময়টি হলো বরকতের সময়]

৬২.উরফির পূর্ণ নাম মাওলানা মুহাম্মদ বিন খাজা জাইনুদ্দিন আলি ইবনে জামালুদ্দিন শিরাজি। উপাধি জামালুদ্দিন। কবি নাম উরফি শিরাজি। জন্ম ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে শিরাজে এবং মৃত্যু ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে। তিনি বিয়ে করে আজীবন ভারতে বসবাস করেন। বাদশা আকবরের (১৫৫০-১৬০৫ খ্রি.) দরবারি কবি ছিলেন। একজন ভারতীয় ফারসি কবি হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার ফারসি কবিতায় ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। (শিবলি, ১৯২০, খন্ড ৩ : ৮২)

অবস্থানকালে ফারসি ভাষায় কবিতা রচনার কারণে ফারসি কাব্যের প্রভাব এ উপমহাদেশীয় ভাষাগুলোতে বিপুল ভাবে পড়ে। আবার তাঁদের রচিত ফারসি কবিতায়ও ভারতীয় বা হিন্দুস্তানি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উপমহাদেশে এ সকল বিখ্যাত ফারসি কবিদের কাব্যচর্চার কারণে এ অঞ্চলের কবিদের মাঝেও গজল রচনার আবহ সৃষ্টি হয়। কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) ফারসি পঙ্‌ক্তি মিশ্রিত উর্দু গজলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যা মুলাম্মা (ملمع) রীতির কবিতার অনুকরণের নামান্তর। এর প্রায় দু'শো বছর পর শেখ জামালি[৬৫]-এর রচিত গজলকাব্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব আরো বেশি লক্ষ করা যায়। কবি শেখ জামালি (মৃত্যু ১৫৩৫ খ্রি.) তার রচিত এক গজল- এ বলেন:

خوار شدم زار شدم لٹ گیا در رہ عشق تو کمر ٹٹا ہے

گاہ نگفتی کہ جمالی تو بیت تم کرو کیا اپنا کرم پتا ہے

(সিদ্দিকি, ১৯৭৮: ৯)

[আমি শেষ হয়ে গেছি, আহাজারি করছি, আমার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। প্রেমের পথে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে। জামালি, প্রেমের লীলায় আর কোনো কবিতা লেখোনা। তুমি আর কী করবে, নিজের অনুগ্রহের খবর তো তোমার আছে।]

আরবি পঙ্‌ক্তি মিশ্রিত ফারসি কবিতা বহু আগে থেকেই ফারসি ভাষায় প্রচলিত পরিভাষায় মুলাম্মা গুয়ি) (ملمع گوئی বলে এমন কবিতাকে যার প্রথম পঙ্‌ক্তি ফারসি আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি অন্য কোনো ভাষায় হয়। এ ধরনের কবিতা আমরা ফারসি গজলসম্রাট হাফিজ শিরাজি (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর রচনায় দেখতে পাই। হাফিজ বলেন,

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامہ انی رأیت دھرا من ھجرک القیامہ

پرسیدم از طبیبی احوال عشق گفتا فی بعدھا عذاب فی قربھا السلامہ

(হাফিজ, ১৩৭৬ সৌ.: ২৯৫)

---

৬৩. মুহাম্মদ হুসাইন নাজির নিশাপুরি। ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবিকার তাগিদে ভারতবর্ষে আসেন এবং আকবর পুত্র বাদশা জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯-১৬২৭ খ্রি.) সময়ে রাজদরবারে জায়গা করে নেন। বস্তুত তিনি সুফি ভাবধারার কবি ছিলেন। কথিত আছে যে, মৃত্যুর বারো বছর পূর্বে তিনি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে অল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হন। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (শিবলি, ১৯২০, খন্ড ৩: ১৩৪)

৬৪. পুরো নাম আবু তালিব কালিম হামাদানি। তিনি ইরানের হামাদান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাদশা জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯-১৬২৯খ্রি.) শাসনামলে ভারত আসেন। ১০২৮ হিজরি সালে তিনি পুনরায় মাতৃভূমি হামাদানে ফিরে যান। দু' বছর পর আবার জীবিকার তাগিদে ভারত চলে আসেন। ১০৪৪ হিজরি সালে বাদশা শাহজাহানের (১৫৯২-১৬৬৬ খ্রি.) পক্ষ থেকে মালিকুশ শুআরা বা কবি সম্রাট খেতাব পান। ১০৬১ হিজরি সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মাসনাভি, কাসিদা এবং গজলসহ নানা ধরনের কবিতা লিখেছেন। তাঁর খ্যাতির মূলে ছিলো গজল রচনা। (শিবলি, ১৯২০, খন্ড ৩: ২০৫)

৬৫ . শেখ জামালি কাম্বু মোগল সম্রাট বাবরের (১৫২৬-১৫৫৫ খ্রি.) সময়কার একজন প্রসিদ্ধ ফারসি কবি। তিনি ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ফারসি শব্দমালা মিশ্রিত উর্দু ভাষায় কবিতা ও গজল রচনা করেছেন।

[কবি হাফিজ (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.) রচিত এই গজলের মর্মার্থ হলো, প্রেমাস্পদের মিলনের চিঠি হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লিখেছি। হে প্রেয়সী আমার, এক যুগ তোমার বিয়োগ, আমার জন্য কিয়ামত স্বরূপ। প্রেমের এ ব্যথা সম্পর্কে চিকিৎসককে জিজ্ঞাস করেছিলাম; জবাবে তিনি বললেন, প্রেয়সীর বিয়োগে শান্তি আর মিলনেই আছে শান্তি।]

উর্দু গজল কাব্যে ফারসি গজল শৈলীর প্রভাব

বিখ্যাত কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) ভারতীয়দের গজলচর্চার যে অনুপম পথ দেখিয়েছেন তা মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) আরো নিপুণভাবে এর প্রসার ঘটিয়েছেন। মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের একজন পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফারসি ও উর্দু উভয় ভাষাতেই কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর দিওয়ান (কবিতাসমগ্র)-এর অর্ধেক কবিতা উর্দু আর বাকি অর্ধেক ফারসি। তিনি মাসনাভি (দ্বিপদী কবিতা) ও মারসিয়া (শোকগাথা), গজল এবং কিছু সংখ্যক রুবায়ি বা চতুষ্পদী কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গজলে ফারসি গজলসম্রাট হাফিজ শিরাজি (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.)-এর প্রভাব বিলক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থ *কুল্লিয়াতে কুলি কুতুব শাহ* (کلیات قلی قطب شاہ)-এর ভূমিকায় সৈয়দ মুহি উদ্দিন কাদেরি জুর (১৯০৪-১৯৬২ খ্রি.) বলেন,

' محمد قلی کے کلام میں تصوف کی چاشنی پیدا ہونے کا سبب خواجہ حافظ شیرازی کا مطالعہ، اس کی شاعری کی تقلید اور ترجمہ کی کوشش ہے۔ محمد قلی کی شاعری پر سب سے زیادہ حافظ کا رنگ مسلط ہے۔

(জুর,১৯৪০:৪৬)

[মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর কবিতায় আত্মশুদ্ধির ছোঁয়া ফারসি ভাষার বিখ্যাত গজল সম্রাট হাফিজ শিরাজি (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.)-এর রচনা অধ্যায়ন, কবিতার অনুসরণ এবং অনুবাদের মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা যায় মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর কবিতায় ফারসি গজল সম্রাট হাফিজের প্রভাব সব চেয়ে বেশি।]

মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) গজল সম্রাট হাফিজ শিরাজির (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.) কবিতার সার্থক কাব্যানুবাদকও ছিলেন। হাফিজ (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.) বলেন,

بہ عزم توبہ سحر گفتم استخارہ کنم بہار توبہ شکن می رسد چہ چارہ کنم

(হাফিজ, ১৩৭৬ সৌ, খণ্ড, ২ :১৮৭)

কুলি কুতুব শাহের (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) অনুবাদ:

منگیا جو توبہ کے تین صبح استخارہ کروں ہنگام توبہ توڑن آیا کیا میں چارہ کروں

(কুতুব শাহ, ১৯৪০: ৪৭)

[তওবা করার তওফিক চেয়ে তিনদিন ইস্‌তেখারা (বিশেষ নামাজ) আদায় করলাম। তারপর আবার তওবা ভঙ্গ করলাম, আমার কি কোনো উপায় আছে?।]

মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)কে উর্দু সাহিত্যে বাবায়ে রিখতা (باوائے ریختہ) বলা হয়ে থাকে। কারণ, প্রকৃত পক্ষে তিনিই উর্দু সাহিত্যের পরবর্তী যুগের কবিদের উপযুক্ত পথ প্রদর্শক ছিলেন।

মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর ভাষা ছিলো অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল। ভারতীয় পরিবেশ ও প্রকৃতি তাঁর কবিতার উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলো। তাঁর গজলে তৎকালে প্রচলিত দেশীয় ভাষা ও শব্দ বেশি পাওয়া যায় এবং প্রেমের প্রসঙ্গগুলোও যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহিতার সাথে প্রকাশ পেয়েছে। এটি মূলত ফারসি খোরাসানি শৈলীর প্রভাব। (শামিম, ২০০৭: ৩৫৬)

মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর ন্যায় কুতুব শাহি যুগের অন্যান্য কবি যেমন গাওয়াসি (মৃত্যু ১৬৫৬), মোল্লা কুতবি (মৃত্যু.১৬৩৬), ইবনে নাশাতি (মৃত্যু.১৬৫৩), নুসরাতি (মৃত্যু ১৬৮৩ খ্রি.)সহ সকলেই ফারসি গজলকে সামনে রেখে উর্দু ভাষায় গজল রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.)-এর সময়কালে উর্দু গজল আরো উৎকর্ষ লাভ করে। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি কাব্যরীতির প্রায় সবকটি রীতিকে অনুসরণ করে অতি দক্ষতার সাথে ফারসি শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে উর্দু ভাষাকে সকলের কাছে সমাদৃত করার সফল প্রয়াস চালান।

উর্দু কাব্যে অলির বিশেষ শৈলী

মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.) আদেল শাহি সাম্রাজ্য এবং কুতুব শাহি সাম্রাজ্য ১৭৮৬ ও ১৬৮৭ খিষ্টাব্দে দখল করে নিলে দক্ষিণ ভারতের সাথে দিল্লির যোগাযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে দিল্লির উর্দু কথ্যভাষা দক্ষিণ ভারতীয় উর্দু সাহিত্যের ছোঁয়ায় বিকশিত হতে আরম্ভ করে। ফারসি কাব্যরীতি ও শব্দমালার সম্ভারে রছিত অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) কবিতাসমূহ সকলের কাছে সমাদৃত হয়। দিল্লির পাঠক সমাজ অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.)- রচিত কবিতার এ কারিশমা ও নৈপুন্য দেখে তাঁকে উর্দু কাব্যের বাবা আদম (باوائے آدم) খেতাবে ভূষিত করেন। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.)-এর এ জয়গান সকলের মুখে মুখে অনুরণিত হতে থাকে। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) মূলত দক্ষিণ ভারতীয় উর্দুকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে তোলেন। এর মাধ্যমে তিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে ফারসির মত বিশ্বময় সমাদৃত একটি ভাষায় পরিণত করার প্রয়াস চালান।

উল্লেখ্য, এ সময় গোটা ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য ছিলো বহুল প্রচলিত। উর্দু ভাষা ফারসি ভাষার আদলে উপস্থাপিত হওয়ায় সকলের কাছে তা আদৃত হয়ে উঠে। উর্দু গজলের যে ভিত অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) রচনা করেছিলেন তার উপর পরবর্তীকালের উর্দু কবিদের সুরম্যপ্রাসাদ নির্মাণ সহজতর হয়। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) রচিত গজল ছিলো অতি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) এইরূপ একটি গজলের নমুনা তুলে ধরা হলো:

خوب رو خوب کام کرتے ہیں اک نگاہ میں غلام کرتے ہیں

دل ہوا ہے میرا خواب سخن دیکھ کر حسن بیحجاب سخن

بزم معنی میں سرخوشی ہے اسے جس کو ہے نشہ شراب سخن

(পাল,১৯৬১:৬৯)

[সুন্দর মুখের জয় হোক, খুবই কাজের মানুষ। চোখের চাহনিতে দাস বানিয়ে ফেলে। কাব্যের অনাবৃত মুখ দেখে আমার হৃদয় পাগল প্রায়। কাব্যই যার মদের নেশা কবি সভায় তারই সম্মান দেখি।]

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) মাধ্যমে আঞ্চলিকতা মিশ্রিত দক্ষিণ ভারতীয় উর্দু রিখতা ফারসি ভাষার স্পর্শে নতুন রূপ লাভ করলো। তাঁর হাত ধরেই শুরু হয় উর্দু সাহিত্যের নতুন যাত্রা। উর্দু গজলের নবযৌবন পূর্ণতা লাভ করে খাজা মির দরদ (১৭২০-১৭৮৪ খ্রি.) আর মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.)-এর হাতে। এ সময় সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) কাসিদা লেখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। উর্দু ভাষায় কাসিদা রচনায় সাওদার (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) ভাষা ছিল পরিশীলিত, প্রাঞ্জল ও শক্তিশালী। তাঁর কবিতায় কাব্য-মানসের পরিচয় ফুটে উঠে। তাঁর সময়টা ছিলো উর্দু ভাষার সোনালি যুগ (عہد زرین)। এ সময় আবার মোগল সম্রাটদের পতন শুরু হয়। যার ফলে দিল্লি ত্যাগ করে অনেক খ্যাতনামা উর্দু কবি-সাহিত্যিক ভারতের অন্যান্য ক্ষুদ্রাঞ্চলে পাড়ি জমান। ফলে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ে ভারতের আনাচে কানাচে।

মির দরদ ও তাঁর কবিতায় হাফিজের প্রভাব

খাজা মির দরদ (১৭২০-১৭৮৪ খ্রি.)-এর বাবা মুহাম্মদ নাসির আন্দালিব একজন ফারসি কবি ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিলো বোখারায়। দাদা জীবিকার সন্ধানে ভারতবর্ষে আসেন এবং চাকরির সুবাদে দিল্লিতে অবস্থান শুরু করেন। খাজা মির দরদ (১৭২০-১৭৮৪ খ্রি.) বেড়ে উঠেন দিল্লিতে। তিনি মূলত ফারসি কবি ছিলেন। ফারসি ভাষায় তাঁর দশটি গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর একটি মাত্র উর্দু দিওয়ান বা কাব্যসমগ্র রয়েছে। এই দিওয়ানের গজলগুলোর কারণে তাঁর এই সুখ্যাতি হয়েছে বলে অনুমিত হয়। তাঁর গজলের ভাষা সহজ-সরল ও সাহিত্য মাধুর্যে পরিপূর্ণ। হরেন্দ্র চন্দ্র পাল মির হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'খাজা মির দরদ (১৭২০-১৭৮৪ খ্রি.)-এর দিওয়ান আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে ফারসি কবি হাফিজ শিরাজি (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.)-এর কাব্য মাধুর্যের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।[৬৬] (পাল, ১৯৬২: ৯৯)

সুফি ও মরমি ধাঁচের কবি খাজা মির দরদ (১৭২০-১৭৮৪ খ্রি.) এক গজলে বলেন,

اے درد جا چکا ہے مرا کام ضبط سے میں غمزدہ تر قطرہ اشک چکیدہ ہوں

(দরদ,১৮৯২: ৪০)

[হে দরদ, আমার কর্তব্যজ্ঞান নিজ সংযম হারিয়ে ফেলেছে। দুঃখ জর্জরিত আমি যে চোখ হতে নেমে আসা এক ফোঁটা জলের ন্যায়।]

মির তাকি মির ও তাঁর গজলের বৈশিষ্ট্য

মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতা মির আব্দুল্লাহ একজন সুফি ও দরবেশ ছিলেন। পূর্বপুরুষ আরবের হিজাজ হতে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

---

৬৬. মির হাসান বলেন:

دیوانش اگر چہ مختصر است۔ لیکن کلام حافظ سراپا انتخاب۔

[তাঁর দিওয়ান যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু সবটুকুই হাফিজের কবিতা থেকে চয়ণকৃত] (পাল, ১৯৬২: ৯৯)

মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০খ্রি.) উর্দু ও ফারসি ভাষায় অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধি উর্দু গজল রচনার জন্যই। গজল রচয়িতা হিসাবে তিনি ছিলেন উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর গজল কবিতা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সহজ-সরল আর ভাব হলো ব্যঞ্জনাময়। এসব গজল কবিতায় ফুটে উঠেছে দুঃখ-কষ্ট, প্রেমাস্পদকে না পাওয়ার বিরহ। মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.)কে উর্দু কাব্যের শেখ সাদিও (১২১০-১২৯১ খ্রি.) বলা হয়।

উর্দু গজলের বড় বৈশিষ্ট্য হলো এতে দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট বাক্য ও সংলাপ এবং প্রেমাস্পদের সাথে অস্পষ্ট বাক্যালাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তীকালে নাদির শাহ (১৬৮৮-১৭৪৭ খ্রি.) এবং ইংরেজদের আক্রমণে দিল্লি উজাড় হলে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে লাক্ষ্ণৌ ভিত্তিক কাব্যচর্চায় স্বল্প সময়ের জন্য গজল তার এ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। সাআদাত ইয়ার খান রঙ্গিন (১৭৫৭-১৮৩৫ খ্রি.)সহ অনেকেই রিখতি (ریختی) নামে অসংলগ্ন, কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গজলকাব্য রচনা করলে উর্দু গীতিকাব্যের সৌন্দর্যে খানিকটা ভাটা পড়ে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কবিদের সুদৃঢ় প্রয়াসে গজলকাব্য পুনরায় তার হৃতগৌরব ফিরে পায়। ফারসি ভাবাপন্ন উর্দু গজল আজও পাঠক-শ্রোতার হৃদয়ে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম।

মুমিন খান মুমিন ও তাঁর গজলে ফারসি উপাদান

গজল-এর মূল অর্থ তাগাযযুল (تغزل) বা নারীর সাথে কথা বলা। এ দক্ষতা সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন মুমিন খান মুমিন (১৮০০-১৮৫১ খ্রি.)। মুমিন ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ হাকিম বা চিকিৎসক ছিলেন। সে সুবাদে মুমিন (১৮০০-১৮৫১ খ্রি.) চিকিৎসাবিদ্যা বা হাকিমি চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন উপমহাদেশের বিখ্যাত হাদিস বিশারদ শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলাভির (১৭৪৫-১৮২৩ খ্রি.) নিকট। তা ছাড়া তিনি একজন প্রাজ্ঞ জ্যোতির্বিদও ছিলেন। শতরাঞ্জ আর দাবা খেলায়ও বেশ পারদর্শী ছিলেন। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাত্র ৫১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুমিন (১৮০০-১৮৫২ খ্রি.) ফারসি গজলের অনুকরণে উপমা ও তাশবিহ, রূপক আর মাজাজি বাক্য ব্যবহার করে উর্দু গজল কবিতাকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে নিয়ে যান। কথিত আছে দিল্লির অনিন্দ সুন্দরী এক পর্দানশীলা মুসলিম নারীর সাথে তাঁর প্রেম ছিলো। সেই প্রেমের কথাকেই তিনি তাঁর গজলে তুলে এনেছেন এক উপজীব্য বিষয় করে। (সাকসেনা, ১৯৫২: ৩০৫)

মুমিন কোথাও কোথাও সাবলীল ও প্রাঞ্জল বাক্য ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও কোথাও এমন বাক্য ব্যবহার করেছেন যে, কবিতার মূল মর্মার্থ বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুমিন (১৮০০-১৮৫২ খ্রি.) তাঁর রচিত গজলে প্রেমিকার সাথে এভাবে কথা বলতেন যে, মনে হয় তিনি প্রেমিকার উপকারার্থে কথা বলছেন কিন্তু একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় এটা মুমিনের (১৮০০-১৮৫২ খ্রি.) প্রেমিকার সাথে কথা বলার বাহানা ছিলো। মুমিন বলেন:

غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف بھی غمزۂ غماز دیکھنا

(আজাদ, ১৯৫০: ৪২১)

[এ কবিতার মর্মার্থ হলো, প্রেয়সী আমার, তুমি মাহফিলে কেবল অন্যের দিকে তাকিয়ে থাক। মাঝে মাঝে আমার দিকেও তাকিও, না হয় আমাদের প্রেমের ভেদ অন্যের কাছে সন্দেহের কারণে প্রকাশ পেয়ে যাবে।]

মুমিন (১৮০০-১৮৫২ খ্রি.) গজল রচনাশৈলীকে এমন অনন্যমাত্রায় নিয়ে গেছেন যে, পরবর্তীসময়ের গজল রচয়িতাগণ তাঁকে ইমামুল মুতাগাযযিলিন (গজল কবিতায় ভাষা ও অলংকারের শৈল্পিক ব্যবহারে প্রাজ্ঞ) খেতাবে ভূষিত করেন।

মির দরদ (১৭২০-১৭৮৪ খ্রি.) এবং মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.)-এর দেখানো পথে পরবর্তীকালে ফারসি গীতিকাব্যের অনুসরণ করে উর্দু অনেক কবি-সাহিত্যিক গজল রচনা করেছেন। তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন হায়দার আলি আতিশ (১৭৭৭-১৮৪৭ খ্রি.), মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.), নাওয়াব মির্জা খান দাগ দেহলভি (১৮৩১-১৯০৫ খ্রি.), আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.), হাসরাত মুহানি (১৮৭৮-১৯৫১ খ্রি.), জিগার মুরাদাবাদি (১৮৯০-১৯৬০ খ্রি.), ফিরাক গৌরাখপুরি (১৮৯৬-১৯৮২ খ্রি.), ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (১৯১১-১৯৮৪ খ্রি.), কাতিল শিফায়ি (১৯১৯-২০০১ খ্রি.), পারভিন শাকের (১৯৫২-১৯৯৪ খ্রি.) এবং সৈয়দ জোন এলিয়া (১৯৩১-২০০২ খ্রি.) প্রমুখ।

বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক উর্দু ভাষায় গজল ও গীতিকাব্য রচনা করছেন। আজও সে সকল উর্দু গজল পাঠক মহলে সাড়া জাগায়; যাতে ফারসি ভাষার প্রভাব ও ফারসি শব্দসম্ভার বেশি রয়েছে।

উর্দু সাহিত্যে কাসিদা

ফারসি কাব্যরীতি থেকে আগত উর্দু ভাষার আরেকটি কাব্য রীতি হলো কাসিদা (قصیدہ)। কাসিদা (قصیدہ) অর্থ অভীষ্ট লক্ষ্য বা যা ইচ্ছা করা হয়েছে এমন। পরিভাষায় কাসিদা (قصیدہ) কবিতার এমন ধরনকে বলে, যেখানে কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কারো প্রশংসা করা হয়। কাসিদা (قصیدہ) মূলত আরবি শব্দ এবং আরবি একটি কাব্যরীতির নাম। আরবি ভাষা থেকে এ কাব্যরীতিটি ফারসি ভাষায় আসে এবং ফারসি ভাষার হাত ধরেই উর্দু ভাষায় তা প্রবিষ্ট হয়। তবে আরবি কাসিদাগুলোতে (قصیدہ) লৌকিকতা এবং লোক দেখানো মানসিকতা বিদ্যমান নেই। কাসিদা (قصیدہ) ফারসি ভাষায় এসে এর স্বকীয়তা হারায় এবং অনেক ক্ষেত্রে কাসিদা (قصیدہ) কেবল মিথ্যা আর অসত্য স্তুতির সমাহারে পরিণত হয়। কাসিদা (قصیدہ)কবিতা এই বৈকল্য নিয়েই ফারসি থেকে উর্দু ভাষায় আসে। (নিগার, ১৯৯৫ : ১০০)

বিষয়-বৈচিত্রের আলোকে কাসিদা

বিষয়-বৈচিত্র্যের আলোকে কাসিদা (قصیدہ) দু'প্রকার। ১.মাদাহিয়্যা (مدحیہ) বা প্রশংসামূলক কাসিদা। ২.হিজুভিয়্যা (ہجویہ) বা সমালোচনামূলক কাসিদা যাকে ব্যঙ্গকাব্যও বলা হয়। আর কাঠামোগত দিক থেকে কাসিদা (قصیدہ) মোট চারটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। যথা, তাশ্‌বিব (تشبیب) , গুরিজ (گریز) , মাদাহ (مدح) ও দোয়া (دعا)

১. তাশ্‌বিব (تشبیب), যার অপর নাম নাসিব বা তাগাযযুল। এটি কাসিদার প্রথম অংশ বা ভূমিকা। সাধারণত কাসিদার এ অংশে প্রেমাস্পদের প্রশংসা, তাঁর সৌন্দর্যের বিবরণ, প্রকৃতির বর্ণনা, নিজের বড়ত্ব, পৃথিবীর ক্ষণাস্থায়ীত্বের বর্ণনা আন্তর্ভুক্ত থাকে। এ অংশটিই মূলত প্রশংসাভাজন ব্যক্তি ও শ্রোতার উপর মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

২. গুরিজ (گریز) হলো কাসিদার দ্বিতীয় অংশ। এটি কাসিদার ভূমিকা ও মূল অংশের মাঝখানের একটি বা দু'টি পঙ্‌ক্তি। এই পঙ্‌ক্তিবিশেষের মাধ্যমে কবি ভূমিকা হতে প্রশংসায় চলে আসেন। যেমন কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) তাঁর এক বিখ্যাত কাসিদায় চাঁদকে বলছেন; হে চাঁদ, তুমি ঝুঁকে ঝুঁকে কাকে সালাম করছো? তারপর নিজেই জবাব দিচ্ছেন, তুমি জাননা, তুমি কাকে সালাম করছো? মহাসম্মানের অধিকারী বাহাদুর শাহ জাফরকে (১৭৭৫-১৮৬২ খ্রি.) তুমি সালাম করছো। বাহাদুর শাহ জাফর (১৭৭৫-১৮৬২ খ্রি.)-এর নাম আসার সাথে সাথেই কবি তাঁর প্রশংসার অবতারণা করেন। মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) বলেন:

ہاں مہ نو! سنیں ہم اس کا نام　　جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام

تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن　　نام شاہنشہ بلند مقام

قبلہ چشم و دل بہادر شاہ مظہر　　ذوالجلال والاکرام

[হে নতুন চাঁদ, আমরা শুনতে চাই তাঁর নাম। যাঁকে তুমি ঝুঁকে পড়ে করছো সালাম? তুমি মনে হয় জাননা, তাহলে আমার কাছে শোনো, নাম তাঁর শাহেন শাহ মহা সম্মানের অধিকারী। আমার হৃদয় ও চোখের কেবলা-মণি। মহা সম্মানের অধিকারী, করুনাময় আল্লাহ তাআলার নিদর্শন বাহাদুর শাহ।]
(নিগার,১৯৯৫: ৫৯)

উপরিউক্ত কবিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি হলো গুরিজ (گریز)। উর্দু পরিভাষায় এটিকে তাখাল্লুস (تخلص) বা হুসনে তাখাল্লুস (حسن تخلص) বলে অভিহিত করা হয়। তাখাল্লুস (تخلص) শব্দের অর্থ হলো ভণিতা বা কবি নাম।

৩. কাসিদা (قصیدہ) -এর মূল বিষয় হলো মাদাহ (مدح) বা প্রশংসা। উর্দু ও ফারসি কাসিদায় (قصیدہ) প্রশংসিত ব্যক্তি কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হলে কাসিদা (قصیدہ) রচনার উদ্দেশ্য আপন পির (ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব) থেকে ফয়েজ তথা আত্মিক প্রেরণা ও বরকত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর প্রশংসিত ব্যক্তি যদি বাদশা বা দরবারি ব্যক্তি হন, তবে অর্থ ও পুরস্কার প্রাপ্তিই এ প্রশংসার মূল উদ্দেশ্য।

কাসিদা (قصیدہ) প্রশংসিত ব্যক্তির গুণাগুণকে সামনে রেখে রচিত হয়না; বরং সমাজে প্রশংসিত ব্যক্তির অবস্থান, মান-মর্যাদা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়। তাই বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করে উর্দু কাসিদা (قصیدہ) কয়েক ধরনের হয়। ১. রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে রচিত কাসিদা, ২. রাজসভার মন্ত্রী-উজিরদের উদ্দেশ্যে রচিত কাসিদা, ৩. নাওয়াব বা জমিদারদের উদ্দেশ্যে রচিত কাসিদা ও ৪. ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের উদ্দেশ্যে রচিত কাসিদা।

৪. সমাপনি বক্তব্য ও দোয়া (دعا)। এ অংশে কবি প্রশংসাভাজনের জন্য দোয়া করে থাকেন। এই দোয়া প্রশংসাভাজন চিরঞ্জিব হওয়ার। অনেক সময় কাসিদা (قصیدہ)- এর শেষভাগে প্রশংসাভাজন ব্যক্তির শত্রুদের অভিম্পাদ দেওয়া হয়, যার ব্যবহার খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। (নাকভি, ২০০৪ :৩১)

উর্দু কাসিদা ও তার মূল উপাদান

উর্দু কাসিদাকাব্য রচনার মূলভিত্তি হলো ফারসি কাসিদাকাব্য। এ সম্পর্কে *দাকান মে উর্দু* গ্রন্থের লেখক জনাব নাসিরুদ্দিন হাশেমি (মৃত্যু ১৯৬৪ খ্রি.) তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, উর্দু কাসিদার মূল ভিত্তি হলো ফারসি কাসিদা। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উর্দু কাসিদার সকল বিষয় ও রীতি-পদ্ধতি ফারসি কাসিদা থেকে আহরিত হয়েছে। জনাব নাসিরুদ্দিন হাশেমি (মৃত্যু, ১৯৬৪) বলেন,

> اردو قصائد کی بنا فارسی پر قائم ہوئی ہے۔ اس لیے جو لوازم فارسی قصائد کے ہیں وہی اردو قصائد میں نظر آتے ہیں۔
>
> تمہید، گریز، مدح و تعریف اور دعا قصیدے کے اجزا ہوتے ہیں۔

(হাশিমি ১৯৩৯: খণ্ড ৫, পৃ,৩১।)

[উর্দু কাসিদাকাবেসমূহের মূলভিত্তি হলো ফারসি কাসিদাকাব্য। এ কারণে ফারসি কাসিদাকাব্যের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় উর্দু কাসিদাকাব্যে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ভূমিকা, উপসর্গ, প্রশংসা এবং দোয়াসহ ফারসি কাসিদাকাব্যের মূল উপাদানগুলো উর্দু কাসিদাকাব্যে দৃষ্টিগোচর হয়।]

উর্দু কাসিদার ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট

ইরানে কাসিদাচর্চার ইতিহাস প্রায় চারশ বছরের। এর সূচনা যুগান্তকারী কবি রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.)-এর মাধ্যমে হয়েছে বলে অনুমিত হয়। কবি রুদাকি ছিলেন সামানি যুগের[৬৭]একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অন্ধকবি। সামানি রাজ দরবারে তিনি ছিলেন সমাদৃত। কাসিদা রচনায় কবি রুদাকি ছিলেন অনন্য। রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.)-এর হাত ধরে ফারসি কাসিদা অনেক দূর এগিয়ে যায়। তারপর মাজদুদ্দিন আবুল হাসান মারভাযি (৯৫২-১০০২ খ্রি.), আবুল কাসেম উনসুরী (৯৬১-১০৪০ খ্রি.), আহমদ মানুচেহরি (মৃত্যু ১০৪০খ্রি.) প্রমুখের চেষ্টায় কাসিদা কাব্যের রূপ-মাধুর্য আরো বৃদ্ধি পায়। নাসের খসরু (১০০৩-১০৯০ খ্রি.) আর মুহাম্মদ ইবনে আলি আনোয়ারি (মৃত্যু ১১৮৬ খ্রি.)-এর হাতে এসে কাসিদা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। খাকানি শিরওয়ানি (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.), মুসলেহ উদ্দিন শেখ সাদি শিরাজি (১২০৭-১২৯১ খ্রি.) কাসিদাকাব্যকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যান। ভারতবর্ষে ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.)ও কাসিদাকাব্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন।

উপমহাদেশের সাহিত্যপ্রেমীগণ দক্ষিণ ভারতে আগত ফারসি কবিদের মাধ্যমেই কাসিদাকাব্যের ধারনা পান। উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি কুতুব শাহি সম্রাট কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) ইরানি কবিদের অনুসরণে কাসিদা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কাসিদায় ফারসি কবি উনসুরি (৯৬১-১০৪০ খ্রি.), আনোয়ারি (মৃত্যু ১১৮৬ খ্রি.) , খাকানি (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) এবং নিজামির (১২০৯-১২৭২ খ্রি.)-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) তাঁর কবিতাকে পারস্যের বিখ্যাত কাসিদাকাব্য রচনাকারী খাকানির (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) কাব্যের সাথে তুলনা করেছেন। কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) বলেন:

نزاکت شعر کے فن میں خدا بخشا ہے تجکو معانی شعر تیرا ہے کہ یا ہے شعر خاقانی

(জুর, ১৯৪০: ৪২)

[কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) এই কাসিদায় নিজেই নিজের প্রশংসা করে বলছেন, তোমাকে কাসিদাকাব্য রচনার এক অনন্য ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। কাব্যের ভাবার্থ তো তোমার কিন্তু কবিতাটি বিখ্যাত কবি খাকানির (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) বলে মনে হয়।]

উর্দু কাসিদার উন্নয়নে মুহাম্মদ কুলি কুতুব (১৪৬৫-১৫১১ খ্রি.)

মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) যেমন ছিলেন একজন উর্দু কবি তেমন একজন সফল পৃষ্ঠপোষক। তাঁর শাসনামলে (১৫৮০-১৬১১ খ্রি.) তিনি বহু উর্দু কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি উর্দু সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে ফারসি কাব্যরীতির প্রায় সবকটি কাব্যরীতিই উর্দু ভাষায় ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সভাকবিদের মাঝে ইবনে নাশাতি (মৃত্যু.১৬৫৩), গাওয়াসি (মৃত্যু ১৬৫৬), মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৫-১৬৫৯ খ্রি.), নুসরাতি (মৃত্যু ১৬৭৪ খ্রি.)সহ সকলেই ফারসি কাসিদার আদলে উর্দু কাসিদাকাব্য

৬৭. সামানি সাম্রাজ্যের সময়কাল হলো ৮১৯ থেকে ৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এটি মধ্য এশিয়ার একটি সুন্নি পারস্য সাম্রাজ্য। প্রতিষ্ঠাতা সামানে খোদার নামানুসারে এর নাম করণ করা হয়েছে সামানি।

রচনা করেছেন। কিন্তু উর্দু কাব্যসাহিত্যের প্রাথমিক যুগের কাসিদাগুলো মান-বিচারে পূর্ণমাত্রায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।

উর্দু কাব্যে ফারসি কাসিদার উপাদানগত প্রভাব

উর্দু কাসিদা ফারসি কাসিদা থেকে সকল উপাদান আহরণ করেছেন। ফারসি ভাষায় রচিত কাসিদাকাব্য গ্রন্থগুলোতে যেভাবে সূচনাতে হামদে বারি, নাতে রাসুল, সাহাবাদের মানকাবাত তথা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, নবি স্তুতি ও নবি সহচরদের মান-মর্যাদার কথা আলোচনায় এসেছে; উর্দু কাসিদাকাব্য গ্রন্থগুলোতেও এর হুবহু অনুসরণ-অনুকরণ করা হয়েছে। উর্দু কাসিদাকাব্যের সূচনা কবি কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.), মোল্লা গাওয়াসি (মৃত্যু, ১৬৫৬ খ্রি.), মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.), নুসরাতি (মৃত্যু, ১৬৭৪ খ্রি.) থেকে শুরু করে মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ও মুহাম্মদ ইব্রাহিম জওক (১৭৯০-১৮৫৪ খ্রি.)সহ সকলের রচিত কাসিদায় এই অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়।

উর্দু ভাষায় কাসিদাকাব্য রচনার ভিত মজবুত হয় কবি অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) হাতে। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি ভাষার আদলে কাসিদাকাব্য রচনা করেন। এ রচনায় তিনি ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত উপমা-উৎপ্রেক্ষা, ফারসি শব্দের বাহ্যিক ও রূপক ব্যবহার আর অলংকারে উর্দু ভাষার কাসিদাকাব্যকে প্রাঞ্জল করে তোলেন।

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) সময়কালে কাসিদাকাব্য রচনার তেমন কোনো দৃষ্টান্ত উর্দু কাব্যজগতে দেখা যায় না। তবে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) নিজে কাসিদাকাব্য রচনা করেছেন এবং তাঁর কাসিদা রচনার পারঙ্গমতায় নিজেই নিজের প্রশংসায় আপ্লুত হয়েছেন। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) নিজের কাসিদাকাব্যের প্রশংসায় বলেন,

یقین ہے مجھ کو یہ قصیدہ رنگین سنیں تو وجد کریں انوری و خاقانی

(নিগার ১৯৯৫: ১১০)

[অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) স্বীয় কাসিদার প্রশংসা করে বলেন: আমার বিশ্বাস আমার এ কাসিদা অতি উঁচু স্তরের। আমার এ কাসিদা শোনামাত্রই পারস্যের বিখ্যাত কবি আনোয়ারি (মৃত্যু ১১৮৬ খ্রি.) ও খাকানি (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) উল্লাস প্রকাশ করবে।]

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) রচিত কাসিদায় এ কথাটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যে, অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) যুগে পারস্যের বিখ্যাত কাসিদা লেখক আনোয়ারি (মৃত্যু ১১৮৬ খ্রি.) আর খাকানির (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) কাসিদাকাব্য উপমহাদেশের উর্দুভাষী পাঠক মহলে সমাদৃত ছিলো।

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) দেখানো পথে শাহ নাজমুদ্দিন আবরু (মৃত্যু,১৭৪৭ খ্রি.), মুহাম্মদ শাকের নাজি (মৃত্যু, ১৭৪৭ খ্রি.), শরফুদ্দিন মাজমুন (মৃত্যু, ১৭৩৪ খ্রি.)সহ অনেকেই কাসিদাকাব্য রচনা

করেছেন; কিন্তু সাহিত্যের বাচবিচারে তা ফারসি কাসিদাকাব্যের সমতুল্য ছিলো না। তাই পাঠক মহলে এ সকল কাসিদা তেমন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি।

উর্দু সাহিত্যের কাসিদা সম্রাট

উর্দু সাহিত্যজগতে কাসিদা লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.)। যে কারণে সাওদাকে (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের কাসিদা সম্রাট বলা হয়। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন কাবুলের অধিবাসী। সাওদা ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। সাওদার (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিলো এবং তাঁর কাব্যচর্চার খাতেখড়িও ফারসি ভাষায়। ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি সিরাজুদ্দিন আলি খান আরজুর (মৃত্যু ১৭৫৫ খ্রি.) পরামর্শক্রমে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) উর্দু ভাষায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন এবং কাসিদাকাব্য রচনায় উর্দু কাব্যজগতের অদ্বিতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন।

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.)কে ফারসি সাহিত্যের কাসিদা সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে আলি আনোয়ারি (মৃত্যু ১১৮৬ খ্রি.) ও খাকানি শিরওয়ানি (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.)-এর সাথে তুলনা করা হয়। সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) তৎকালে উর্দু সাহিত্যে প্রচলিত হিন্দি শব্দমালার স্থলে নতুন নতুন সাযুজ্যপূর্ণ ফারসি শব্দমালা ব্যবহারের পথ দেখান। এছাড়া তিনি ফারসি ধারা অনুযায়ী নতুন নতুন ছন্দের ব্যবহারেও কাব্যরস সৃষ্টিতে উর্দু সাহিত্যে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন।

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.)- এর কাসিদাকাব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো উর্দু ভাষায় অভিনব ফারসি শব্দের ব্যবহার। তিনি সূক্ষ্ম অর্থপূর্ণ উপমা ও রূপক উক্তির মাধ্যমে এভাবে নুতন নতুন ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন যে, পূর্বাপর বাক্য থেকে তার মর্মার্থ সহজেই উপলব্ধি করা যেত। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ ভঙ্গিমা ছিলো প্রবল। কাউকে সমালোচনা করলে বাক্যবাণে জর্জরিত করে ছাড়তেন।(ইউসুফ, ১৯৬৮: ৭৭)

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) উর্দু কাসিদাকাব্যকে ফারসি কাসিদাকাব্যের ঢঙ্গে সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাসিদাকাব্যে কথোপকথন তথা উপস্থাপনের ঢঙ্গ ফারসি কাসিদাকাব্যের একটি প্রসিদ্ধ পদ্ধতি। সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) তাঁর এক কাসিদায় খুশি বা আনন্দ শব্দের সাথে কথোপকথনের নাটকীয়তা তুলে ধরেন এভাবে,

فجر ہوتے جو گئی آج مری آنکھ جھپک دی وہیں آ کے خوشی نے در دل پر دستک
پوچھا میں کون ہے بولی کہ میں وہ ہوں غافل نہ لگے شوق میں جس کے کبھو شائق پلک
ہے خوشی نام مرا میں عزیز دلہا زندگانی کی حلاوت ہے جہاں میں مجھ تک
کھول آغوش دل اور لے مجھے جلدی ناداں پھر خدا جانے یہ دن کب تجھے دکھلائے فلک

(নিগার, ১৯৯৫: ১১৭)

[নওয়াব আসিফুদ্দৌলা (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.)[৬৮]- এর জন্মদিনের প্রশংসায় কাসিদাকাব্য রচনা করে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) বলেন: [ভোরবেলায় আনন্দ এসে আমার ঘুম ভাঙ্গালো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? উত্তরে সে বলল, গাফেল, আমি তো সেই যার কাছ থেকে এক পলকের জন্যও সুখ আলাদা হয় না। আনন্দ আমার নাম। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি সুখ অনুভব করি। তারপর আনন্দ বলল: আরে বোকা, হৃদয় খুলে আমাকে গ্রহণ কর, এরপর আল্লাহ জানে কখন আবার তোমাকে দিগন্ত এ আনন্দের ঝলক দেখাবে?]

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.)-এর দেখানো পথে কবি গোলাম হামদানি মুসহাফি (১৭৫১-১৮২৪ খ্রি.), মুহাম্মদ ইব্রাহিম জওক (১৭৯০-১৮৫৪ খ্রি.), মুমিন খান মুমিন (১৮০০-১৮৫১ খ্রি.), আসাদুল্লাহ খান গালিবসহ (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) অনেকেই উর্দু ভাষায় কাসিদাকাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) কাসিদাকাব্যকে সাহিত্যের যে মাত্রায় নিয়ে গেছেন, অন্য কোনো উর্দু কবি কাসিদাকাব্যকে সে মাত্রায় নিয়ে যেতে সক্ষম হননি। তাই উর্দু কাসিদাকাব্যে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) এক অদ্বিতীয় নাম।

রুবায়ি কবিতা

ফারসি কাব্যরীতির আরেক প্রকারের কবিতা হলো রুবায়ি (*رباعی*)। রুবায়ি (*رباعی*) শব্দটি আরবি রুবা শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো চারচরণ বিশিষ্ট বা চৌপদি কবিতা। পরিভাষায় রুবায়ি (*رباعی*) এমন কবিতাকে বলা হয় যার চারটি চরণ বা পঙ্‌ক্তি থাকে। রুবায়ি (*رباعی*) কবিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল অত্যাবশ্যক। আর তৃতীয় পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল ইচ্ছাধীন। উর্দু ভাষায়ও এ ধরণের কবিতা রচিত হয়।

বিষয় বস্তু ও ছন্দের দিকে লক্ষ্য করে অনেক সময় উর্দু পরিভাষায় রুবায়ি (*رباعی*) কবিতাকে কিতা (*قطعہ*) বা তারানা (*ترانہ*) নামে আখ্যায়িত করা হয়। ড. আহমদ তামীমদারীর মতে ফারসি ভাষায় সর্বপ্রথম রুবায়ি (*رباعی*) ছন্দের ব্যবহার করেছেন বিখ্যাত কবি রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.)। (তামীমদারী, ২০০৭: ১৪১)

রুবায়ি কবিতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ফারসিকাব্যের প্রাণ পুরুষ রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.) রুবায়ি ছন্দ ব্যবহার করে মূলত প্রেমধর্মী কবিতা রচনা করেছেন। তবে রুবায়ি ছন্দে মরমি কবিতা লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি আবু সাঈদ আবিল খাইর (৯৬৭-১০৪৯ খ্রি.)। তাঁর পুরো নাম আবু সাঈদ ফজলুল্লাহ বিন

৬৮. নওয়াব আসিফুদ্দৌলা (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.) ছিলেন একজন উর্দু কবি ও পৃষ্ঠপোষক। দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকা অযোদ্ধার শাসক। মোঘলদের বাৎসরিক কর দিয়ে স্বাধীনভাবে তিনি অযোদ্ধা শাসন করেছেন।

আবু সাঈদ আবুল খাইর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম। পিতা একজন ভেষজ চিকিৎসক ছিলেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

কবি আবু সাঈদ আবিল খাইর (৯৬৭-১০৪৯ খ্রি.) হলেন ফারসি রুবায়ি মরমি কবিতার সম্রাট। তিনি মনে করতেন, মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি সৃষ্টির সেবার মাঝে নিহিত। স্বরচিত কবিতা ছাড়াও অনেক প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিদের রচিত কবিতাও তিনি আবৃত্তি করতেন। প্রখ্যাত সুফি বায়জিদ বোস্তামি (৮০৪-৮৭৪ খ্রি.) ও মনসুর আল হাল্লাজ (৮৫৮-৯২২ খ্রি.)-এর তিনি ভক্ত ছিলেন।

কবি আবু সাঈদ আবিল খাইর (৯৭৬-১০৪৯ খ্রি.)-এর সুফিদর্শন ভারতসহ বিশ্বের নানা স্থানে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। বিখ্যাত ফারসি কবি উমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খ্রি.) মরমি চিন্তাধারার রুবায়ি রচনা করে ফারসি রুবায়িকে কাব্যজগতের একটি প্রয়োজনীয় ছন্দে পরিণত করেন।

এ সময়ের পারস্যের আরেকজন বিখ্যাত কবি শেখ আবু আব্দুল্লাহ আনসারি (১০০৬-১০৮৮) রুবায়িকাব্য রচনা করে এ ছন্দের ভিত আরো মজবুত করেন। বাবা তাহের উরইয়ান (১০১৯-১০৯৪ খ্রি.)-এর বিলাপ কবিতা রুবায়ি ছন্দকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। রুবায়িছন্দ হয়ে উঠে সকলের কাছে সমাদৃত। রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.) রুবায়ি ছন্দে কবিতা রচনার যে পথ দেখিয়ে ছিলেন কবি আবু সাঈদ আবিল খাইর (৯৭৬-১০৪৯ খ্রি.) সে পথকে আরো বিস্তৃত করেছেন। কবি ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) ও মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) সে পথের অগ্রদূত হয়ে গোটা বিশ্বকে আলোকময় করেছেন। তবে শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) আর মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) কেবল রুবায়ি নয়; বরং ফারসি ভাষার প্রতিটি ছন্দে নিজেদের কালজয়ী পারঙ্গমতা ও দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফারসি রুবায়ি কবিতায় সবচেয়ে বেশি মরমি চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু কাব্যজগৎ যেহেতু ফারসি কাব্যজগৎ দ্বারা আলোকিত ও প্রভাবিত, তাই উর্দু কাব্যে মরমি আর অধ্যাত্মবাদের চিন্তা এসেছে ফারসি রুবায়ি আঙ্গিকের কবিতা ও এর মরমি ভাবধারা থেকে। কেবল উর্দু কাব্যই নয়; বরং উপমহাদেশে প্রচলিত প্রতিটি ভাষায় মরমি ভাবের ও চেতনার মূল উৎস হলো ফারসি রুবায়ি কাব্য।

ড. আবদুল হক বলেন: 'রুবায়ি ছন্দটি পারস্যের বিখ্যাত কবি রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.)-এর আবিস্কার। তিনি একটি শিশুর বুলি আওড়ানো থেকে এ ছন্দটি আবিস্কার করেছেন।' (হক, ১৯৬১: ৮৭)
রুদাকি (৯০০-৯৪০ খ্রি.)-এর পর পারস্যের অন্যান্য কবি এ ছন্দটির বিপুল ব্যবহার করেন। এক পর্যায়ে কাবুল-মুলতানের পথ ধরে ফারসি কবিদের সাথে এ ছন্দটি দক্ষিণ ভারতে আসে।

রুবায়ির ছন্দরীতিটি হলো মাফউলু মাফাইলুন মাফাইল ফাআল مفعول۔مفاعلن۔مفاعل فعل। এ ছন্দরীতিটির মাঝে সংযোজন-বিয়োজন (اخرب۔اخزم) করে উর্দু কবিগণ প্রায় ২৪ টি ছন্দ রুবায়ির জন্য নির্ধারণ

করেছেন। রুবায়ি রচনায়ও আমরা উর্দু কাব্যের সূচনা কবি বাবায়ে রিখতা মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহকে (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) সবাগ্রে দেখতে পাই। (হক, ১৯৬২ : ৮৭)

মুহি উদ্দিন কাদেরি জুর (১৯০৪-১৯৬২ খ্রি.) তাঁর সম্পাদিত *সুলতান কুলি কুতুব শাহ* (سلطان قلی قطب شاہ) গ্রন্থে সম্রাট কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর বেশ কিছু রুবায়ি উল্লেখ করেছেন। তবে এ সকল রুবায়ি কবিতা পাঠের আলোকে আমরা সম্রাট কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)কে ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি হাফিজ (১৩১০-১৩৯০ খ্রি.)-এর রুবায়ি কবিতার সার্থক অনুবাদক বলতে পারি।

উর্দু সাহিত্যের সূচনা যুগে কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) হাফিজ (১৩১০-১৩৯০ খ্রি.)-এর রুবায়িগুলোকে একই ছন্দে অনুবাদ করে পরবর্তীকালের উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের জন্য নিজেকে একজন দিশারী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। বিখ্যাত ফারসি কবি হাফিজের (১৩১৫-১৩৯০ খ্রি.) একটি রুবায়ির নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

گفتم کہ لبت گفت لبم آب حیات　　گفتم دہنت گفت ز ھی حب نبات
گفتم سخن تو گفت حافظ گفتا　　شادی ہمہ لطیفہ گویان صلوات

(হাফিজ, ১৩৭৬ সৌ.: ৩৮৫)

কেবল নামের পরিবর্তন এনে সুলতান কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) হাফিজের রুবায়ির উর্দু অনুবাদ নিম্নরূপ:

کہیا ترے لب کیا ہیں، کہی آب حیات کہیا ترے لبدا، کہی حب نبات
کہیا بچن تیری، کہی قطب کی بات اس میٹھی لطافت پہ سدا ہے صلوات

(হক, ১৯৬১: ৮৮)

[জিজ্ঞেস করলাম তোমার ঠোঁট দুটি কেমন? উত্তরে সে বলল, আবে হায়াত (জীবন-সঞ্জীবনী সুধা)। বললাম তোমার ছলনা কেমন? বলল, শস্যদানার মতো। বললাম, তোমার বাচনভঙ্গি কেমন? বলল, কুতুব বা হাফিজের ন্যায়। এই মিষ্টি মুহূর্তগুলোতে সর্বদা দুরুদ পড়ি।]

কবি গাওয়াসি (মৃত্যু, ১৬৫৬ খ্রি.)ও ফারসি রুবায়ির অনুসরণ করে দক্ষিণ ভারতীয় উর্দু ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর রুবায়ি কাব্যেও ফারসি শব্দ চয়নের সাথে সাথে আঞ্চলিকতার প্রভাবও বিরাজমান ছিলো। যেমন কবি গাওয়াসি (মৃত্যু, ১৬৫৬ খ্রি.) তাঁর রচিত এক রুবায়ি কাব্যে বলেন:

اے عقل تجھے رفیق دانا ہونا ہے اے عشق تجھے یار دیوانا ہونا ہے
میں مست ہوں دن رات منجے جام ہورنے محبوب وترانا ہونا

(গাওয়াসি, ১৯৫৯: ১৭৭)

[হে আকল, তোমাকে বন্ধু চিনতে হবে। হে ইশক, তোমাকে প্রেমাস্পদের জন্য পাগলপারা হতে হবে। আমি ব্যাকুল হয়ে আছি দিন-রাত, আমার শরাবে বুদ হয়ে গেলে কল্পনায় আমি প্রেমাস্পদের গান শুনবো।]

কবি মনিরুদ্দিন ইউসুফ তাঁর রচিত *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে গাওয়াসি (মৃত্যু, ১৬৬৫ খ্রি.) সম্পর্কে বলেন: 'তিনি সম্রাট কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)- এর ঢঙ্গ অনুসরণ করে কবিতা লিখতেন'। (ইউসুফ, ১৯৬৮ : ৩৫)

কবি গাওয়াসি (মৃত্যু, ১৬৬৫ খ্রি.) কাব্য রচনায় সম্রাট কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)-এর অনুসরণ করলেও আপন প্রতিভায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) যেহেতু তৎকালে ফারসি কাব্যরীতিকে সামনে রেখে উর্দু কাব্যচর্চা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন; তাই উর্দু ভাষার এই শৈশবকালে শুধু গাওয়াসিই (মৃত্যু আনুমানিক ১৬৫৬ খ্রি.) নন; বরং ইবনুন নাশাতি (আনুমানিক ১৬২৫-১৬৭৪ খ্রি.), মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৫-১৬৫৯ খ্রি.) নুসরাতিসহ (মৃত্যু, ১৬৮৩ খ্রি.) সকল উর্দু কবিরই ফারসি কবিদের অনুসরণ ও অনুকরণ ছাড়া গত্যান্তর ছিলো না।

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.)-এর মাধ্যমে উর্দু ভাষায় রুবায়িকাব্য আরো ব্যাপকতা লাভ করে। রুবায়ি রচনা ক্ষেত্রে সম্রাট কুলি কুতুব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)কে যদি উর্দু সাহিত্যের প্রথম যুগের রাহবার বলা হয় তবে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) হলেন দ্বিতীয় যুগের কাণ্ডারি। এ ছাড়া অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসির প্রসিদ্ধ ছন্দগুলো উর্দু ভাষায় ব্যবহার করে অনুগামীদের জন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। দিল্লির কবি মির্জা মাজহার জানে জানা (১৬৯৮-১৭৮১ খ্রি.), মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.), মির তাকি মির (১৭২৩-১৮১০ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ রুবায়িকাব্যের মাধ্যমে উর্দু সাহিত্যের শোভা বর্ধন করেছেন। মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) উর্দু রুবায়ি রচনা করে তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন।

লাক্ষ্ণৌ ধারার কবি মির আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) ও দবির (১৮০৩-১৮৭৫ খ্রি.) উর্দু রুবায়িকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালি (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.), ইসমাঈল মিরাঠি (১৮৪৪-১৯১৭ খ্রি.), আকবর ইলাহবাদি (১৮৪৬-১৯২১ খ্রি.), আমির মিনাই (১৮২৯-১৯০০ খ্রি.), দাগ দেহলভি (১৮৩১-১৯০৫ খ্রি.) উর্দু রুবায়িকে সর্বজনীন করেছেন।

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) উর্দু রুবায়িকে বিশ্বসাহিত্যে সমাসীন করেছেন । ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) ছিলেন একজন দার্শনিক মুসলিম কবি, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ। ফারসি ও উর্দু ভাষায় সমানতালে কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

তিনি ফারসি ভাষার প্রথাগত ছন্দগুলোকে নিপুণভাবে উর্দু কাব্যে ব্যবহার করে উর্দু সাহিত্যের মান বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। ফারসি ভাষার ছন্দরীতি, মরমিভাব-দর্শনসহ সাহিত্যের উপজীব্য প্রায় সকল বিষয়কে উর্দু ভাষায় প্রকাশ করে উর্দু ভাষার দীনতা দূর করেছেন। এ ছাড়া তিনি ভারতবাসীর কাছে ফারসি ভাষার বিকল্প হিসাবে উর্দু ভাষাকে উপস্থাপন করে এ ভাষার বিপুল সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বেশ কিছু কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। তিনি মূলত একজন মুসলিম চেতনা ও আদর্শবাদী কবি। ফারসি কবি হাফিজ (১৩১০-১৩৯১ খ্রি.), মোল্লা জামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.) এবং বিশেষ করে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) এর দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন।

ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)- এর কবিতার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো সহজবোধ্যতা। তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় নির্ধারিত সকল ছন্দেই কবিতা রচনা করেছেন। উর্দু রুবায়ির বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করে রুবায়িকে অনন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। তিনি তারানায়ে মিল্লি, তারানায়ে হিন্দিসহ অসংখ্য রুবায়ি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত রুবায়িকাব্য সাহিত্যানুগামীদের জন্য জন্য মাইল ফলক হিসাবে কাজ করেছে। ড. মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) রচিত রুবায়ি কবিতার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ترے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے ترا دم گرمیٔ محفل نہیں ہے
گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

(ইকবাল, ১৯৯৬ : ৩৭৬)

[হে মুসলিম, তোমার বক্ষে তো শ্বাস-প্রশ্বাস আছে। কিন্তু চেতনাবাহী সে হৃদয় নেই। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসে আজ আর সভা-সমাবেশ উষ্ণতা পায়না। তাই তুমি বিবেকের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে সামনে আগুয়ান হও। কারণ এ ঈমানদীপ্ত আলো তোমার বাড়ি নয়, এতো তোমার পথ চলার দিশা।]

উর্দু রুবায়িকাব্য রচনায় ড. আল্লামা ইকবাল ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর দেখানো পথে মাওলানা হাসরাত মুহানি (১৮৭৮-১৯৫১ খ্রি.), জোশ মালিহাবাদি (১৮৯৮-১৯৮২ খ্রি.), জিগার মুরাদাবাদিসহ (১৮৯০-১৯৬০ খ্রি.) অসংখ্য উর্দু কবি রুবায়িকাব্য রচনায় এগিয়ে এসেছেন।

বর্তমানকালে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে মুক্ত কবিতা (Free Verses) বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের (Blank Veses) কবিতার প্রচলন ঘটলেও উর্দু রুবায়ি কবিতা আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আছে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ গোটা বিশ্বের উর্দু কবিগণ আজও রুবায়ি ছন্দের ব্যবহারে যত্নশীল। বাংলাদেশের উর্দুর কবি আহমদ ইলিয়াস (জন্ম, ১৯৩৩ খ্রি.), সদ্যপ্রয়াত কবি জালাল আজিমাবাদি (১৯৫২-২০২১ খ্রি.), ভারতের হাফিজ দেওবন্দিসহ (জন্ম, ১৯৬২ খ্রি.) বিশ্বের অসংখ্য উর্দু কবি রুবায়িছন্দে কবিতা লিখে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে গতিশীল করছেন।

মারসিয়া কবিতা

ফারসি থেকে আগত উর্দু ভাষার আরেকটি কাব্যরীতি হলো মারসিয়া (مرثیہ) বা শোকগাথা। এর অর্থ মাতম করা, কান্না করা। মারসিয়া (مرثیہ) শব্দটি আরবি। পরিভাষায় মারসিয়া (مرثیہ) এমন কাব্যরীতি যেখানে কারো মৃত্যুর পর শোক প্রকাশার্থে তাঁর গুণাবলির উপর আলোকপাত করা হয়।

ইসলামধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে রাসুল (সা.) (৫৭০-৬১০ খ্রি.)-এর দাদা খাজা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল হলে তাঁর উপর যে কবিতা রচিত হয়েছিলো তা মারসিয়া (مرثیہ) নামে সুপ্রসিদ্ধ। রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)সহ অনেকেই রাসুল (সা.)-এর শানে মারসিয়া (مرثیہ) রচনা করেছেন বলে প্রমাণ মিলে।

বর্তমান সময়ে ফারসি ও উর্দু ভাষায় মারসিয়া (مرثیہ) বলতে এমন কাব্যরীতিকে বোঝায় যেখানে ইমাম হুসাইন (রা.) (৬২৬-৬৮০খ্রি.) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের কারবালার ময়দানে শহিদ হওয়ার ঘটনা বিধৃত থাকে।

ড. সুম্বুল নিগার বলেন: বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মারসিয়া (مرثیہ) কাব্যে আটটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। ১. তামহিদ বা চেহরা (تمہید یا چہرہ) । এ অংশটি মূলত মারসিয়ার ভূমিকা। ২.সারাপা (سراپا)। এ অংশে প্রার্থিত ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করা হয়। ৩. রুখসাত (رخصت)। এ অংশে প্রার্থিত ব্যক্তি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য যাত্রা শুরু করার কথা উল্লেখ থাকে। ৪. অমাদ (آمد)। এ অংশে প্রার্থিত ব্যক্তির যুদ্ধের ময়দানে আগমনের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ৫. রাজ্‌য (رجز)। এ অংশে প্রার্থিত ব্যক্তির পূর্বপুরুষদের খ্যাতি বর্ণিত হয়। ৬. রাজ্‌ম (رزم) হওয়া এবং যুদ্ধে প্রার্থিত ব্যক্তির বীরত্বের বর্ণনা করা হয়। ৭. শাহাদাত (شہادہ)। এ অংশে প্রার্থিত ব্যক্তি যুদ্ধে শহিদ হওয়ার হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ণনা থাকে। ৮. বিন (بین) বা বিলাপ। এ অংশে প্রার্থিত ব্যক্তি শহিদ হয়ে যাওয়ায় তাবুতে তাঁর মরদেহ আনার পর ক্রন্দনের বর্ণনার উল্লেখ থাকে। (নিগার, ১৯৯৫: ৪৭-৪৮)

মারসিয়া কবিতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মারসিয়া রচনার কিছু নমুনা আমরা ইরানের বিখ্যাত কবি মাজদুদ্দিন সানায়ি (মৃত্যু,১১৪০ খ্রি.)-এর রচিত *হাদিকাতুল হাকিকত* (حدیقۃ الحقیقۃ) নামক গ্রন্থে দেখতে পাই। ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) রচিত শাহনামায় রুস্তম-সোহরাব-এর কাহিনিতেও সোহরাব-এর মৃত্যুসংবাদ তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছার বর্ণিত

ঘটনায় মারসিয়ার নমুনা বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) রচিত *খসরু নামে* (خسرو نامہ) কাব্যগ্রন্থে কিছু মারসিয়া কাব্যের নমুনা পাওয়া যায় । শেখ সাদি শিরাজি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) এবং আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) মারসিয়াকাব্য রচনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতান মাহমুদ গাজনাভির (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) মৃত্যুতে কবি ফারখি শিস্তানি (মৃত্যু, ৪২৯ হি.) রচিত মারসিয়া আজো হৃদয়ে নাড়া দেয়। বিশেষ করে মোল্লা ওয়ায়েজ কাশিফি (১৪৩৬-১৫০৪ খ্রি.) বিরচিত মারসিয়া কাব্যের মাধ্যমে উর্দুসাহিত্যে ফারসি কাব্যরীতি মারসিয়া আঙ্গিকের কবিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। (হক,১৯৬৪ : ৯২)

ফারসি কবি মোল্লা মোহতাশাম কাশানি [৬৯] (১৫২৮-১৫৮৮ খ্রি.) ফারসি ভাষায় মারসিয়া রচনা করে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং এ ধারার কাব্য রচনায় তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সাফাভিও শাসনামলে (১৫০১-১৭৭৬ খ্রি.) ইরানে মারসিয়া সাহিত্যচর্চার আবহ সৃষ্টি হয়। কেননা সাফাভিও শাসকগণ শিয়া-সম্প্রদায়ের মুসলমান হওয়ার কারণে কারবালার ঘটনা ও বার ইমামদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার বিষয়ক কাব্যচর্চাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাধান্য দিতেন। এ সময় বেশ কয়েকজন কবি ফারসি ভাষায় মারসিয়াকাব্য রচনা করেছেন।

মোহতাশাম কাশানির (১৫২৮-১৫৮৮ খ্রি.) অনুকরণে ইরান ও ভারতবর্ষে যারা মারসিয়া রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে তালিব আমুলি (১৫৮৫-১৬৫৭ খ্রি.), কালিম কাশানি (১৫৮১-১৬৫১ খ্রি.), আব্দুল জাওয়াদ জাওদি খোরাসানি (মৃত্যু, ১৩০১ সৌ.) ও ভেসাল শিরাজি (১৭৮৩-১৮৪৬ খ্রি.) অন্যতম। এর পর মোল্লা মুকবিল ফারসি ভাষায় মারসিয়া রচনা করে মারসিয়া সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেন।

মোল্লা মোহতাশাম কাশানি (১৫২৮-১৫৮৮ খ্রি.) মারসিয়াকাব্য রচনায় কারবালার যে চিত্র তুলে ধরেছেন; মোল্লা মুকবিল সে চিত্রকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছেন। মোল্লা মুকবিলের মারসিয়ায় কারবালার পুরো ইতিহাস ফুটে উঠেছে।

কারবালার উদ্দেশ্যে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সফর আরম্ভ থেকে রাস্তার বর্ণনা, কারবালার ময়দানে পৌঁছা, হুসাইন (রা.) ও নবি (সা.)-এর পরিবারের সদস্যদের শহিদ হওয়ার ঘটনা, পুণরায় মদিনায় ফিরে আসা ইত্যাদি ইতিহাসের বর্ণনায় মোল্লা মুকবিল ছিলেন অনবদ্য। তাঁর রচিত মারসিয়ার পরতে পরতে কারবালার হৃদয়-বিদারক বর্ণনা চোখের সামনে ফুটে উঠে। তাই বলা যায় মোল্লা মোহতাশাম কাশানি

৬৯. পুরো নাম কামালুদ্দিন আলি মোহতাশাম কাশানি (১৫২৮-১৫৮৮ খ্রি.) । ইরানের সাফাভি শাসনামলে ১৫২৮ খিষ্টাব্দে কাশান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম খাজা মির আহমদ। যৌবনে তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন। তিনি কারবালার শহিদদের উপর ফারসি ভাষায় মারসিয়াকাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ধর্ম বিশ্বাসে তিনি একজন শিয়া-মুসলিম ছিলেন। ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মস্থান কাশানে মৃত্যুবরণ করেন।

(১৫২৮-১৫৮৮ খ্রি.) তাঁর মারসিয়াকে বিশ্বসাহিত্যে যে উচ্চ মার্গে নিয়ে গেছেন; মোল্লা মুকবিল সে পথ অনুসরণ করে মারসিয়া সাহিত্যকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান।

মারসিয়াচর্চা ও এর প্রয়োগ আরবি ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় আসে এবং ফারসি ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় এর প্রসিদ্ধি ঘটে। মারসিয়া কাব্যরীতি সম্পর্কে বিশিষ্ট উর্দু সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিক রাম বাবু সাকসেনা (১৮৯৫-১৯৫৭ খ্রি.) বলেন:

مرثیہ بہت پرانی چیز ہے عربوں میں یہ بیشتر سے موجود تھی۔ وہاں سے یہ اہل فارس میں آئی اور فارسی سے اردو میں اس نے رواج پایا۔

(রাম বাবু সাক্সেনা,১৯৫২: ২৯)

[মারসিয়া সাহিত্যের একটি প্রাচীনতম বিষয়। আরবি ভাষায় মারসিয়া সাহিত্যচর্চার ব্যাপকতা ছিলো। আরবি থেকেই এ ধারার সাহিত্য ফারসি ভাষায় আসে এবং ফারসি থেকেই উর্দু ভাষায় এর প্রচলন ঘটে।]

উর্দু ভাষায় মারসিয়া কাব্যচর্চা শুরু হয় দক্ষিণ ভারতে এবং এই মারসিয়া কাব্যচর্চায় ফারসি ভাষার প্রভাব ছিলো ব্যাপক। দক্ষিণ ভারতে আদিল শাহি (১৪৯০-১৬৮৬ খ্রি.) এবং কুতুব শাহির (১৫০৮-১৬৮৭ খ্রি.) রাজত্বকালে অধিকাংশ শাসকই ধর্মীয় মতাদর্শে শিয়া-মুসলিম ছিলেন। তারা মহররম মাসে কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারসিয়া কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এ সকল অনুষ্ঠান ফারসি কবিদের মারসিয়া বিশেষ করে মোল্লা মোহতাশাম কাশানি (১৫২৮-১৫৮৮ খ্রি.) বিরচিত মারসিয়া পাঠের মাধ্যমে শুরু হতো। এ সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন হাশেমি (মৃত্যু, ১৯৬৪ খ্রি.) তাঁর রচিত *দাকন মে উর্দু* (دکن میں اردو) নামক গ্রন্থে লেখেন:

دکن میں ابتداء فارسی شعرا کا کلام خصوصا محتشم کاشانی کے مرثیہ پڑھے جاتے تھے

(হাশেমি, ১৯৪১: ১৮১)

[দক্ষিণ ভারতে কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে ফারসি কবিদের বিশেষ করে মোহতাশাম কাশানি (১৫২৮-১৫৮৮ খ্রি.)- এর মারসিয়া পাঠ করা হতো।]

মহররম মাস আসার সাথে সাথে দক্ষিণ ভারতে শাসক ও প্রজাদের মাঝে শোকের আবহ তৈরি হতো। এই শোকের বর্ণনা দিতে যেয়ে মুহাম্মদ কাসেম ফেরেশতা (১৫৬০-১৬২০ খ্রি.) তাঁর *তারিখে ফেরেশতা* (تاریخ فرشتہ) নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

قطب شاہی سلطنت کا قدیم طریقہ ہے اور خاص کر محمد قطب شاہ کے زمانے سے یہ رواج ہے کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی خود بادشاہ لباس شاہی کو جامۂ عزا سے تبدیل کر لے تے اور شاہی محل میں کہیں کوس، نقارہ، طبل یا دمامہ نہیں بجتے اور گانے بجانے والے اپنے تمام آلات کو غلافوں میں رکھ دیتے۔

(ফেরেশতা,১৯২৬: ২য় খণ্ড, ১১)

[কুতুব শাহি রাজত্বের প্রাচীনরীতি এবং বিশেষ করে মুহাম্মদ কুতুব শাহের সময় থেকে এটা প্রচলিত ছিলো যে, মহররম মাসের চাঁদ দেখা গেলে বাদশা নিজেই শাহি পোশাক খুলে শোকের পোশাক পরিধান করতেন। শাহি মহলের কোথাও বাদ্য-যন্ত্র, তবলা, দামামা বাজত না। গায়করা নিজেদের সকল বাদ্যযন্ত্র আবৃত করে রেখে দিতেন।]

মোট কথা, মহররম মাস আসলে গোটা দক্ষিণ ভারত এক শোকের রাজ্যে পরিণত হতো। সর্বত্রই কারবালার শহিদদের প্রতি যে নির্মম আচরণ ও অবিচার করা হয়েছিলো সে কথা স্মরণ করে অশ্রুবিসর্জন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মারসিয়া পাঠ করা হতো। ফলে দক্ষিণ ভারতে মারসিয়া কাব্যচর্চা প্রথায় পরিণত হয়ে ছিলো।

উর্দু সাহিত্যে মারসিয়া রচনার পথিকৃৎ হলেন বাবায়ে রিখতা কুলি কুতব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.)। তিনি সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় মারসিয়া রচনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাঁর মারসিয়ায় আঞ্চলিকতার প্রভাব বেশি ছিলো। এক মারসিয়ায় কুলি কুতব শাহ (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) বলেন:

اماموں پر ہوا سو دکھ نکو پوچھو مسلماں ہر یک ایمام پر یک دکھ گھاتاں بسایا ہے

اگارہ مہینے کے نمنے محرم کیوں نہیں ہے تو سبھی مہینے میں خوشیاں کرتے توں اب دکھ بسایا ہے

کیا ہے مہمانی یوں اماماں کا محرم توں جنگل میں کربلا کے سب بلایاں کو بلایا ہے

(কুতুব শাহ, ১৯৪০: ৪১৬)

[ইমামদের প্রতি আরোপিত হলো শত দুঃখ-ব্যথা। মুসলিম তুমি জিজ্ঞেস কর না এর জ্বালা। প্রত্যেক ইমামের উপর শোকগাথা রচনা করা যায়। হে মহররম মাস, তুমি অন্যান্য মাসের মতো নও কেনো? সকল মাসেই তো সুখ-বিলাসে লিপ্ত থাকতে পারি, কিন্তু এখন দুঃখ বিলাপে কেনো আমরা? হে মহররম মাস, তুমি ইমামদের আতিথেয়তা করেছো। কারবালার ময়দানে সকল মসিবতকে তুমি ডেকে এনেছো।]

এ সময় মোল্লা ওয়াজহি (১৫৬৬-১৬৫৯ খ্রি.)ও কিছু মারসিয়া রচনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মারসিয়াকাব্য রচয়িতা হলেন মির্জা বিজাপুরি (মৃত্যু, ১৬৭২ খ্রি.)। আলি আদিল শাহ সানি (১৬৫৭-১৬৭২ খ্রি.)-এর যুগে মির্জা খুব খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। মিয়া হাশেমি (মৃত্যু, ১৬৭১ খ্রি.) রচিত মারসিয়ার বর্ণনাভঙ্গি ছিলো অনন্য। মুহাম্মদ সিদ্দিক কায়েস (মৃত্যু ১২৩০ হি.) নামে এক কবিও এ সময় মারসিয়া লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। দক্ষিণ ভারতে এ সকল মারসিয়া গজলের ঢঙ্গে রচিত হতো। বাক্যবিন্যাস ও ভাব প্রকাশের দিক থেকে এসকল মারসিয়া তেমন উন্নত মানের ছিলো না। সাহিত্যের গুণবিচারে এ সকল মারসিয়া পাঠক মহলে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি; বরং ফারসি সাহিত্যের উন্নত মানের হৃদয়গ্রাহী মারসিয়া গ্রন্থগুলোই ছিলো এ সময় ভারতের পাঠক সমাজের কাছে উপজীব্য ও গ্রহণীয়।

দক্ষিণ ভারতের পথ ধরে আঠার শতকে মারসিয়া দিল্লিতে পৌঁছলে কাসিদা সম্রাট মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) মারসিয়া রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মুসাদ্দাস বা ষষ্ঠপদী ছন্দে মারসিয়া রচনা করে গোটা দিল্লিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দক্ষিণ ভারতেরও কয়েকজন কবি ষষ্ঠপদী ছন্দে মারসিয়া লিখেছেন; কিন্তু সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) ষষ্ঠপদী ছন্দকে এতো সহজভাবে ব্যবহার করেন যে, পরবর্তীযুগের উর্দু কবিগণ মারসিয়া কাব্যচর্চায় সাধারণত ষষ্ঠপদী ছন্দ ব্যবহারকে রীতি মওেন করতেন।

এ সময় নাদির শাহ ও মারাঠাদের আক্রমণের কারণে দিল্লি থেকে প্রতিভাবান কবিগণ লাক্ষ্ণৌসহ চারিপার্শ্বের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোতে পাড়ি জমান। তাইধারণা করা হয় মারসিয়াকাব্যের বিকাশ দিল্লিভিত্তিক উর্দু সাহিত্যে তেমন হয়নি।

দিল্লির নিকটবর্তী স্থান অযোদ্ধার শাসক আসিফুদ্দৌলা (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.)-এর মাধ্যমে উর্দু মারসিয়াকাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ হয়। তিনি সর্বপ্রথম মারসিয়াকাব্য পাঠের জন্য ইমামবাড়া নামক মঞ্চ নির্মাণ করেন। আসিফুদ্দৌলা (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.)- এর মঞ্চ থেকেই লাক্ষ্ণৌভিত্তিক মারসিয়া রচনা শুরু হয়। এভাবেই উর্দু সাহিত্যে মারসিয়া রচনার আবহ তৈরি হয়।

লাক্ষ্ণৌ বা হায়দারাবাদে মারসিয়া রচনার প্রাণ পুরুষ হলেন মিয়া সেকান্দর (১৭৪০-১৮০৪ খ্রি.)। আসল নাম মুহাম্মদ আলি। জন্ম মুলতান বা পাঞ্জাবে। এক পর্যায়ে তিনি লাক্ষ্ণৌ চলে আসেন এবং গোটা জীবন লাক্ষ্ণৌতে অতিবাহিত করেন। মিয়া সেকান্দর (১৭৪০-১৮০৪ খ্রি.) যখন মারসিয়াকাব্য রচনা করেন তখন লাক্ষ্ণৌতে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.), মির হাসান (১৭৩৬-১৭৮৬ খ্রি.), মির শের আলি আফসোস (১৭৩৭-১৮০৯ খ্রি.) এবং মির তাকি মির (১৭২৩-১৮১০ খ্রি.) প্রমুখের ন্যায় দক্ষ কবিগণ লাক্ষ্ণৌতে কাব্যচর্চা করেছিলেন।

এ সময় মিয়া সেকান্দর (১৭৪০-১৮০৪ খ্রি.) আড়ম্বতার সাথে মারসিয়াকাব্য রচনা করে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উর্দু ভাষা ছাড়া ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়ও তিনি কাব্যচর্চা করেছেন। বিভিন্ন প্রচলিত ছন্দে মারসিয়া রচনা করে তিনি মারসিয়া কাব্যসাহিত্যের মান বৃদ্ধি করেছেন। মিয়া সেকান্দার ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে হায়দারাবাদে সমাহিত করা হয়। মিয়া সেকান্দর (১৭৪০-১৮০৪ খ্রি.) রচিত একটি প্রসিদ্ধ মারসিয়া আজো মহররম মাসে উর্দুভাষীদের মুখে উচ্চারিত হয়। যার মূল কথা হলো সুগরা নামে হযরত হুসাইর (রা.)-এর এক কন্যা ছিলেন। তিনি অসুস্থতার কারণে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে কারবালার সফর-সঙ্গী হতে পারেননি। তিনি হযরত হুসাইন (রা.) কে একটি চিঠি লিখে দূতের মাধ্যমে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু দূত কারবালার ময়দানে পৌঁছার পর দেখলো হুসাইন (রা.) ও তাঁর পরিবারের সকলে শহিদ হয়ে গেছেন। হযরত হুসাইন (রা.) তার চোখের সামনে শহিদ হন। দূত ফিরে এসে হযরত হুসাইন (রা.)-এর তনয়াকে এই হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দেয়। মিয়া সেকান্দর (১৭৪০-১৮০৪ খ্রি.) পুরো ঘটনাটি যে হৃদয়বিদারক ভাষায় উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ:

ان دنوں شہر مدینہ میں ہوا اس کا نزول جس محلے میں بہم رہتے تھے حسین وبتول ایک لڑکی کھڑی دروازہ پر بیمار وملول خط لیے
کہتی تھی پردے کے قرین زار ونزار ادھر آ تجھ کو خدا کی قسم اے ناقہ سوار

(সাদিদ,২০১৫: ১৯২)

[এই সময়ে একদা মদিনা শহরে সে দূত আসলো। এটি সেই এলাকা যেখানে হুসাইন (রা.) ও তাঁর তনয়া এক সাথে বসবাস করতেন। এক অসুস্থ মেয়ে মলিন বদনা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো। চিঠি ফেরত নিয়ে পর্দার পাশ থেকে আহাজারি করে বলল, হে উট সাওয়ারি, খোদার কসম দিয়ে বলছি এদিকে আসো!]

লাক্ষ্ণৌভিত্তিক উর্দু মারসিয়া রচনার আরেকজন প্রাণ পুরুষ হলেন মির মুসতাহসিন খালিক (১৭৬৬-১৮৪৪ খ্রি.)। তাঁর পিতা উর্দু সাহিত্যর মাসনাভি সম্রাট মির হাসান (১৭৩৬-১৭৮৬ খ্রি.)। তিনি আধুনিক ধারায় মারসিয়া রচনায় এগিয়ে আসেন। উর্দু সাহিত্যে তিনি 'মির খালিক' নামে প্রসিদ্ধ। এ সময়ের আরেকজন মারসিয়া রচনাকারী হলেন মির মুজাফফর হুসাইন জমির (১৭৭৭-১৮৫৫ খ্রি.)। তিনি উর্দু সাহিত্যে 'মির জামির' নামে খ্যাত। 'মির খালিক' (১৭৬৬-১৮৪৪ খ্রি.) ও 'মির জামির' (১৭৭৭-১৮৫৫) মারসিয়া রচনায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। লাক্ষ্ণৌভিত্তিক উর্দু সাহিত্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা খুব প্রাণবন্ত ছিলো।

মির বাবর আলি আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) মারসিয়া রচনা করে উর্দু সাহিত্যকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গেছেন । তিনি ছিলেন উর্দু সাহিত্য পরিবারের সদস্য। তাঁর দাদা হলেন উর্দু সাহিত্যের মাসনাভি সম্রাট মির হাসান (১৭৩০-১৭৮৬ খ্রি.)। পিতা মির খালিক (১৭৬৬-১৮৪৪ খ্রি.) ছিলেন উর্দু সাহিত্যে মারসিয়া রচনায় অভিজ্ঞ কবি। তাঁর বেড়ে উঠা লাক্ষ্ণৌতেই। শৈশবেই কাব্যচর্চার হাতেখড়ি হয়। আরবি ও ফারসি ভাষায় তিনি ছিলেন দক্ষ। মির আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.)-এর কবিতার ভাষা ছিলো অতি সহজ ও প্রাঞ্জল। কাব্যজীবনের শুরুতে গজল লিখলেও পরবর্তীকালে কেবল মারসিয়া লিখেছেন। মারসিয়াকাব্যের এমন কোনো দিক নেই যেখানে মির আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) দক্ষতার পরিচয় দেননি। শব্দ চয়ন, বর্ণনা, অলংকার, শব্দ প্রয়োগ, বিভিন্ন রূপক অর্থের ব্যবহার, উপমা, বাচনভঙ্গির শৈল্পিক ব্যবহারে তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর সমসাময়িক মির সালামত আলি দবিরও (১৮০৩-১৮৭৫ খ্রি.) মারসিয়া রচনা করেছেন। কিন্তু মারসিয়াকে মির আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) সাহিত্যের যে স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন উর্দু সাহিত্যের আর কোনো কবি এ পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হননি। তাই মারসিয়াকাব্যে মির আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে বিবেচিত।

মির আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) ও মির দবির (১৮০৩-১৮৭৫ খ্রি.) রচিত মারসিয়াগুলোকে সাহিত্যের মানবিচার বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কারবালার ঘটনার বর্ণনায় মির আনিসের (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) বক্তব্য মির দবিরের (১৮০৩-১৮৭৫ খ্রি.) চেয়ে অনেক উচ্চ মার্গের ছিলো। কেননা কারবালার ময়দানে ইয়াজিদ বাহিনি হযরত হুসাইন (রা.)-এর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। হযরত হুসাইন (রা.)-এর উত্তর কী

দিয়েছিলেন? এ সম্পর্কে মির আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) ও মির দবির (১৮০৩-১৮৭৫ খ্রি.)-এর বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো:

মির দবির (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) বলেন, হযরত হুসাইন (রা.) সাদামাটা উত্তর দিয়ে বলেছেন:

ہمیں حسین علیہ السلام کہتے ہیں

[লোকেরা আমাকে হুসাইন আলাইহিস সালাম বলে থাকে।]

পক্ষান্তরে এ ঘটনার বর্ণনায় মির আনিস (১৮০৩-১৮৭৪ খ্রি.) বলেন: হযরত হুসাইন (রা.) উত্তরে বলেছিলেন:

یہ تو نہیں کہا شہ مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں

[এটাতো তিনি বলেন নি যে, আমি প্রাচ্যের বাদশাহ। আমার নেতা বিনয়ের সাথে বলেছেন আমি হুসাইন।] এ দু'টি বক্তব্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ড. সুম্বুল নিগার বলেন:

دبیر کا مصرع مقتضائے حال کے مطابق نہیں۔ مطلب یہ کہ امام حسین سے ایسے جواب کی توقع نہیں کی جاسکتی جس سے شیخی کی بو آتی ہو۔ جبکہ وہ جواب جو انیس کے شعر ادا ہوا ہے بلکل درست معلوم ہوتا ہے۔ سر جھکانے سے غریب الوطنی اور بے کسی کی حالت آپ سے آپ ظاہر ہو جاتی ہے۔

(নিগার, ১৯৯৫: ১৭২)

[মির দবিরের পঙ্‌ক্তিটি স্থান কাল পাত্রভেদে হয়নি। অর্থাৎ হযরত হুসাইন (রা.) থেকে এমন উত্তর আশা করা যায় না, যেখানে অহংকারের ভাব আসে। পক্ষান্তরে মির আনিসের কাব্যছত্রে যে উত্তরটি দেখা যায়, তা একেবারে যথাযথ। কারণ, হযরত হুসাইন (রা.) বিনয়াবনত হয়েছেন বলার দ্বারা তাঁর অসহায়ত্ব ও মুসাফির হওয়ার অবস্থা প্রকাশ পায়।]

মারসিয়া রচনার নির্দিষ্ট কোনো ছন্দ নেই। উর্দু সাহিত্যের সূচনাকালে গজল অবয়বে মারসিয়া লিখা হতো। মারসিয়া মাসনাভি অবয়বেও রচিত হয়েছে। আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) তাঁর মায়ের স্মরণে যে মারসিয়া রচনা করেছেন তা মাসনাভি অবয়বে রচিত। মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালি ((১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.) বিখ্যাত কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)-এর স্মরণে যে মারসিয়া রচনা করেছেন তা ছিলো তারকিব বন্দ অবয়বে রচিত। পরবর্তীকালে জোশ মালিহাবাদি (১৮৯৮-১৯৮২ খ্রি.) মুখাম্মাস (পঞ্চপদী) অবয়বে 'ইনকিলাব' নামে মারসিয়া রচনা করেন।

উর্দু সাহিত্যে মারসিয়া রচনার প্রসিদ্ধ ছন্দ হলো মুসাদদাস বা ষষ্টপদী কবিতা। বর্তমান সময়েও ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আয়ারল্যাণ্ডসহ বিশ্বের নানা স্থান থেকে যারা মারসিয়া রচনা করছেন তাদের মধ্যে উরফি হাশেমি (জন্ম ১৯৫০ খ্রি.) ও ডাক্তার আবুল হাসান নাকাভি (জন্ম ১৯৬৩ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে বসবাসরত আহমদ ইলিয়াস (জন্ম, ১৯৩৩ খ্রি.) ও শামিম জমানাভি (জন্ম, ১৫৫২ খ্রি.) রচিত কয়েকটি মারসিয়া নন্দিত ও সমাদৃত হয়েছে। মহররমের সময় এখনো ভারতবর্ষে মারসিয়াকাব্যচর্চা সকলকে আন্দোলিত করে।

এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, উর্দু কাব্যজগৎ এক সময় ফারসি কাব্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত ছিলো। উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত কাব্যরীতি, ছন্দ, পরিভাষার প্রয়োগ, উপমা, রচনাশৈলীসহ সাহিত্যের সকল উপাদান ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে এসেছে। কোনো এক সময় উর্দু কবিতার আসরগুলোর সূচিত হতো ফারসি কবিতা পাঠের মাধ্যমে। বর্তমানকালেও উর্দু কাব্যজগতে তেমনি অনুসৃত ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, যা উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধ করছে।

তথ্যসূত্র

১. আনওয়ার সাদিদ (২০১৫) : *উর্দু আদব কি মুখতাসার তারিখ*, এম, আর, পাবলিকেশন্স, দিল্লি, ভারত।

২. আবু সাঈদ মুহাম্মদ নুরুদ্দিন (১৯৯৭) : *তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান।

৩. আব্দুল হক (১৯৬১) : *উর্দুয়ে কাদিম*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, করাচি, পাকিস্তান।

৪. আবদুল হক (১৯৬১) : *ফারসি শাইরি কা আসর উর্দু শাইরি পর*, অপ্রকাশিত থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি।

৫. আমির খসরু (অনু) : *গুররাতুল কামাল*, এডুকেশনাল বুক হাইস. আলিগড়, ভারত।

৬. আহমদ তামীমদারী (২০০৭) : *তারিখে আদাবে পারসি*, (অনুবাদক, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৭. গোলাম রব্বানী (২০১৪): *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান*, মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৮. কুলি কুতুব শাহ (১৯৪০) : *দেওয়ানে কুলি কুতুব শাহ*, ইদারায়ে আদবিয়্যাতে উর্দু, হায়দারাবাদ, ভারত।

৯. খাজা মির দরদ (১৮৯২) : *দেওয়ানে মির দরদ*. মাকতাবায়ে আনসারি, দিল্লি, ভারত।

১০. গোলাম আসি রশিদি (২০০৬) : *উর্দু গযল কা ইরতিকা*, মডার্ন পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লি, ভারত।

১১. জামিল জালিবি (১৯৭৭) : *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউজ, দিল্লি, ভারত।

১২. জালালুদ্দিন জাফরি (১৯৪০) : *তারিখে মাসনাভিয়্যাতে* উর্দু, শিরকাতে মুসান্নিফিন, লাহোর, পাকিস্তান।

১৩. জালালুদ্দিন রুমি (১৩৭৩ সৌ.): *মাসনাভি মানাভি মাওলানা রুম*, মুআস্সাসা ইনতিশার নিগাহ, তেহরান, ইরান।

১৪. দয়া শঙ্কর (২০০৭): *মাসনাভি গুলজারে নাসিম*, মাকতাবা জামেয়া মিল্লি লিমিটেড, দিল্লি, ভারত।

১৫. নাসিরুদ্দিন হাশিমি (২০০২) : *দাকান মে উর্দু*, কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফারুগে উর্দু, দিল্লি, ভারত।

১৬. নাসিরুদ্দিন হাশিমি (১৯৩৯) : *মাকালাতে হাশিমি*, কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফারুগে উর্দু, দিল্লি, ভারত।

১৭. নুরুল হাসান নাকাভি (২০০৪) : *তারিখে আদাবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

১৮. নুসরাতি (১৬৫৭) : *গুলশানে ইশক*, এজাজ প্রিন্টিংপ্রেস, হায়দারাবদ, ভারত।

১৯. ফারহাত শামিম (২০১২) : *উর্দু আওর ফারসি কে রাওয়াবেত*, আজাদ বুক ভিশন, জুম্মু ভারত।

২০. মনিরুদ্দিন ইউসুফ (১৯৬৮) : *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২১. মাহমুদ বাহরি (১৯৫৫): *মনোলগন*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, পাকিস্তান।

২২. মির্জা আসদুল্লাহ খান গালিব (১৯৬৮): *দেওয়ান গালিব*, শেখ গোলাম আলি এন্ড সন্স, করাচি, পাকিস্তান।

২৩. মুহাম্মদ ইকবাল (২০০৭) :*কুল্লিয়াতে ইকবাল,* ইতিকাদ পাবলিকেশন্স হাউজ, দিল্লি, ভারত।

২৪. মুহাম্মদ কাসেম ফেরেশতা (১৯২৬) : *তারিখে ফেরেশতা*, দারুত তরজমা উসমানিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত।

২৫. মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ (১৯৫০) : *আবে হায়াত*, শেখ মোবারক আলি তাজের কুতুব খানা, লাহোর, পাকিস্তান।

২৬. মুহি উদ্দিন কাদেরি জুর (১৯৪০) : *মুকাদ্দামায়ে কুল্লিয়াতে কুলি কুতুব শাহ*, মাকতাবায়ে ইবরাহিমিয়া মিশন প্রেস, হায়দারাবদ, ভারত।

২৭ . মোল্লাহ ওয়াজহি (১৯৩৮): *কুতুবে মুশতারি*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, দিল্লি, ভারত।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৩) *সোনারতরী*, বিশ্বভারতি, কোলকাতা, ভারত।

২৯. রশিদ আহমদ সিদ্দিকি (১৯৭৮) : *জাদিদ উর্দু গজল*, ইউনিভারসেল বুকস, লাহোর, পাকিস্তান।

৩০. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজি (১৩৭৬ সৌ.) : *দেওয়ানে হাফিজ*, মুআসসিসায়ে ফারহাঙ্গে ইরান।

৩১. শিবলি নোমানি (১৯৪০): *শেরুল আজম*, দারুল মুসান্নিফিন, শিবলি একাডেমি, মাআরিফ প্রেস, আজমগরা, লাক্ষ্মৌ, ভারত।

৩২. শেখ নিজামুদ্দিম গাঞ্জাভি (১৩৭৮ সৌ.) : *ইসকান্দর নামে*, ইন্তিশারাতে নাগিন, তেহরান, ইরান।

৩৩. শেখ নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১৩৭৮ সৌ.) : *হাফত পেইকার*, ইন্তিশারাতে নাগিন, তেহরান, ইরান।

৩৪. শেখ নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১৩৭৮ সৌ.) : *খসরু ওয়া শিরিন*, ইন্তিশারাতে নাগিন, তেহরান, ইরান।

৩৫. সুম্বুল নিগার (১৯৯৫) : *উর্দু শাইরি কা তানকিদি মুতালাআ*, এডুকেশন বুক হাউস, আলিগড়, ভারত।

৩৬. সৈয়দ শামসুল্লাহ কাদেরি (১৯২৯) : *তারিখে জবানে উর্দু* ,মুন্সি নভেল শোর, লাক্ষ্মৌ, ভারত।

৩৭. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৯৬২) : *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলকাতা, ভারত।

৩৮. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৯৫৪) : *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলকাতা, ভারত।

৩৯. Ram Babu Saksena (1952): *The History of Urdu Leature,* Allahbad, Ram Narain Lal Publisher, India.

পঞ্চম অধ্যায়

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রভাবিত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক

উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে, দিল্লির কথ্যভাষা হিন্দাভি (উর্দু ভাষার প্রাচীন নাম) হলেও সাহিত্যচর্চার ভাষা ছিলো মূলত ফারসি। হিন্দাভি তথা উর্দু ভাষায় সাহিত্যচর্চার ধারণা দিল্লিবাসীর ছিলো না। মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগিরের (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি) দক্ষিণ ভারত জয়ের মধ্য দিয়ে উর্দু সাহিত্যচর্চার নবজাগরণ ঘটে। দক্ষিণ ভারতের কবি-সাহিত্যিকদের উর্দুচর্চা দেখে দিল্লির অধিবাসী ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের মাঝেও মাতৃভাষা উর্দুর মাধ্যমে সাহিত্য চর্চার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উর্দু সাহিত্যের বাবায়ে আদম নামে খ্যাত অলি মুহাম্মদ অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.)-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে দিল্লির সাহিত্যচর্চায় নতুন গতি পায়।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে উর্দু ভাষায় ফারসি ভাষার দর্শন ও প্রজ্ঞার নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) পরবর্তী যুগে উর্দু ভাষায় ফারসি ধারার প্রভাব ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শো বছর বহাল থাকে। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর এ প্রভাব খানিকটা ছন্দ হারায়। পরবর্তীকালে উর্দু ভাষার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে এ ধারা বহাল রাখার প্রয়াস চালান।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রভাবিত উর্দু ভাষী সাহিত্য কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে অলি মুহাম্মদ অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.), মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.), মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.), সাআদ ইয়ার খান রঙ্গিন (১৭৫৭-১৮৫৫ খ্রি.), মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ও আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি অলির পরিচয়

বাবায়ে আদম উপাধিতে খ্যাত উর্দু সাহিত্যের অন্যতম মনীষী অলি ১৬৬৭ মতান্তরে ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের আওরঙ্গবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম অলি মুহাম্মদ অলি উল্লাহ দাকানি। পিতার নাম শরিফ মুহাম্মদ। আহমদাবাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণের কারণে দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করেন। শুরুতে তিনি ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন। অলি দিল্লি এসে সাআদুল্লাহ গুলশানকে স্বীয় ফারসি কাব্যের কিয়দাংশ আবৃত্তি করে শুনালে তিনি অলিকে (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি ধারায় উর্দু কাব্য রচনার পরামর্শ দেন।[৭০] অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি ধারায় উর্দুকাব্য রচনা করলে ভারতের আপামর-জনসাধারণ মুগ্ধ হন। এ ধরনের রচনাসমূহ দিল্লি ও তার আশপাশের ফারসি কবিগণকে উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। তাই বলা যায় যে, দিল্লির রাজা-বাদশাগণ যেমন দক্ষিণ ভারত জয় করেছিলো তদ্রূপ অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) রচিত উর্দু সাহিত্যের এ নতুন ধারা দিল্লির সাহিত্যজগৎকে জয় করে নিয়েছিলো।

---

৭০. মির তাকি মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) বরাত দিয়ে ড হরেন্দ্র চন্দ্র পাল বলেন:

ولی در شاہ جہان آباد نیز آمدہ بود و بخدمت میان گلشن رفت واز اشعار خود پارہ خواند ۔ میان صاحب فرمودند این ہمہ مضامین فارسی کہ بیکار افتادند۔ در ریختہ بگو از تو کہ محاسبہ خواھد گرفت ۔

[অলি শাহজাহান আবাদ তথা দিল্লিতে এসে মিয়া গুলশানের খেদমতে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন। মিয়া সাহেব কবিতা শুনে বললেন: এতদঞ্চলে ফারসি ভাষায় রচিত এ ধরনের কবিতা তেমন কোনো কাজে লাগবে না। যদি তুমি তা রিখতায় বর্ণনা কর (উর্দু ভাষায় তা চর্চা কর) তবে সমাদৃত হওয়ার আশা করা যায়।] (পাল, ১৯৬২: ৬৬)

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪খ্রি.) ফারসি ভাষায় দিওয়ান (কাব্যসমগ্র) রচনা করে সতেরোশ সাত (১৭০৭ খ্রি.) খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি আসেন এবং দিল্লির আধ্যাত্মিকগুরু শাহ সাআদুল্লাহ গুলশানকে নিজ কাব্যগ্রন্থ দেখান। এরপর শাহ সাআদুল্লাহ গুলশানের পরামর্শে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) উর্দু ভাষায় ফারসি শব্দ, ব্যাকরণের বিধি-বিধান, বাক্যালংকার, অনুপ্রাস ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করেন এবং উর্দু কাব্যচর্চায় একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। গোটা ভারতে এ নতুনধারা সমাদৃত হয় এবং ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়। উল্লেখ্য, দিল্লি সফরের পর অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) কবিতায় ফারসি কাব্যের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। অথচ দিল্লি সফরের পূর্বে তাঁর কাব্যে দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব বেশি ছিলো।

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) অনেক কবিতা পাঠে মনে হবে যে, তাঁর রচিত কবিতা ও ফারসি কবিতার আলোচ্য বিষয় একেবারে অভিন্ন। পার্থক্য কেবল ভাষা-ব্যঞ্জনায়। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি কবিতার অনুকরণ-অনুসরণ সম্পর্কে ড. আবদুল হক বলেন:

ولی کی شاعری اور فارسی شاعری میں زبان کے علاوہ کچھ خاص فرق نہیں رہ جاتا

(হক, ১৯৬১: ১০৯)

[অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) উর্দু কবিতা এবং ফারসি ভাষায় রচিত কবিতাগুলোর মাঝে ভাষার পার্থক্য ছাড়া আন্যকোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।]

অলির কাব্যশৈলী

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) যুগ ছিলো গজল রচনার যুগ। তাঁর রচিত অধিকাংশ উর্দু কবিতাই হলো গজল আঙ্গিকের। তবে তাঁর রচনায় কিছু মুখাম্মাস (পঞ্চপদী কবিতা), তারজিবন্দ[৭১], মাসনাভি (দ্বিপদী কাহিনী কাব্য) ও কাসিদা (স্তুতি মূলক কাব্য)-এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি অলি

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি। তাঁর মাঝে ধর্মের কোনো গোঁড়ামি ছিলো না। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন সুফিবাদী-মরমি কবি। তাঁর কবিতায় প্রেম ভালোবাসার মূর্ছনায় বিমোহিত হওয়ার আহ্বান আছে। আছে সুন্দর জীবনের প্রতি আসক্তির বর্ণনা। তিনি ব্যর্থতায় নিপতিত হয়ে এ জীবনকে শেষ করতে চান না। কিছু না পাওয়ার দুঃখকে তিনি প্রাপ্তির ভিন্নতা দিয়ে পুষিয়ে নিতেন। এক কবিতায় অলি (১৬৬৮-১৭৩০ খ্রি.) বলেন:

کثرت کے پھول بن میں جاتے نہیں ہے عارف　　بس ہے موحداں کوں منصور کا تماشا

مجھے بولیا کہ گر عشق حقیقی سوں توں واقف نئیں　　تو بہتر یوں ہے جا دامن پکڑ عشق مجازی کا

(অলি, ১৯২১: ৭০,৮৩)

৭১. যে কবিতায় প্রত্যেক স্তবকের শেষে একটি ছন্দের পুনরাবৃত্তি হয় তাকে তারজিবন্দ (ترجیع بند) বলে। দুই চরণবিশিষ্ট কবিতার এক প্রকার ছন্দ যাকে মাসনাভি (مثنوی) বা দ্বিপদী কাহিনী কাব্যও বলা হয়।

[প্রকৃত পথিক সহস্র ফুল ফোটানোর জন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় না। একজন একত্ববাদীর জন্য কেবল মনসুর হাল্লাজ[৭২] (৮৫৮-৯২২ খ্রি.)-এর মতো দৃশ্যপটই যথেষ্ট। কেউ একজন আমাকে বললো, আল্লাহ প্রেমের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে যদি জানতে না পারো, তাহলে উত্তম হলো রূপক প্রেমের আঁচল আঁকড়ে ধরো।]

অলির ফারসি কবিতা অনুসরণের কারণ

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি কাব্যের প্রতিটি রীতি উর্দু ভাষায় ব্যবহার করে নিজের কাব্যপ্রতিভার শক্তিমত্তা প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর ফারসি কবিতা অনুসরণ ও অনুকরণের মূলকারণ ছিলো তৎকালীন ভারতীয় পরিবেশ ও সমাজ। এই পরিবেশ ও সমাজে ফারসি ভাষাচর্চা ছিলো আভিজাত্যের পরিচায়ক। সাহিত্যলব্ধ জ্ঞান আহরণে অলি (১৬৬৮-১৭৩০ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অলি (১৬৬৮-১৭৩০ খ্রি.) ফারসি ঢঙ্গে ভারতীয় কথ্যভাষায় (উর্দু) যখন কাব্য রচনা করলেন তখন ফারসি ভাষায় কাব্য চর্চাকারী সুধীসমাজও উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চা করতে উদ্বুদ্ধ হন।

১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.)-এর কুল্লিয়্যাত (কাব্য সমগ্র) প্রকাশিত হলে দিল্লির কবিতার আসরগুলোতে শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.), হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) আর আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) কবিতার পাশাপাশি অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) কবিতাগুলো গুঞ্জরিত হতে আরম্ভ করে। দিল্লির পাঠকমহলের ফারসি কবিদের সাথে সখ্যভাব দেখে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি গজলসম্রাট হাফিজসহ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) অনেকের কবিতা উর্দু ভাষায় ভাবানুবাদ করেছেন। যেমন, ফারসি গজলসম্রাট হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) বলেন:

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها　　که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

(হাফিজ, ১৩৭৪ সৌ.: ১)

[হে সাকী তুমি শরাবের এক পেয়ালা নিয়ে ঘুরে ঘুরে সুরা ঢেলে পরিবেশন কর, প্রেমের প্রথমপ্রহর সহজ মনে হলেও অবশেষে তা বিপদ টেনে আনে।]

অলি (১৬৬৮-১৭৩০ খ্রি.) বলেন:

اے ولی طرز عشق آسان نئیں　　ازمایاہوں میں کہ مشکل ہے

اے ولی اس کا زہر کیوں اترے　　جن نے کھایا ہے عاشقی کا نیش

(অলি, ২০০৮: ১৪৬)

---

৭২. মনসুর আল হাল্লাজের পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে মানসুর আল-হাল্লাজ। তিনি একজন উঁচু মার্গের সুফি-সাধক ছিলেন। তিনি সুফিবাদের অনেক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। মুসলিম বিশ্বে তিনি প্রধানত তাঁর মরমি বক্তব্য 'আনাল হক' (আমিই সত্য)- এর কারণে ব্যাপক আলোচিত। আব্বাসীয় খলিফা আল মুক্তাদিরের নির্দেশে ৯২২ খিষ্টাব্দে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয়। (স্মিথ, ১৯৯২: ৩)

[হে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ভালোবাসার রীতি আত্মস্থ করা সহজ নয়, পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। হে অলি, এ বিষয়ে তার যন্ত্রণা কিভাবে দূর হবে, যে ভালোবাসার নেশা পান করেছে?]

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) তাঁর কাব্যে ফারসি কাব্যের ভাব, শব্দের ব্যঞ্জনা, অনুপ্রাস, অলংকার শাস্ত্রীয় বিষয়গুলো ব্যবহারে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যা পরবর্তীকালের উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের কাছে অনুকরণীয় ছিলো। তিনি মূলত দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে উর্দু সাহিত্যচর্চার দু'টি ধারার সম্মিলন ঘটান এবং ফারসি সাহিত্যের আভরণে উর্দুকে সুসজ্জিত করেন। এর পরপরই উর্দু কাব্যের খ্যাতি গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং উর্দু কাব্যচর্চার আবহ সৃষ্টি হয়।

অলি কাবিতার মূল বক্তব্য

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) কবিতার মূল বক্তব্য হলো ভালোবাসার ব্যঞ্জনা আর চারিত্রিকগুণের উৎকর্ষতা সাধন। এ ব্যঞ্জনা মূলত অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি কাব্যজগৎ থেকে ধারণ করেছেন। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) কাব্যপাঠে মনে হয় তিনি ফারসি কবিতা পাঠ করে উর্দু ভাষায় সে ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ কারণে অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) কবিতায় ফারসি শব্দ ও কাব্যশৈলীর ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। যেমন অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) বলেন:

ہوش کھوتی ہے نازنین کی ادا سحر ہے سرو گل جبین کی ادا

موج دریا کو دیکھنے مت جا دیکھ اس زلف عنبریں کی ادا

(অলি, ১৯৮২: ৬৭)

[আমার প্রেমিকার চাল-চলন দেখে আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। তাঁর মাথার চুল যেনো শেষ রাতের মতো কালো, আর কপাল হলো শুভ্র ফুলের মতো। সমুদ্রের ঢেউ দেখতে যাওয়ার দরকার নেই কেবল তাঁর মেশকাম্বরের ঘ্রাণে ভরা ঢেউ খেলা চুল দেখলেই চলবে।]

প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যের বর্ণনায় অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) তাঁর কবিতায় ফারসির অনুসরণ করেছেন। উল্লেখ্য, ফারসি কবিতা মূলত আরবি কবিতা দ্বারা প্রভাবিত। আর আরবি কাব্যে প্রেমিকার দীর্ঘ কালো চুলকে কয়লার সাথে তুলনা করা হয়। আরবিভাষী কবিগণ দূর থেকে সেই কালো চুলের ঢেউ খেলার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হন। সেই দীঘল-কালো চুলের মায়াবি আকর্ষণে তার হৃদয় দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। প্রেমিকা থাকে পর্দার অন্তরালে। কাছে আসে না। তার সাথে কবির মিলন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবু প্রেমের টানে ব্যকুল থাকে তাঁর তনুমন।

ফারসি কবিতায় প্রেমাস্পদ আরো কাছের আরো আবেগের। প্রেমাস্পদের চুলের গন্ধ যেখানে মূর্ত হয়ে উঠে। কখনো তার সুগন্ধি মেশকাম্বরের মতো, কখনো সুম্বুল ঘাসের মতো আবার কখনো বেহেশতের রায়হান ফুলের মতো। ফারসি ভাষায় প্রেমাস্পদের হিল্লোলিত জুলফির আকর্ষণকে সাপের সাথে তুলনা করা হয়। যে সাপের দংশনে প্রেমিক হাজারবার দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আবার কখনো সে খনিকের

জন্য কাছে এসে আবার ভ্রমরের মতো দূরে বহু দূরে উড়ে যায়। প্রেমিক কেবল মিলনের অপেক্ষায় আর্তনাদ করে।

ফারসির অনুসরণে উর্দু কাব্যে প্রেমাস্পদের চুলের সুঘ্রাণ আর ফুলের কথা এসেছে বারংবার যা কেবল ইরান-তুরান আর ইস্পাহানে পাওয়া যায়। পাঠক কেবল কল্পনায় সে সুগন্ধি আর ফুলের অস্তিত্ব অনুভব করে। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) কবিতায় এ সকল ফুলের উপমা অসংখ্যবার এসেছে। উর্দু কবিতায় উপমার এ নান্দনিক ব্যবহার সম্পর্কে হুসাইন মুহাম্মদ আজাদ (১৮৩০-১৯১০ খ্রি.) বলেন:

یہاں بالوں کی تعریف میں ناگوں کے لہرانے اور بھونرے کے اڑنے سے تشبیہ دیے تھے۔ فارسی میں زلف کی تشبیہ سانپ کے ساتھ آئی ہے۔ اس لیے اردو میں سانپ رہے اور بھونرے اڑ گئے۔ اور اس کی جگہ مشک، بنفشہ، سنبل، ریحان آ گئے جو کبھی یہاں دیکھے بھی نہیں۔

(আজাদ, ১৯৫০: ৪৯)

[এখানে প্রেমাস্পদের চুলের প্রশংসা করে নাগ-নাগিনির মাথা দোলানো এবং ভ্রমরার উড়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়। ফারসি ভাষায় প্রেমাস্পদের জুলফিকে সাপের সাথে তুলনা করা হয়, পক্ষান্তরে উর্দু ভাষায় জুলফিকে সাপের সাথে তুলনা করা হলেও ভ্রমরার ব্যবহার তেমন নেই। ভ্রমরার স্থলে মেশকাম্বর, সুগন্ধি ফুল, সুঘ্রাণ যুক্ত ঘাস এবং বেহেশতের ফুলের সাথে জুলফির উপমা উর্দু ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। অথচ এ বিষয়গুলো এদেশের পাঠকসমাজ কখনো দেখেনি।]

অলির কবিতায় পারস্য সভ্যতা ও ভাবনার বহিঃপ্রকাশ

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) কবিতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় ভাষায় ইরানি সাহিত্য-সভ্যতা ও ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। ফারসি ভাষায় ব্যবহৃত কবিতার ছন্দরীতিগুলো অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) বেশ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন। ফারসি ছন্দরীতি ও ভাবনাগুলোর সমন্বয়ে গজল রচনায় অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ছিলেন তৎকালে অদ্বিতীয়। ফারসি ছন্দরীতির প্রতিটি ভাবনা অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) তাঁর কলম-তুলি দিয়ে আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফারসি কবিতায় প্রেমাস্পদের নিপুণ সৌন্দর্য বর্ণনা করতে যেয়ে কবিগণ এ কথা বলেছেন যে, প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কারণ প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য আঁকতে গেলে চিত্রাঙ্কনকারীর চোখ ঝলসে যাবে। সে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকবে। উর্দু ভাষায়ও এ বিষয়গুলোর চিত্র আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে ফুটে উঠেছে। যেমন ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি উরফি (১৫৫৬-১৫৯১ খ্রি.) বলেন:

کرد تصویر ترا صورت گر چین آرزو

بست چندین صورت و صورت نیست این آرزو

(হক, ১৯৬১: ৩৮৪)

[তোমার ছবি যদি কেউ এঁকে দিতো তবে হৃদয়ে আশা জাগতো। কিন্তু অনেক ছবির মাঝেও তোমার মতো সুন্দর ছবি কারো না হোক এই আশায় বুক বাধি।]

ফারসি ভাষার অনুসরণ করে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য বর্ণনায় আরো একধাপ এগিয়ে গেছেন। এ স্থানে কবি উরফি (১৫৫৬-১৫৯১ খ্রি.) কেবল আশা করেছিলেন যে, চিত্রকরগণ প্রেমাস্পদের সুন্দর ছবি আঁকতে ব্যর্থ হবেন। আর অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) চিত্রকরদের ব্যর্থতার ঘোষণা দিয়ে বলেন:

جگ کے مصوراں سب تصویر دیکھ تیری　　حیرت میں جا پڑے سب لکھتا رہا معطل

(হক, ১৯৬১ : ১২৮)

[সকল চিত্রাঙ্কনকারী ঘুম থেকে জেগে তোমার ছবি দেখে হতবাগ হয়ে পড়বে এবং সকলে তোমার ছবি আঁকতে ব্যর্থ হবে।]

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) গজল লিখেছেন বেশি। ফারসি গজলে যেভাবে প্রেমাস্পদের রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা এসেছে, ঠিক একই ভাবে প্রেমস্পদের ছলনা, খলনায়কের সাথে সম্পর্ক, প্রেমিককে এড়িয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা, তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়াবলি উল্লেখ করে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি কবিদের অনুসরণ করেছেন।

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) প্রেমাস্পদের প্রতিটি অঙ্গের প্রশংসায় একেকজন ফারসি কবির নাম নিপুণভাবে উল্লেখ করেছেন। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) গজল পাঠে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে তাঁর ব্যাপ্তি প্রকাশ পায়। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) বলেন:

ترا مکھ مشرقی، حسن انوری، جلوہ جمالی ہے　　نین جامی، جبین فردوسی و آبرو ھلالی ہے

(অলি, ২০০৮ : ২৯২)

[তোমার চেহারা অতি উজ্জ্বল, সৌন্দর্য বিভাময়, দ্যূতিতে সৌন্দর্য মণ্ডিত। তোমার চোখ শরাব মুদিত, কপাল প্রশস্ত আর সম্মান নতুন উদিত চাঁদের মতো।]

এ কবিতায় অলি (১৬৬৮-১৭৩০খ্রি.) ফারসি সাহিত্যের ছয়জন বিখ্যাত কবি ফিরোজ মাশরিকি, আনোয়ারি (মৃত্যু ১১৮৬ খ্রি.) জামালি (মৃত্যু ১৫৩৫ খ্রি.) জামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.) ফেরদৌসি (৯৪০-১০২০ খ্রি.) ও হেলালির কথা দক্ষতার সাথে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অলি (১৬৬৮-১৭৩০ খ্রি.) কেবল ফারসি সাহিত্য অধ্যয়ন করেননি, রবং অনেক ফারসি কবির বর্ণনাভঙ্গির প্রতিও তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিলো।

অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি কবিদের বর্ণনাভঙ্গি এবং ভাবনাগুলো উর্দু ভাষায় প্রকাশ করে গর্বের সাথে বলেছেন: 'আমার কবিতা সে-ই ভালোভাবে বুঝবে যার ফারসি কাব্যজগৎ সম্পর্কে গভীর অধ্যবসায় বা অবিরাম সাধনা রয়েছে'। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) বলেন:

یہ ریختہ ولی کا جا کر اسے سناؤ　　رکھتا ہے فکر روشن جو انوری کے مانند

(অলি, ২০০৮: ১২৭)

[অলির এই উর্দু কবিতা তাদের যেয়ে শোনাও যারা ফারসি কবি আনোয়ারির ন্যায় দীপ্ত চেতনা ধারণ করে।]

মোট কথা, অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) রচনার পরতে পরতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) গজল , কাসিদা, মাসনাভি যাই রচনা করেছেন তাতেই ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে রসদ গ্রহণ করেছেন। এমন কি বলা যায় যে, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হলে অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) উর্দু কবিতা বোঝা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

উর্দু সাহিত্যের এ বিখ্যাত কবির মৃত্যু সাল নিয়ে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। ড. আবু সাঈদ মুহাম্মদ নুরুদ্দিন বলেন: 'অলি ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন'। তবে এ মতামতটি সঠিক নয়। কারণ, ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) তাঁর রচিত দিওয়ান (ফারসি কাব্যগ্রন্থ) নিয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ড হরেন্দ্র চন্দ্র পাল বলেন: 'অলি ১৭৪৪ খ্রিষ্টব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন।' (পাল, ১৯৬২:৭০)

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) উর্দুকাব্য গোটা ভারতে উর্দু কাব্যচর্চার আবহ সৃষ্টি করেছিলো। পরবর্তী যুগের কবিগণ অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) থেকে উর্দু কাব্যচর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) পরবর্তী উর্দু কবিদের মধ্যে ফারসি শব্দ, কাব্যালঙ্কার ও অনুপ্রাস ব্যবহারে বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়।

মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) দেখানো পথে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যারা উর্দু সাহিত্যকে সাফল্যের উচ্চমার্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হন তাঁদের মাঝে মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) অন্যতম। মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁকে উর্দু কাসিদা কাব্যের সম্রাট বলা চলে। পিতা মির্জা মুহাম্মদ শফি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ কাবুলের অধিবাসী ছিলেন। পিতা ব্যবসার উদ্দেশে দিল্লিতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সাওদা ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই আরবি ও ফারসি ভাষা শিখেন। যৌবনে তাঁর কাব্যচর্চার সূচনা হয়। দিল্লির পরিবেশ ও সাহিত্য আবেদনকে সামনে রেখে প্রথমে তিনি ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা

শুরু করেন এবং ফারসি ভাষায় তাঁর কর্মপরিধি ব্যাপক আকার ধারণ করে। দিল্লির বিখ্যাত ফারসি ও উর্দু কবি শাহ হাতেমের[৭৩] (১৬৯৯-১৭৯১ খ্রি.) কাছ থেকে কবিতা সংশোধন করিয়ে নিতেন।

সাওদার উর্দু কাব্যচর্চায় খান আরজুর পরামর্শ

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) ফারসি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। দিল্লির প্রসিদ্ধ কবি খান আরজু (১৬৮৭-১৭৫৬ খ্রি.) পরামর্শে তিনি উর্দু কবিতা চর্চায় মনোযোগী হন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। এক পর্যায়ে তাঁর রচিত কবিতা দিল্লির পথে-ঘাটে আবৃত্ত হতে থাকে এবং সুনাম এ পরিমাণ ছড়িয়ে পড়ে যে, সম্রাট শাহ আলম (১৭২৮-১৮০৬ খ্রি.) তাঁকে কাব্যগুরু হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্রাট শাহ আলম (১৭২৮-১৮০৬ খ্রি.) নিজেও উর্দু ও ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিনাম ছিলো আফতাব। কিন্তু তাঁর দরবারে সাওদার (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) বেশিদিন থাকা হয়নি। সম্রাটের (১৭২৮-১৮০৬ খ্রি.) কোনো এক কথায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তিনি রাজ দরবার ত্যাগ করেন। এরপর তৎকালীন আমির-উমারাগণ এই শ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পীকে নিজেদের দরবারে অভ্যর্থনা জানালেও সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) সকলের আমন্ত্রণ অবহেলার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন।

সাওদার দিল্লি ত্যাগ

এক সময় আফগান ও মারাঠাদের আক্রমণে দিল্লিতে অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং দিল্লি উজাড় হতে শুরু করে। দিল্লির অন্যান্য কবির মতো সাওদাও (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) দিল্লি ছাড়তে বাধ্য হন এবং ৬০ বছর বয়সে ফখরাবাদে পৌঁছেন। প্রথমে তিনি ফখরাবাদের নবাব আহমদ খান বঙ্গিস গালিব জঙ্গের দেওয়ান মেহেরবান খান রিন্দুর দ্বারস্থ হন। রিন্দু কবিকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প সময়ের মাঝে তিনি মৃত্যুবরণ করলে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) লাক্ষ্ণৌর নবাব শুজা উদ্দৌলার (১৭৩২-১৭৭৫ খ্রি.) কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে নবাব আসিফুদ্দৌলার (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.) সময়ে সাওদা (১৭১৩১৭৮১ খ্রি.) মালিকুশ শুআরা বা রাজকবির খেতাবে ভূষিত হন।

সাওদা রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো: (১) *ফারসি দিওয়ান* (دیوان فارسی) বা ফারসি কবিতাসমগ্র। (২) *উর্দু দিওয়ান* (دیوان اردو) বা উর্দু কবিতাসমগ্র। (৩) *মাসনাভি* (مثنوی) বা দ্বিপদী কাহিনীকাব্য। এ কাব্যগ্রন্থে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) ২৪ টি গল্প কাব্যাকারে উর্দু ভাষায় বর্ণনা করেছেন। (৪) *উর্দু কাসিদা* (قصیدہ) স্তুতিমূলক কাব্য। (৫) *মারসিয়া* (مرثیہ) বা শোকগাথা। সাওদার (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) এ মারসিয়াগুলো কারবালার প্রান্তরে শহিদ হওয়া নবি দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.)-এর স্মরণে রচিত। (৬) *তাজকিরাতুশ শুআরা* (تذکرۃ الشعراء) বা কতিপয় উর্দু কবির জীবনী। এ গ্রন্থটি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) ফারসি ভাষায় রচনা করেছেন।

---

৭৩. পুরো নাম শেখ জাহিরুদ্দিন হাতেম। ফারসি ও উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। ফারসি কবিতা রচনায় মির্জা সায়েব তাবরিযির (১৫৯৩-১৬৬৯ খ্রি.) আর উর্দু কবিতা রচনায় অলির (১৬৬৮-১৭৩০ খ্রি.) অনুসরণ করতেন। বিখ্যাত কাসিদা সম্রাট সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) তাঁর থেকে কাব্য সংশোধন করিয়ে নিতেন। (ইউসুফ, ১৯৬৮: ৭৭)

সাওদা কাব্যে ফারসি কাব্যের প্রভাব

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) গজল, কাসিদা, মাসনাভি, মুখাম্মাস, মুসাদ্দাসসহ কাব্যরীতির প্রায় সকল আঙ্গিকের কবিতা সাফল্যের সঙ্গে রচনা করেছেন। তবে সাওদার (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) সুখ্যাতি হলো কাসিদা রচনায়। তিনি নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টিতেও অতুলনীয় শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) অত্যন্ত উঁচু মাপের একজন কবি। উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মাঝে তিনি অন্যতম। তাঁর কবিতায় সুফি-মরমিবাদীর অনুরক্তি নেই। তাঁর মাঝে সেযুগের ঘটনাবলি হতাশা বা বিরাগভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়নি; বরং তাঁর মাঝে সৃষ্টি হয়েছে এক বিদ্রোহভাব। তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিলো কাসিদা তথা স্তুতিমূলক রচনায়। এই স্তুতিমূলক কবিতায় গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) রচিত অসংখ্য পঙ্‌ক্তিতে ফারসি কবিতার ভাব-দর্শন অনুরণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের অনুসরণ-অনুকরণ করেছেন।

ফারসি সাহিত্যে শরাবের ব্যবহার ছিলো খুব বেশি। এ কথা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। ইরানিদের শরাব আসক্তির কথা উল্লেখ করে ড. আন্দালিব শাদানি[৭৪] (১৯০৪-১৯৬৯ খ্রি.) বলেন:

آج بھی جس عمومیت کے ساتھ ایران میں شراب پی جاتی ہے اسکی مثال کسی ایشیائی ملک میں تو کیا یورپ میں بھی مشکل سے ملے گی۔

(শাদানি, ১৯৬২: ৪০)

[আজও ব্যাপকভাবে ইরানে শরাব পান করা হয়। এর উপমা এশিয়ার কোনো দেশ তো দূরের কথা, ইউরোপের অনেক দেশে পাওয়াও কষ্টসাধ্য।]

শরাব পরিবেশনকারীর প্রতি আলাদা আকর্ষণের বিষয়গুলো ফারসি কাব্যের পরতে পরতে স্থান পেয়েছে। যেমন শেখ সাদি শিরাজি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) শরাব পরিবেশনকারীর কাছে নিবেদন করে বলেন:

ساقی بیار جامی کز زھد توبہ کردم　　مطرب بزن نوایی کز توبہ عار دارم

(শেখ সাদি, অনু: গজল নম্বর ৩৮৯)

---

৭৪. ড.ওজাহাত হুসাইন আন্দালিব শাদানি। জন্ম ১৯০৪ খিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশে। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে অর্জন করেন। মাদরাসা আলিয়া রামপুর থেকে ফাজেল বা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে বি, এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২৮ খ্রিষ্টব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগের শিক্ষক পদে নিয়োগ পান। এক সময় তিনি কলা অনুষদের ডিন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আন্দলিব শাদানি উর্দু সাহিত্যের একজন সব্যসাচী লেখক। ছোটা খুদা (چھوٹا خدا), *নাশাতে রাফতা* (نشاط رفتہ), *সাচ্চি কাহানিয়া* (سچی کہانیاں), *দাওরে হাজের আওর উর্দু গজল গুয়ি* (دور حاضر اور اردو غزل گوئی) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, খণ্ড, ১ : ৩৭৩)

[হে শরাব পরিবেশনকারী, এক পেয়ালা সুরা দাও। আমি দুনিয়াবিরাগী হওয়া থেকে তওবা করছি। হে নর্তক! একটি গান বাজাও, তওবা করা থেকে আমি লজ্জা পাচ্ছি।

এ কবিতার ভাবের অনুকরণ করে সাওদা (৭১১৩-৭১৮১ খ্রি.) বলেন:

ابھی تو بزم میں آئے ہیں تیرے اے ساقی کوئی دنوں تو مزہ لینے دے ایاغوں کا

(সাওদা, ১৯৮৫ : ১৮৫)

[হে সাকী, তোমার পানশালার মাহফিলে তো মাত্র এলাম। আগমনকারীকে কয়েকটি দিন শরাবের পেয়ালায় মজা নিতে দাও।]

সুফি-সাধক, উপদেশ দাতা, দুনিয়া বিরাগি সাধকগণ শরাব পানের বিরুদ্ধে বললে শরাবপানকারীর হৃদয়ে আঘাত লাগতো। শরাব পানের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে ফারসি কবিগণ তাঁদের অবাদে সমালোচনা করেছেন। ফলে, যারা শরাব পানে অভ্যস্ত ছিলেন তারা তো বাস্তবে তাদের সমালোচনা করেছেন, আর যারা শরাব পানে অভ্যস্ত ছিলেন না তারা কেবল মদ্যপ কবিদের অনুসরণ করে সমালোচনা করেছেন। যেমন ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি নজিরি বলেন:

فائده نمی ده د داروئ تلخ ناصحا این غم ناگوار را بادهٔ خوشگوار کو

(নাজিরি, ১৯৬১: ২৮৪)

[হে উপদেশ দাতা, এই ব্যথিত ব্যক্তির কাছে শরাবপানকারীর প্রতি তিক্ত ঔষধ কোনো কাজে আসে না।]

এই কবিতার ভাবের অনুসরণ করে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) বলেন:

ہم نے میخانے میں آ کے سدھ سنبھالی محتسب وعدۂ کوثر پہ واعظ کیجئے ترک جام ے

(সাওদা, ১৯৬১: ২৮৫)

[আমি শরাব খানায় এসে সর্বদা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখি। হে নসিহতকারী, কাল হাশরে হাউসে কাউসারের লোভ দেখিয়ে শরাব ছেড়ে দেওয়ার ওয়াদা নাও।]

ফারসি ও উর্দু কবিতায় শরাব প্রসঙ্গ

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে মদ ও শরাবের উল্লেখ একটি স্বাভাবিক বিষয়। হাজার খ্রিষ্টাব্দ থেকে ষোলশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কবি নেই যার কবিতায় শরাব বা মদের প্রসঙ্গ আসেনি। বিখ্যাত ফারসি কবি উমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খ্রি.) এবং গজল সম্রাট হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.)-এর কবিতায় এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ শরাব ও মদের মর্মার্থ বা উদ্দেশ্য অনেক সময় বাস্তবিক না হয়ে রূপক হয়ে থাকে। ফারসি কবিতার মতো শরাবের প্রশংসা, শরাবের নেশায় বুদ হওয়া, শরাব

পানের আকাঙ্খা, সাকী বা শরাব পরিবশনকারীর কাছে শরাব ঢেলে দেওয়ার আকুতি ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো উর্দু কবিতায়ও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে বর্ণিত হয়েছে।

উর্দু ভাষায় আঞ্চলিক হিন্দি ভাষার প্রভাব দূর করে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফারসি ভাষা ব্যাঞ্জনার দ্বারা উর্দু ভাষাকে আলোকিত করেছেন। তিনি ফারসি শব্দ, প্রবাদ, অনুপ্রাস ও বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে উর্দু ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তোলেন। ঐতিহাসিক রাম বাবু সাক্সেনা (১৮৯৬-১৯৫৭ খ্রি.) বলেন:

مرزا سودا نے اکثر ہندی الفاظ کو دور کر کے فارسی کی آمیزش سے زبان اردو میں شیرینی اور حلاوت پیدا کی اور فارسی سے کثرت الفاظ و محاورات اور تلمیحات زبان اردو میں داخل کیے اور اس استادی سے داخل کیے کہ اس کے جزو ہو گئے۔

(সাক্সেনা, ১৯৫২: ১১২)

[মির্জা সাওদা অধিকাংশ হিন্দি শব্দকে দূর করে ফারসির সংমিশ্রনে উর্দু ভাষাকে একটি মিষ্টিভাষায় পরিণত করেছেন। তিনি অধিক পরিমাণ ফারসি শব্দ, প্রবাদ ও ইঙ্গিতবহ পরিভাষা উর্দু ভাষায় এমন দক্ষতার সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, এক পর্যায়ে তা উর্দু ভাষার অংশ বলে পরিগণিত হয়েছে।]

সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) মূলত একজন ফারসি কবি। ফারসি ভাষায় তাঁর রচনার সংখ্যাও বেশি। উর্দু কবিতা রচনা করেছেন কেবল মাতৃভাষার টানে। তবে তাঁর কবিতার প্রতিটি চরণে ছিলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব। যারা উর্দু কবিতার মাধ্যমে ফারসি শব্দ, ভাব এবং দর্শনের আলোকময় দিশা এ উপমহাদেশের সাধারণ পাঠকের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) অন্যমত। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে এ কাসিদা সম্রাটের মৃত্যু হয়। আজও উর্দু পাঠক মহল এই কাসিদা সম্রাটের রচিত কবিতা আগ্রহভরে পাঠ করে।

মির তাকি মির

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রভাবিত আরেকজন উর্দু কবি হলেন খাজা মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.)। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ একজন সুফি ও দরবেশ ব্যক্তি ছিলেন। মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) পূর্বপুরুষ হেজাজ থেকে ভারত আগমন করেন এবং আকবরাবাদে বসতি স্থাপন করেন। পিতার থেকেই তিনি প্রাথমিকশিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালে তাঁর পিতার মৃত্যু বরণ করেন।

এ সময় সুযোগ বুঝে মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) বড় ভাই কৌশলে সমস্ত সহায়-সম্পদ আত্মসাৎ করলে মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) বাধ্য হয়ে দিল্লি চলে আসেন। কিছু দিন উর্দু ও ফারসি ভাষার অন্যতম কবি সিরাজুদ্দিন খান আরজুর (১৬৮৭-১৭৫৬ খ্রি.) কাছে কবিতার সম্পাদনা করতেন।

দিল্লির বাদশাহদের পারস্পরিক গৃহ যুদ্ধের ফলে মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) বারবার চাকুরিচ্যুত হন এবং এক পর্যায়ে মথুরার সুরজমল জাটের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুরজমল জাটের আশ্রয়ে তিরিশ

বছর অতিবাহিত করার পর জাটদের বিদ্রোহের ফলে কামান নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকালপর আশ্রয়হীন হয়ে তিনি আবার দিল্লি ফিরে আসেন। এরপর লাক্ষ্ণৌর নবাব আসিফুদ্দৌলার (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.) আমন্ত্রণে লাক্ষ্ণৌ পাড়ি জমান এবং নবাব আসিফুদ্দৌলার (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.) দরবারে দু'শো টাকা মাসিক ভাতায় সভাকবি হিসাবে নিয়োগ পান।

মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল বলেন: 'ব্যক্তিগতভাবে তিনি আত্মাভিমানী ও অহংকারী ছিলেন। এ কারণে তাঁর সারাটি জীবন কেবল কষ্টে কেটেছে। এক কবিতায় তিনি নিজেকে অজগর আর বাকি কবিদের অজগর কর্তৃক ভক্ষিত প্রাণী বলে উল্লেখ করেছেন।' (পাল, ১৯৬২: ১০৭)

মির তাকি মির রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ

মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) ফারসি ও উর্দু ভাষায় অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো (১) গজল সম্বলিত ছয়টি বৃহদাকারের দিওয়ান বা কাব্যসমগ্র (دیوان)। (২) অজগর নামা (اژدرنامہ) , শুলায়ে ইশক (شعلۂ عشق) , খাব ওয়া খিয়াল (خواب وخیال) সহ প্রায় দশটি মাসনাভি বা দ্বিপদী কাহিনীকাব্য। (৩) একটি ফারসি দিওয়ান বা কাব্যসমগ্র (دیوان فارسی)। (৪) জিকরে মির (ذکر میر) ফারসি ভাষায় লিখিত মির তাকি মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) আত্মজীবনী। (৫) তাজকিরায়ে নুকাতুশ শুআরা (تذکرۃ نکاۃ الشعراء) বা ফারসি ভাষায় লিখিত উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী।

এ ছাড়াও ফারসির অনুকরণে উর্দু ভাষায় মুসাল্লাস, মুরাব্বা ও মুখাম্মাস অর্থাৎ তিন, চার ও পাঁচ স্তবকবিশিষ্ট কবিতার চরণ সৃষ্টি করার পাশাপশি অনেক ফারসি কবিতার কাব্যানুবাদ করেছেন। তিনি কাসিদা, রুবায়ি ইত্যাদি ছন্দেও কবিতা লেখেছেন।

মির তাকি মিরের গজল

মির তাকি মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি) সুখ্যাতি উর্দু গজল বা গীতিকাব্য রচনায়। তিনি গজল রচনায় উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি। নিজের দুঃখময় জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে তাঁর গজলে। গজল কবিতায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা পরবর্তীকালের কবিগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তিনি মূলত দুঃখ আর নৈরাশ্যের কবি। মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) ও তাঁর সমসাময়িক কবি মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.)- এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে হুসাইন মুহাম্মদ আজাদ (১৮৩০-১৯১০ খ্রি.) বলেন:

دونوں صاحب کمال ہیں۔ مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور میرزا کا کلام واہ ہے۔

(আজাদ, ১৯৫০ : ৮৭)

[উভয়ে উচ্চমার্গের কবি। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) কবিতা শুনে ব্যথায় আহ! আর মির্জা সাওদার (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) কবিতা শুনে খুশিতে ওহ! বলতে হয়।]

মির তাকি মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) কাব্যে ফারসির প্রভাব

মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) কবিতার পরতে পরতে ছিলো ফারসি কবিতার প্রভাব। তিনি দক্ষতার সাথে অনেক ফারসি প্রবাদকে উর্দু কবিতায় ব্যবহার করে উর্দু ভাষায় রূপান্তর করেছেন। যেমন: তার আভে(تر آوے) লজ্জিত হওয়ার প্রবাদটি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি) উর্দু গজলে ব্যবহার করে বলেন:

کھلتے میں ترے منہ کی کلی پھاڑے گریبان　　ملنے ترے رہونٹوں کے گلبرگ تر آوے

(মির, ১৯৪১: ১৬৬)

[তোমার মুখের বাক্যবাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার গণ্ডদেশের সৌন্দর্যের সামনে গোলাপ পাপড়ি লজ্জিত হয়।]

প্রেমের অমর কাহিনীগুলোর মধ্যে ‘লাইলি-মজনু’ ও ‘শিরিন-ফরহাদ’ প্রায় সকলের কাছে প্রসিদ্ধ। এ ঘটনাগুলো উর্দু ভাষায় ফারসির অনুকরণে বিবৃত হয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের কবিগণ প্রেমের বর্ণনায় শ্রেষ্ঠত্বের ও রুচিবোধের মহিমা প্রকাশ করতে যেয়ে নিজেকে কায়েস তথা মজনুর চেয়েও বড় প্রেমিক বলে দাবি করেছেন। এ ক্ষেত্রে নিজের প্রেমের ব্যর্থতা ও হতাশার বর্ণনা দিতে গিয়ে ফারসি কবিতায় কবিগণ কাপড় টুকরো টুকরো করা, জামা-কাপড় ফেড়ে ফেলা, আঁচল উড়িয়ে দেওয়া, তালি বাজানো, চিৎকার-চেচামেচি করা, নিজেকে পাথর দিয়ে আঘাত করা, মরুভূমিতে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। ফারসির অনুকরণে উর্দু ভাষায় মির তাকি মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) কবিতায় এরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিখ্যাত ফারসি কবি সায়েব তাবরিজি (১৫৯৩-১৬৬৯ খ্রি.) বলেন:

مبر حسرت اگر فوت تو شد نظارۂ مجنون　　بسیر من بیا صد دشت مجنون را تماشا کن

(সায়েব, ১৯৬১: ২৮৭)

[আফসোস করোনা যদি তুমি মজনুনের মতো দৃশ্য দেখতে না পাও। তবে আমার কাছে আসো, মরুভূমির শত মজনুনকে আবলোকন করতে পারবে।] এ ধরণের ফারসি কবিতার অনুসরণ করে মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) বলেন:

نہ دیوانے تھے ہم سے قیس وفرہاد　　ہمارا طور عشق ان سے جدا تھا

(মির, ১৯৪১ : ৬২৭)

[আমি কায়েস (মজনু) ও ফরহাদ থেকে কম পাগল ছিলাম না। আমার ভালোবাসার ধরন তাদের থেকে আলাদা ছিলো।]

অন্যত্র মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) বলেন :

گزرے ہے لہو دھال سر ہر خار سی اب تک　　جس دشت میں پھوٹا ہے مرے پاؤں کا چھالا

(মির, ১৯৪১ : ৩৯)

[মাথায় কাঁটার আঘাতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এখনো। যে মরুপ্রান্তরে চলতে চলতে আমার পায়ের চামড়া ছিলে গেছে।]

উর্দু সাহিত্যের সোনালী যুগ

মির এবং সাওদার (১৭২০ থেকে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ) সময়কালকে উর্দু সাহিত্যের আহদে জারিন (عہد زرین) বা সোনালী যুগ বলা হয়। এ যুগে এমন কিছু কবির আবির্ভাব হয় যাঁরা উর্দু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ যুগে সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) কাসিদা লিখে, মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) মাসনাভি লিখে এবং মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) গজল লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এ যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্যচর্চা ও ফারসি শব্দের বাহুল্য প্রয়োগ। উর্দু ভাষার বিভিন্ন কবিতা রচনায় কবিগণ এ সময় কেবল ফারসি ধারারই অনুসরণ করেছেন।

এ সময় দিল্লির সাহিত্য আসরগুলো ক্রমে ক্রমে উজাড় হতে শুরু করে। দিল্লির কবিসাহিত্যিকগণ লাক্ষ্ণৌতে পাড়ি জমান। যে কারণে লাক্ষ্ণৌর সাহিত্য আসরগুলো আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে কবিদের মাঝে শুরু হয় কাব্যচর্চার প্রতিযোগিতা। কিন্তু এ প্রতিযোগিতা অনেক সময় অপ্রীতিকর ও অনুকাঙ্খিত হয়ে উঠেছিলো। এ সকল অনাকাঙ্খিত প্রতিযোগিতাগুলোকে উর্দু সাহিত্যের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোতে বেশ সুখপাঠ্য হিসাবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। কোনো কবির সাহিত্য-শিল্পবোধ বা রচনাকৌশল সম্পর্কে অবগতির জন্য দুজন কবির কবিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ হতে পারে কিন্তু তা লোক চক্ষুর অন্তরালে হওয়া বাঞ্চণীয়। দু'জন কবির কবিতার তুলনা করার জন্য তাঁদের এক মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেওয়া সাহিত্য রুচিবোধের পরিচায়ক নয়।

কবি মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি) এবং সাওদাসহ (১৭২০-১৭৮১ খ্রি.) অনেক কবিকেই এমন অশালীন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। লাক্ষ্ণৌর বাজপাখির লড়াই, মোরগ লড়াই, কবুতরের লড়াই ছিলো উপভোগ্য বিষয়। তাই বলা যায় কবিদের মাঝেও এমন অশালীন লড়াই লাক্ষ্ণৌর প্রচলিত পরিবেশে উর্দু সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তৎকালের সাহিত্যপ্রেমী শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি নান্দনিক মনে হলেও তা ছিলো অত্যন্ত গর্হিত কাজ। অবশেষে ফারসি সাহিত্যের মরমি প্রভাবে উর্দু সাহিত্যের এ দুষ্টচর্চার অবসান ঘটে।

মির তাকি মির (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) ছিলেন উর্দু সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করে উর্দু সাহিত্যের কাজলজয়ী কবি মির্জা আসাদুল্লাহ গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) বলেন:

ریختی کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب　　کہتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں کوئی میر بھی تھا

(গালিব, ১৯২১ : ১৯৫)

[হে গালিব, রিখতা তথা উর্দু ভাষার তুমি উস্তাদ নও। কারণ, লোকেরা বলে, পূর্বের জমানায় মির নামে কোনো একজন কবিও ছিলেন।]

মির হাসান

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে প্রভাবিত উর্দু সাহিত্যের আরেকজন দিকপাল হলেন মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.)। তিনি ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মির গোলাম হাসান জাহেক। তিনিও উর্দু সাহিত্যে লাক্ষ্ণৌ ধারার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। মির হাসানের (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) পূর্বপুরুষ আফগানিস্তানের হিরাত থেকে ভারতে আসেন। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন দিল্লিতে। পিতার হাতেই তাঁর কাব্যচর্চার হাতেখড়ি। পরে দিল্লির আরেক শ্রেষ্ঠকবি মির দরদ[৭৫] (১৭২০-১৭৮৫ খ্রি.) থেকে কবিতা সংশোধন করাতেন।

দিল্লির পতন শুরু হলে মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) পিতার সাথে অযোধ্যায় চলে আসেন। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আসিফুদ্দৌলা (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.) যখন রাজধানী লাক্ষ্ণৌতে স্থানান্তর করেন তখন মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) অযোধ্যা থেকে লাক্ষ্ণৌ চলে আসেন। মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক মির হাসানকে (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) তৎকালের বিখ্যাত কাসিদা সম্রাট মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদার (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তথ্যটি সঠিক নয়। এ বিষয়টি সম্পর্কে রাম বাবু সাক্সেনার রচিত গ্রন্থ *History of Urdu Leatareture* -এর অনুবাদক মির্জা মুহাম্মদ আসকারি মির হাসানের (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন: 'স্বয়ং মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) বলেছেন যে, তিনি লাক্ষ্ণৌতে অবস্থানকালে মির জিয়ার থেকে কাব্য সংশোধন করাতেন।' এ বিষয়টি মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) তাঁর বন্ধুর কাছে লিখিত এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন:

اصلاح سخن از میر ضیا گرفتہ ام۔ لیکن طرز او شان از من کما حقہ سر انجام نیافت۔ بر قدم دیگر بزرگان مثل خواجہ میر درد، مرزا رفیع سودا و میر تقی پیروی نمودہ ام۔

(সাক্সেনা, ১৯৫২ : ১২৩-১২৪)

[আমি মির জিয়া থেকে কবিতা সংশোধন করিয়েছি। তবে লেখার ঢঙ্গের অনুসরণ আমি পুরোপুরি করতে পারিনি। এ ক্ষেত্রে আমি উর্দু ভাষার অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক যেমন খাজা মির দরদ, মির্জা রাফি সাওদা ও মির তাকি মিরের অনুসরণ করেছি।]

---

৭৫. খাজা মির দরদ (১৭২০-১৭৮৪ খ্রি.) দিল্লির একজন বিখ্যাত কবি। জন্ম ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে। প্রথম জীবনে একজন সৈনিক ছিলেন। পরবর্তীতে সকল কিছু ছেড়ে নির্জনবাসে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন। দেওয়ানে ফারসি এবং দেওয়ানে উর্দুসহ তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো এগারোটি। দেওয়ানে উর্দু গ্রন্থের জন্যই তাঁর সুখ্যাতি। তাঁর কবিতায় হিন্দি ভাষার প্রভাব ছিলো বেশি। তিনি দেওয়ানে উর্দু গ্রন্থে ফারসি শব্দের স্থলে হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লিতে মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ৫৩৫)

মির হাসান রচিত গ্রন্থসমূহ

মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হলো মাসনাভি সিহরুল বয়ান (*مثنوی سحر البیان*)। এ ছাড়াও তাঁর আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে।

১. *দিওয়ানে উর্দু* (*دیوان اردو*) বা উর্দু কাব্যসমগ্র। এতে উর্দু গজল (গীতিকাব্য), মুখাম্মাস (পঞ্চপদী কাব্য), মুসাল্লাস (তৃপদী কাব্য) প্রভৃতি আঙ্গিকের কবিতা রয়েছে।

২. *কাসিদা কাব্য* (*قصیدہ*)। এ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় নবাব আসিফুদ্দৌলার (১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.) গুণ-কীর্তন করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি কাসিদা ধর্মীয় গুরুদের প্রশংসায় লেখা হয়েছে।

৩. *মারসিয়া* (*مرثیہ*) বা শোকগাথা। এ কাব্যগ্রন্থে হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের বেদনাদায়ক শাহদাতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

৪. *তাজকিরা* বা জীবনীগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) ফারসি ভাষায় রচনা করেছেন। এতে প্রায় তিনশ প্রাচীন ও সমসাময়িক উর্দু কবি সাহিত্যকদের জীবনী ও তাঁদের রচনাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

৫. *এগারটি মাসনাভি* বা দ্বিপদী কাহিনীকাব্য। এ কাহিনীকাব্য রচনা করেই মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে উর্দু সাহিত্যের এ মহান ব্যক্তিত্ব মৃত্যুবরণ করেন।

মির হাসানের রচনায় ফারসির প্রভাব

মির হাসানের (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) লেখায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত কাহিনীকাব্য *মাসনাভি সিহরুল বয়ান* (*مثنوی سحر البیان*) ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফারসি ভাষায় প্রচলিত ঘটনা প্রবাহ ছিলো তাঁর কাহিনীকাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) রচিত *মাসনাভি সিহরুল বয়ান* বা *কিস্‌সায়ে বদরে মুনির* (*بدر منیر*) মূলত একটি প্রেম কাহিনীনির্ভর কাব্য। এ কাব্যের সূচনা পর্বে তিনি আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) বিরচিত *কিস্‌সায়ে চাহার দরবেশ* (قصہ چہار درویش) -এ বর্ণিত গল্পটিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে নিজ ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

এ গল্পে দেখা যায় যে, এক বাদশাহর প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, অর্থ-সম্পদ সব কিছুই ছিলো; কিন্তু কোনো সন্তান ছিলো না। মাসনাভির সূচনা পর্ব এ ঘটনা দিয়ে শুরু করে লেখক ঘটনার মূলচরিত্র রাজপুত্র বেনজিরের সাথে রাজকন্যা বদরে মুনিরের প্রেম-কাহিনীর উপাখ্যান উল্লেখ করেছেন। এতে লেখক মাহেরুখ নামে পরিজাত সুন্দরির ঘটনা অবতারণা করে ত্রিভুজ প্রেমের এক দ্বান্দিক কাহিনী নির্মাণ করেন। এ মাসনাভিতে লেখক আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত *আলিফ লাইলা*-এর অনুকরণ করেছেন। প্রচুর পরিমাণে ফারসি শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে কোথাও কোথাও বিখ্যাত ফারসি কবি শেখ সাদি

(১২১০-১২৯১ খ্রি.)-এর বুস্তান (بستان) ও গুলিস্তান (گلستان) গ্রন্থের অনুকরণে পঙ্‌ক্তিমালা উল্লেখ করে ঘটনাপ্রবাহকে আরো প্রাণবন্ত করেছেন।

উর্দু ভাষায় তাসাওফ বা আত্মশুদ্ধির ধারণা ফারসি ভাষা ও সাহিত্য থেকে এসেছে। মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) তাঁর রচিত মাসনাভি *রুমুজুল আরিফিন* (*رموز العارفین*) নামক গ্রন্থে তাসাওফ বা আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন বিষয়াদি ও ঘটনাবলির উল্লেখ করতে যেয়ে ফারসির প্রসিদ্ধ ঘটনাবলির অনুসরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মির হাসানকে (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) গ্রন্থের অনেক আলোচ্য বিষয়কে সামনে রেখে কাব্যচর্চা করতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) বিখ্যাত গ্রন্থ *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی) থেকে পঙ্‌ক্তি এনে মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) নিজের কাব্যগ্রন্থের শোভা বাড়িয়েছেন। কাজেই বলা যায় যে, এ সকল ফারসি কবিতা তৎকালের উর্দু পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য ছিলো।

পারস্য কবি ফরিদুদ্দিন আত্তারের বিখ্যাত ঘটনা

পারস্যের সুফি সাধক ও বিখ্যাত কবি ফরিদুদ্দিন আত্তারের (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) আধ্যাত্মিক সাধনার একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায়। যার সারমর্ম হলো একদা কবি ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) তাঁর আতরের দোকানে বসে আছেন। এ সময় একজন ফকির আসলো এবং দোকানটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। কবি ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) ফকিরকে এভাবে পর্যবেক্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে ফকির বলল, 'আমি ভাবছি এতো সম্পদ রেখে তুমি এ পৃথিবী থেকে কীভাবে যাবে? তোমার তো এ পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় অনেক কষ্ট হবে'। কবি ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) বললেন, 'তোমার কি এ পৃথিবী থেকে যাওয়া সহজ হবে?' ফকির উত্তরে বলল হ্যাঁ। এই দেখো বলে সে শুয়ে পড়লো এবং সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করলো, এ ঘটনা কবি ফরিদুদ্দিন আত্তারের (১১৪৬-১২২৯ খ্রি.) উপর গভীর রেখাপাত করলো এবং তিনি পৃথিবীর আরাম-আয়েশ ও জৌলুসের জীবন ত্যাগ করে ফকিরি জীবন অবলম্বন করলেন।

ঘটনাটি মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন:

دل ملا ایسے سے ای شوریدہ سر　　جس کی الفت دے سدا تجھ کو ثمر

بات پر دو دن کی مت مغرور ہو　　اس سے ہو نزدیک سب سے دور ہو

اور سب دو دن کے ہے یہ دوست دار　　اول و آخر وہی ہے تیرا یار

(হাসান, ১৯৬১: ৩৬৫)

[হে পাগল মন, হৃদয়ের সম্পর্ক গড় এমন সত্তার সাথে– যার ভালোবাসা সর্বদা তোমার জন্য কাজে আসে। দু' দিনের বিষয়ে তুমি দাম্ভিকতা দেখিও না। সকলের থেকে দূরে অবস্থান করে তুমি সে সত্তার

প্রিয় ভাজন হও। এ সকল কিছু দু'দিনের স্বল্পসময়ের বন্ধু। সূচনা এবং অন্তিম যাত্রা তোমারও তাদের মতোই হবে।] এ ঘটনার শেষ অংশে মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) *মাসনাভি মানাভির* (مثنوی معنوی) পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করে বলেন:

تو مگو مارا بدان شه بار نیست　　با کریما کار ها دشوار نیست

عشق آن حق را گزین کو باقی است　　کز شراب لا یزالی ساقی است

(রুমি, ১৩৭৩ সৌ.: ৩০১)

[তুমি তোমার সমস্যার কথা আমাদেরকে বলো না; বরং সে সত্তাকে বলো যার কাছে কোনো সমস্যাই বোঝা নয়। সে সম্ভ্রান্ত সত্তার কাছে কোনো বিষয় কঠিন নয়। সে সত্তার সাথেই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলো, কারণ, তিনি চিরস্থায়ী। সাকী হলো অনিঃশেষ চিরন্তন শরাব পরিবেশনকারী।]

মির হাসানের (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) *রুমুজুল আরিফিন* (*رموزالعارفین*) মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, এ মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) *মাসনাভিয়ে মানাভি* (مثنوی معنوی)-এর অনুকরণে রচিত। এ মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটিতে মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) প্রতিটি ঘটনাতেই মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) *মাসনাভি* থেকে দুই-দুই, তিন-তিন বা চার-চারটি করে পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মির হাসানের মধ্যে (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.) ফারসি সাহিত্যের প্রভাব বিশেষত ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) ও মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) প্রভাব ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিলো।

সাআদাত ইয়ার খান রঙ্গিন

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে প্রভাবিত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের আরেকজন কবি হলেন সাআদাত ইয়ার খান রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.)। রঙ্গিন ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সারহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা তহমাম্প বেগ খান। তিনি পারস্যের তুরস্ক থেকে ভারত আসেন।

রঙ্গিনের সাহিত্যকর্ম

শৈশবকাল থেকেই কবি রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) কাব্যচর্চা করতেন। প্রথম জীবনে দিল্লির বিখ্যাত কাব্যগুরু শাহ হাতেম[৭৬] (১৬৯৯-১৭৯১ খ্রি.) তাঁর কবিতা সংশোধন করে দিয়েছেন। রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) লাক্ষ্ণৌর দরবারি কবি ছিলেন। লাক্ষ্ণৌর দরবারি কবি ইনশার (১৭৫২-১৮১৭ খ্রি.) সাথে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিলো। *মাসনাভিয়ে দিল পাজির* (مثنوی دلپذیر), *মাজাহারুল আজাইব*

৭৬. শাহ হাতেমের পুরো নাম শেখ জাহিরুদ্দিন শাহ হাতেম। পিতা শেখ ফাতাহুদ্দিন। ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফারসি ও উর্দু কবিতা সমান্তরালভাবে লিখেছেন। তিনি ফারসি কাব্যচর্চায় মির্জা সায়েব এবং উর্দু কাব্যচর্চায় অলির অনুসরণ করেছেন। তাঁর একটি ফারসি কাব্যগ্রন্থ *দিওয়ান হাতেম* (دیوان حاتم) নামে পাওয়া যায়। কাব্য সম্পাদনায় সাওদাসহ তিনি উর্দু সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত কবিদের শিক্ষক ছিলেন। ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭, খণ্ড, ২ : ৪৯১)

(مظہر العجائب), *মাজালিসে রঙ্গিন* (مجالس رنگین) এবং *ইজাদে রঙ্গিন* (ایجاد رنگین) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি লাক্ষ্ণৌ সাহিত্যে প্রচলিত রিখতি রীতির প্রবর্তক ছিলেন। রঙ্গিন ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে লাক্ষ্ণৌতে মৃত্যুবরণ করেন।

রঙ্গিনের কবিতায় ফারসি কবি শেখ সাদি ও রুমির প্রভাব

রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) রচিত *ইজাদে রঙ্গিন* (ایجاد رنگین) মূলত একটি মাসনাভি বা দ্বিপদীকাহিনী কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক রূপকথা ও হাস্যরসপূর্ণ গল্পের সমাবেশ ঘটেছে। ৩০ পৃষ্ঠা সম্বলিত *ইজাদে রঙ্গিন* (ایجاد رنگین) গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হয়, রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ও শেখ সাদির (১২১০-১২৯১ খ্রি.) থেকে কাব্যানুসরণে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) এ মাসনাভি গ্রন্থে অনেক স্থানে ফারসি কবি মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ও শেখ সাদির (১২১০-১২৯১ খ্রি.) কবিতার ভাবার্থ উল্লেখ করেছেন। যেমন রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) শত্রু সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেন:

چوتھے عاجز ہووے گر اپنا عدو　　ہو جیو ایمن نہ اسے ایک سو

جی میں اس کو جانیو سب سے کڑا　　مجھیو سب پہلوانوں سے بڑا

(রঙ্গিন, ১৮৫২ : ১২)

[চতুর্থ উপদেশ হলো, যদি তোমার শত্রু অক্ষমও হয়ে যায়, তবে তার থেকে নিজেকে শতভাগ নিরাপদ মনে কর না। জীবনে তাকেই মনে করবে সবচেয়ে তিক্ত। তাকে সকল বীরদের মাঝে বড় বীর মনে করো।]

রঙ্গিনের (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) এই কবিতাটি মূলত ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি শেখ সাদির (১২১০-১২৯১ খ্রি.) নিম্নোক্ত কবিতার ভাবার্থ। শেখ সাদি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) বলেন:

دانی کہ چہ گفت زان بار ستم گرد　　دشمن نتوان حقیر و بیچارہ شُمرد

(সাদি, অনু: ৩৬৬)

[জেনে রাখো, সে সময় জালিম কি বলেছিলো, দুশমনকে কখনো তুচ্ছ ও অসহায় মনে করোনা।]

এক স্থানে রঙ্গিন (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) লোভের অপকারিতা এবং অল্পে তুষ্টির উপকারিতা বর্ণনা করতে যেয়ে নিজের মতের সমর্থনে মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) কবিতা উল্লেখ করে বলেন:

ہے قناعت نوجواں مردوں کا کام　　شاہد اس پر مولوی کا ہے کلام

کاسۂ چشم حریصاں پر نہ شد　　تا صدف قانع نہ شد پر در نہ شد

(রুমি, ১৯৬১ : ৩৬৭)

[অল্পেতুষ্ট থাকা হলো বীরপুরুষদের কাজ। এ ব্যাপারে মাওলানা রুমির বক্তব্য রয়েছে। লোভি ব্যাক্তির চোখের পেয়ালা পূর্ণ হয় না। যেমন শামুক তুষ্ট না হলে পূর্ণ ঝিনুক তৈরি হয়না।]

রঙ্গিনের কবিতার বৈশিষ্ট্য

রঙ্গিনের (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) কবিতায় সমাজ চেতনার কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সময় ইংরেজদের প্রভাবে ভারতের কবিগণ আধুনিক কবিতার দিকে অগ্রসর হলে কবিতার দু'টি ধারার সৃষ্টি হয়। আধুনিক ধারা আর প্রচীন ধারা। আধুনিক ধারা বলতে মূলত লাক্ষ্ণৌ ধারার কবিতা। আর প্রাচীন ধারা বলতে দিল্লি ধারার কবিতা।

রিখতি কবিতা

সাআদাত ইয়ার খান রঙ্গিনসহ (১৭৫৫-১৮৩৫ খ্রি.) লাক্ষ্ণৌ ধারার অনেক কবি এ সময় রিখতি নামে অশ্লীল কবিতা রচনা করেন। এই রিখতি কবিতার মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো দরবারের নর্তকী ও বারাঙ্গনাদের পক্ষ থেকে প্রেম-ভালোবাসা নিবেদনের বিষয়টি উল্লেখ করা। স্বাধীন বা মুক্ত চিন্তার নামে সাধারণ তরুণ-তরুণীদের বেহায়াপনার দিকে উৎসাহিত করার এই দুষ্টুভাবনাটি এক সময় গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে উর্দু কবিতা ফারসি কবিতার অনুসরণ করে দীর্ঘকাল প্রেমিক তার প্রেমিকাকে সম্বোধন করেছে; সেখানে রিখতি ধারার কবিতায় সম্বোধন সম্পূর্ণ উল্টে যায়। মেয়েরা এখানে তার প্রেমিককে সম্বোধন করতে আরম্ভ করে। এ সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার ছড়িয়ে পড়েছিলো; উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটে রিখতি কবিতার মাধ্যমে।

এ সময় উর্দু কবিদের রচনার মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো নর্তকী ও বারাঙ্গনাদের সৌন্দর্য বর্ণনা করা। লাক্ষ্ণৌর দরবারগুলোতে এই প্রকারের স্থূলতাই প্রশংসার বিষয় বলে বিবেচিত হতে আরম্ভ করে। ফারসি বা উর্দু ভাষায় সাহিত্যকে আদব বলা হয়। এর মূল কারণ হলো সাহিত্য শিষ্টাচার আর নান্দনিকতার বার্তাবাহক। এ কথা যেনো সে সময়ের কবি-সাহিত্যিকগণ বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কবি-সাহিত্যিকগণ তখন চরিত্র গঠনে আত্মনিয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেননি। প্রকৃতি আর ফুলের সৌন্দর্য বর্ণনায় বিমোহিত হওয়ারও তাগাদা অনুভব করেননি। গোলাপ, জুঁই-চামেলি আর বেলিফুলের মালা গাঁথার উপভোগ্য বিষয়গুলো তখন সাহিত্যে হয়ে পড়েছিলো বেমানান। কেবল কথার ফুলঝুরি আর সুরভিহীন কাগজের মালা গাঁথাই তাঁদের সাহিত্য বিনির্মাণে যথেষ্ট ছিলো।

ইয়ার আলি খান জান রচিত রিখতি কবিতা

রিখতি রীতির চরম প্রকাশ ঘটে কবি ইয়ার আলি খান জানের (মৃত্যু ১৮৯৭ খ্রি.) মাধ্যমে। তিনি মূলত লাক্ষ্ণৌর অধিবাসী ছিলেন। ইয়ার আলি খান জান (মৃত্যু ১৮৯৭ খ্রি.) মুশায়েরা বা কবিতা আসরে অংশগ্রহণ করতেন মেয়েদের পোষাক পড়ে এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন মেয়েলী ঢঙ্গে। তার অঙ্গ-ভঙ্গি কাব্যাসরে হাসির ঢেউ তুলতো। কিন্তু লাক্ষ্ণৌ ধারার এই ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতিতে এক সময় কবি নাসিখ

(১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) ও হায়দার আলি আতিশের[৭৭] (১৭৭৮-১৮৪৭ খ্রি.) জন্ম হয়। তাঁরা সাহিত্য সংস্কারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হন। তাঁদের প্রয়াসে উর্দু সাহিত্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ধারায় পুনরায় ফিরে আসে। উর্দু ভাষা ও সাহিত্য আবার এক শালীন-রুচিশীল ও নান্দনিক ধারায় আলোকিত হয়ে উঠে।

নাসিখ (১৭৭২-১৮৩৮ খ্রি.) আর আতিশ (১৭৭৮-১৮৪৭ খ্রি.) বিখ্যাত কবি মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.) বা মির তাকি মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) মতো কোনো বড় মাপের কবি না হলেও উর্দু ভাষা ও সাহিত্য সংস্কারে তাঁরা ছিলেন অনন্য। বলা হয়ে থাকে যে, কবিগণ সমাজদেহের চোখ। দেহে বেদনা অনুভূত হলে চোখ থেকে যেমন অশ্রুপাত হয় তেমনি কবিগণ সমাজদেহের বেদনা অনুভব করলে তা কলমের কালি হয়ে ঝরে পড়ে। সত্যিকার অর্থে প্রকৃত কবির সাক্ষাৎ এ সময় লাক্ষ্ণৌ সাহিত্যে পাওয়া বিরল ছিলো।

মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব

গোটা ভারতের সমাজদেহের ভাবনা যে কবির কলমের আঁচড়ে প্রকাশিত হয়েছে তিনি হলেন কবি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.)। লাক্ষ্ণৌ গতিধারার যে রুগ্ন সাহিত্য গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিলো, গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.) তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে সাহিত্যের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এ প্রয়াস ছিলো গোটা উর্দু সাহিত্যকে আবারও ফারসি সাহিত্যমুখী করার। এ কারণেই গালিবের (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.) উর্দু কবিতার পরতে পরতে ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের ভাব ও দর্শন বিরাজমান। গালিবের (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.) আবির্ভাবে দিল্লির সাহিত্যরীতি আবার মাথা উঁচু করে দাড়াঁতে সক্ষম হয়েছিলো।

গালিবের (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.) সময়ে আরো যেকয়েকজন দিল্লি ধারার কবি গোটা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে মুমিন খান মুমিন (১৮০০-১৮৫১ খ্রি.) ও জাওক (১৭৯০-১৮৫৪) অন্যতম। গালিবের (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.) যুগকে উর্দু সাহিত্যের রেঁনেসার যুগ বলা যায়। গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.) ফারসি শব্দ, অনুপ্রাস ব্যবহারের করে পাঠক মহলে জাগরণ সৃষ্টি করে ছিলেন। উর্দু সাহিত্যের নন্দিত পাঠকগণ বহুকাল যাবৎ যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের অপেক্ষায় ছিলেন, গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.) এসে সুশীল পাঠক সমাজের সে তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হন।

গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) পুরো নাম মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব। উর্দু সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠকবি ও দার্শনিক। জন্ম ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রা শহরে। তাঁর পূর্বপুরুষ জাতিতে তুর্কি ছিলেন। তাঁর দাদা মির্জা কুতান বেগ সর্বপ্রথম তুরস্ক থেকে দিল্লিতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। পিতার নাম আব্দুল্লাহ বেগ। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে এক গৃহযুদ্ধে যখন গালিবের পিতা মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর।

---

৭৭. খাজা হায়দার আলি আতিশ (১৭৭৮-১৮৪৭ খ্রি.)। পিতা খাজা আলি বখ্শ। তাঁর পূর্বপুরুষ বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন উর্দু কবি। ২৯ বছর বয়সে কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। উর্দু সাহিত্য যখন লাক্ষ্ণৌ সমাজের প্রভাবে অশ্লীলতায় ভরে উঠে তখন তিনি ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে উর্দু সাহিত্যকে পরিশীলিত সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালান। লাক্ষ্ণৌর কোনো দরবারের সাথে সংশ্লিষ্টতা না থাকায় তাঁর এ প্রয়াস সফল হয়। তিনি অত্যন্ত সাদা-সিধে ও সরলভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর চাচা মির্জা নাসরুল্লাহ বেগ অভিভাবকত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গালিবের নয় বছর বয়সে চাচাও মারা যান। চাচা নিঃসন্তান হওয়ায় উত্তধিকারী হিসেবে গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে বছরে সাতশ রুপি ভাতা পেতেন। এরপর গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) মামার বাড়িতে লালিত-পালিত হন। শেখ মুআজ্জম নামক একজন আরবি ও ফারসি ভাষার পণ্ডিত থেকে প্রাথমিকশিক্ষা গ্রহণ করেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) হরমুজ আব্দুস সালাম নামে এক নওমুসলিমের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। হরমুজ ছিলেন ক্লাসিক ও আধুনিক ফারসি সাহিত্যের পণ্ডিত। তাঁর সাহচর্যে গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ফারসি সাহিত্যের বিপুল রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন এবং ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করেন । পরবর্তীকালে তিনি উর্দু ভাষায়ও কাব্যচর্চা করেছেন।

ষোল-সতেরো বছর বয়সে গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯ খ্রি.) দিল্লি আসেন এবং জীবনের শেষ অবধি পর্যন্ত দিল্লি ছিলেন। খুব অল্প বয়সে তিনি বিয়ে করে ছিলেন কিন্তু বিবাহিত জীবনে তেমন সুখি ছিলেন না। সারাটি জীবন তিনি অর্থ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তাঁর কয়েকজন সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে তিনি শোকে আরো মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গালিবের অধ্যাপক পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাগার জীবন

গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি কলেজের ফারসি অধ্যাপক পদের প্রার্থী হয়ে যথাপোযুক্ত সম্মান না পাওয়ায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক পুলিশের কারসাজিতে তিন মাসের কারাজীবন ভোগ করেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন দিল্লি সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর[৭৮] (১৭৭৫-১৮৬২ খ্রি.) মির্জা গালিবকে (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) নাজমুদ্দৌলা দবিরুল মুল্ক নিজাম জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং মোগলদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। তৎকালীন রাজ কবি ইব্রাহিম জাওকের[৭৯] (১৭৯০-১৮৫৪ খ্রি.) মৃত্যুর পর গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) মোগল দরবারের রাজ কবি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হলে কবি গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ইংরেজদের রোষানলে পড়েন। ফলে ইংরেজ কর্তৃক নির্ধারিত ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং ভাতা ও পূর্ববর্তী সম্মান ফিরে পান।

---

৭৮. বাহাদুর শাহ জাফর (১৭৭৫-১৮৬২ খ্রি.) ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের ১৯তম ও সর্বশেষ সম্রাট এবং বিখ্যাত উর্দু কবি। সিপাহি বিপ্লবের পর ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকগণ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠান। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর তিনি রেঙ্গুনে মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ৬০৯)

৭৯. শেখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম জাওক (১৭৯০-১৮৫৪ খ্রি.) ছিলেন একজন বিখ্যাত উর্দু কবি। জাওক হলো তাঁর কবি নাম। পিতার নাম মুহাম্মদ রমজান। তিনি দিল্লির বিখ্যাত ফারসি কবি শাহ নাসিরুদ্দিন দেহলাভির শিষ্য ছিলেন। দিল্লির সর্বশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের (১৭৭৫-১৮৬২ খ্রি.) শিক্ষক এবং তাঁর দরবারের সভাকবি ছিলেন। তিনি কাব্যচর্চা ছাড়া সঙ্গীত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ছিলেন প্রাজ্ঞ। তিনি ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ৬৫ বছর বয়সে দিল্লিতে মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ৬০১)

গালিবের ব্যক্তিজীবন

ব্যক্তি জীবনে গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) অতিশয় রসিক ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) উর্দু পত্র বিনিময় তাঁর প্রমাণ বহন করে। গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) পত্রসাহিত্য উর্দু ভাষায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। বাংলা ভাষায় পত্রসাহিত্যের গুরুত্ব যেমন আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) মাধ্যমে পেয়েছি; ঠিক তেমনি গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) পত্রসাহিত্যের মাধ্যমে উর্দুভাষী পাঠকমহল পত্রসাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছে।

উদারমনা সাহিত্যিক গালিব

গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) উদার মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কবিতায় সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিলো না। তিনি নিজের কোনো দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর শরাব পানের অভ্যাস ছিলো। কবিতায় ও পত্রসাহিত্যে তিনি অকপটে তা স্বীকার করেছেন।

গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কাব্যের পরতে পরতে ছিলো দুঃখ-বেদনা আর দুর্দশার ছাপ। এক মহাকালের কষ্ট তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে অনেকে মির্জা গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)কে মির তাকি মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) সাথে তুলনা করেছেন। তবে পার্থক্য হলো মিরের (১৭২৪-১৮২০ খ্রি.) কবিতায় দুঃখ-বিরহের বিশাল দাস্তান রয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। তাই পাঠক ব্যথা-বেদনায় একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। পাঠক প্রতিমুহূর্তে হতাশায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আর কবিও হয়ে পড়েন বিচলিত। পক্ষান্তরে গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতায় শত হতাশার মাঝেও কবি থাকেন অনড়-অবিচল। সকল দুঃখ-বেদনা কবি সহাস্যে সহ্য করেন। মহাকালের আঘাত কবিকে যেনো আরো দুর্বার করে তোলে। এক সময় দুঃখ-যাতনা সহ্য করা কবির স্বভাবে পরিণত হয়। তখন দুঃখ আর দুঃখ থাকে না। কালক্রমে দুঃখ হয়ে উঠে সহজতর। এ দর্শনকে কবি গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যক্ত করে বলেন:

رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں

(গালিব, ২০১৬ : ১৩০)

[মানুষ যদি দুঃখ-কষ্টকে স্বভাবজাত করে নেয় তাহলে দুঃখ আর দুখ থাকে না। দুঃখ-কষ্টের মাঝে আমি এতই নিমজ্জিত যে, সকল কষ্টই আমার কাছে এখন সহজতর অনুভূত হয়।]

গালিবের ছন্দজ্ঞান

গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)- এর ছন্দজ্ঞান ছিলো অসীম। সাধারণ কবিদের ন্যায় তিনি ছন্দের পিছনে ছুটেননি। এ কারণে তাঁর অনেক কাব্যে ছন্দপতন ঘটেছে। তিনি কাব্যের ভাব অনুযায়ী ছন্দ মিলাতেন। ফলে সে কাব্য সুরের মূর্ছনায় আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতো। তাঁর কাব্যে ভাব-দর্শন ছিলো মূল উপজীব্য বিষয়। এ ভাব-দর্শন প্রকাশে অনেক সময় গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কাব্য ছন্দ পতন আর ব্যাকরণগত ত্রুটির দোষে দুষ্ট হয়েছে। কিন্তু উর্দু সাহিত্যজগতে তিনি ছিলেন পয়গাম্বরে সুখান (پیغمبر سخن)

বা ভাষাদূত। তিনি ছিলেন যাদুময় বাক্য সৃষ্টির শক্তিতে বলীয়ান। গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ছন্দপাত আর ব্যাকরণগত ত্রুটিই উর্দু কাব্যরীতিতে নতুন এক নিয়য়ে পরিণত হয়েছে। গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) পূর্বে উর্দু সাহিত্যে কাব্যছন্দের ধারা ছিলো আটটি। গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) সে ছন্দধারাকে উনিশে পরিণত করেন। আর গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) দেখানো পথে বর্তমানে উর্দু কাব্যছন্দ প্রায় একশো চুয়ান্নটি। (নিগার, ১৯৯৬: ২১৬)

গালিবের ফারসি কাব্যচর্চা

উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা পরবর্তীকালের উর্দু সাহিত্যের সকল কবি একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তিনি ফারসি ভাষায়ও অনেক কবিতা লিখেছেন। তিনি মনে করতেন তাঁর ফারসি কবিতা উর্দু কবিতার চেয়ে অনেক বেশি ভাবসমৃদ্ধ। ফারসি কাব্যচর্চা মূলত ছিলো তাঁর জীবনের আরাধনা। উর্দু কাব্যচর্চা ছিলো তাঁর অবসরের সঙ্গী। গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) তাঁর ফারসি কাব্যচর্চা সম্পর্কে বলেন:

فارسی تا بہ بینی نقش ہائے رنگ رنگ بگزار از مجموعۂ اردو کہ بے رنگ من است

(গালিব, ২০১৪: ১৫৮)

[সাহিত্যের বিভিন্ন রঙ্গের ছবি দেখতে হলে আমার ফারসি কবিতা দেখো। আমার উর্দু কবিতায় দৃষ্টি দিলে বুঝবে এ তো রংহীন কবিতাসমগ্র।]

গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) যদিও তাঁর রচিত ফারসি কবিতাকেই তাঁর রচিত কাব্যের মূলপ্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন। আর উর্দু রচনা ছিলো মূলত তাঁর অবসর সময়ের বিনোদন স্বরূপ, কিন্তু গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর তাঁর উর্দু রচনাতেই পাওয়া যায়। উর্দু কাব্যচর্চা করেই গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) গোটা বিশ্বে বরেণ্য ও সমাদৃত হয়েছিলেন। তাই বলা যায় যে, তাঁর উর্দু রচনা ফারসির তুলনায় স্বল্প সংখ্যক হলেও এ রচনাই গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কে বিশ্বময় গ্রহণীয় করে তুলেছে। আর উর্দু সাহিত্য গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) মাধ্যমে পেয়েছে তার শ্রেষ্ঠ ধন-ভাণ্ডার।

গালিবের উল্লেখযোগ্য ফারসি ও উর্দুগ্রন্থসমূহ

গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ফারসি ও উর্দু ভাষায় অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবে তাঁর অনেক রচনা নষ্ট হয়ে যায়। সিপাহী বিপ্লবের এগারো বছর পর ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান কবির মৃত্যু হয়। কালের বিপর্যয় এড়িয়ে এখন পর্যন্ত গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) যে সকল বই-পুস্তক পাওয়া যায় তার মাঝে কাব্য গ্রন্থ হলো চারটি। ১. উর্দু *দিওয়ানে গালিব* (*دیوان غالب*)। ২. *কুল্লিয়াতে নজমে ফারসি* (کلیات نظم فارسی)। ৩. ফারসি ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ *গুলে রুয়ানা* (*گل رعنا*) ও ৪. *ইন্তিখাবে দিওয়ানে ফারসি* (انتخاب دیوان فارسی)।

গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কয়েকটি গদ্য রচনা রয়েছে। ১. *কুল্লিয়াতে নসরে ফারসি* (کلیات نثر فارسی)। ২. উর্দু পত্রাবলি *উর্দুয়ে মুআল্লা* (اردو معلی)। ৩. ফারসি পত্রাবলি *রুকআতে গালিব* (رقعۂ غالب)। ৪. পত্র সংকলন *উদে হিন্দি* (عود ہندی)। ৫. ফারসি ভাষায় মোগল ইতিহাস *মেহের নিমরুজ* (مہر نیمروز)। ৬. ফারসি ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা মূলক গ্রন্থ *কাতেয়ে বুরহান* (قاطع برہان) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গালিবের কাব্যের ধরন ও যুগভিত্তিক বিভাজন

গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) উর্দু কাব্যকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম পর্যায় হলো কাব্যজীবনের সূচনা পর্ব থেকে পচিশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতায় ফারসি শব্দ ও বাগধারার ব্যাপক ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। কাব্যচর্চার সূচনাতে গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ফারসি কবি মির্জা আবদুল কাদের বেদিলকে (১৬৪২-১৭২০ খ্রি.) অনুসরণ করে কাব্যচর্চা করেছেন। কবি নিজেই এ কথা স্বীকার করে বলেন:

مجھے راہ سخن میں خوف گمراہی نہیں غالب　　عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامۂ بیدل کا

(গালিব, ২০১৬ : ১৫১)

[গালিব, কাব্যপথে আমার ভ্রান্তির ভয় নেই। বেদিলের বক্তব্যই আমার কাব্যপ্রান্তরে খিজিরের লাঠি স্বরূপ।]

এ সময় গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতায় ফারসি শব্দমালা, কাব্যালংকার এবং ফারসি চিন্তা-দর্শন ব্যবহারের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময় গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতাগুলো সহজ ও সাবলীল কাব্যরূপ লাভ করেনি। তখন গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো কেবল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদর্শন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কাব্যের সময়কাল হলো ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ে গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতায় অনেকটা রসবোধ দেখা যায়। কিন্তু ফারসি কাব্যের পাণ্ডিত্য ও দুর্বোধ্যতা তখনো তাঁর কবিতা থেকে একেবারে দূরীভূত হয়নি। তবে কাব্যরসিকগণ এ সময় গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতা পাঠে রসবোধ্যতা অনুভব করেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ে গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতার সময়কাল হলো ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়কার গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) রচিত কবিতাগুলো হলো সহজ-সরল ও সাবলীল। এ সময়ের কবিতা পাঠে গালিবকে (১৭৯৭-১৮৯৬ খ্রি.) এ উপমহাদেশেরই নয়; বরং বিশ্বসাহিত্যের একজন নন্দিত কবি বলা যায়। শব্দ, ভাব কিংবা দর্শন সব কিছুতেই গালিবের (১৭৯৭-১৮৯৬ খ্রি.) অসাধারণ মনীষার প্রকাশ পায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের মতো গালিবের (১৭৯৭-১৮৯৬ খ্রি.) শেষ জীবনের কবিতাগুলোর অভিব্যক্তি ছিলো সহজ-সরল। প্রকৃতি ও মানব মনের প্রতিটি রূপ

গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯) কবিতার প্রতিটি ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে। মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সফলতা-ব্যর্থতার অনুভূতিগুলো গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) হৃদয় দিয়ে প্রকাশ প্রকাশ করেছেন। গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতাগুলো পাঠে অনেক সময় মনে হয় এ যেনো পাঠকজীবনেরই কাব্যরূপ।

গালিবের কাব্যে ফারসি প্রভাব

গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতার পরতে পরতে ছিলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিলো। ফারসি কবিতার প্রকৃতি ও মানব প্রেম, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও ছলনা সকল কিছুই গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)- কবিতায় ফুঠে উঠেছে। গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯) প্রথম জীবনের কবিতায় যেমন ফারসি কবি আব্দুল কাদের বেদিলের (১৬৪২-১৭২০ খ্রি.) অনুসরণ-অনুকরণ পরিলক্ষিত হয় তেমনি গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কাব্যজীবনের শেষভাগে ফারসি সাহিত্যের আরেকজন বিখ্যাত কবি মুহাম্মদ হুসাইন নাজিরি নিশাপুরি (মৃত্যু ১৬১২ খ্রি.)-এর অনুসরণ-অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) অনেক কবিতা বিখ্যাত ফারসি কবি নাজিরির (১৬৪২-১৭২০ খ্রি.) ধাঁচে লেখার চেষ্টা করেছেন। যেমন নজিরি (১৬৪২-১৭২০ খ্রি.) বলেন:

شب از فسانه ام ز جنون خانه پرشده است و زگریه ام دیار ز ویرانه پرشده است

(হক, ১৯৬১: ৪২৫)

[আমার রাতগুলো ঘরের পাগলামির গল্পমালায় ভরপুর। আমার কান্নায় দেশ পরিপূর্ণ বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে।]

গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) এই ধাঁচের কবিতা রচনা করে বলেন:

یوہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں

(গালিব, ২০১৬: ১৩০)

[হে গালিব, এভাবেই তুমি কান্না করতে থাকলে তো পৃথিবীবাসী তাদের বসত-ভিটা বিরান হতে দেখবে।] ফারসি কলার একটি নীতি হলো এই রূপ যে, কয়েকটি পঙ্‌ক্তির সমষ্টিতে যে ভাবনা ব্যক্ত করা যায় তা একটি পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করা। ফারসি পরিভাষায় এরূপ কাব্যচর্চাকে ইখতেসারে কালাম (اختصار کلام) বলে। এরূপ কাব্যচর্চার সূচনা ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি বাবা ফাগানি (মৃত্যু ১৫১৬ খ্রি.) করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) এ রূপ কাব্যচর্চার নমুনা উর্দু ভাষায় সৃষ্টি করেন। যেমন বাবা ফিগানি (মৃত্যু ১৫১৬ খ্রি.) এক কবিতায় বলেন:

عیش این باغ باندازۂ یک تنگ دل ست کاش گل غنچه شود تا دل ما بکشاید

(বাবা ফাগানি, গাঞ্জুর, গজল নং ২১৬ তা:২২.১২.২০২২)

[পৃথিবীর এই সংক্ষিপ্ত বাগানে সংকীর্ণ মনের মানুষগুলো সন্তুষ্ট হতে পারে। হায় এটা যদি হতো যে কলি থেকে আবার ফুল ফুটতো আর আমার হৃদয় খুলে যেতো।]

সুতরাং বলা যায়, এ কবিতায় বাবা ফাগানি (মৃত্যু ১৫১৬ খ্রি.) কয়েকটি বিষয় বলতে চেয়েছেন।

১.পৃথিবীটা হলো একটি ছোট বাগানের মতো। ২. এর মাঝে যে প্রশস্ততা আছে তাতে সংকীর্ণ হৃদয়ের মানুষগুলো সন্তুষ্ট হতে পারে। ৩. তাই এখানে এমন হতে পারে না যে, আমার হৃদয় খুলে যাবে আর ফুলের কলি ফুটবে। ৪. আমার আশা হলো ফুলগুলো আবার কলিতে রূপান্তরিত হোক আর আমার হৃদয়ের প্রশস্ততা ফুটে উঠুক। এই পঙ্‌ক্তির মূল বক্তব্য হলো ফুল যেমন পুণরায় কলিতে রূপান্তরিত হতে পারে না ঠিক তেমনি আমার হৃদয় প্রশস্ত হওয়াও সম্ভব নয়।

এইরূপ ইখতেসারে কালাম (اختصار کلام)-এর উপমা আমরা গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কবিতায় পেয়ে থাকি। গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) বলেন:

قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیا کیوں ہو

(গালিব, ২০১৬: ২৯৯)
[হে আমার সঙ্গী, খাঁচা থেকে আমার কাছে বাগানের অবস্থা শুনে ভয় পেওনা। গতকাল যার উপর বজ্রপাত হয়েছিলো তা কেন আমার বাসা?]

এই পঙ্‌ক্তিতে গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) একটি ঘটনা বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। (১) একদা একটি বুলবুল পাখি বাগান আর বাসা থেকে বের হলে এক ব্যক্তির হাতে ধরা পড়ে। (২) একদা সে তার পিঞ্জিরা থেকে বাগানে বজ্রপাত হতে দেখে। তখন সে চিন্তা করে আমার বাসা ঠিক আছে না জ্বলে গেছে? (৩) অন্য আরেকটি মুক্তপাখি সামনের গাছের ডালে বসলে বন্দী বুলবুল তাকে বাগানের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে। (৪) বন্দী মুক্ত পাখিটি বন্দী পাখিটিকে অভয় দিয়ে বলে, তোমার বাড়ি পুড়ে যাাওয়ার ব্যাপারে কী বলবো? (৫) ঘর পুড়ে যাওয়ার বিষয়ে সন্দিহান হয়ে বন্দী পাখিটি বলে বাগানে হাজার হাজার পাখির বাসা আছে। আমার বাসাতেই কি বজ্রপাত হয়েছে? এই পুরো ঘটনাটি গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কেবল দু'টি পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত করেছেন।

অন্য আরেকটি কবিতার লাইনে আমরা দেখি গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) একটি গল্প বর্ণনা করেছেন। গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) বলেন: আমার প্রেমিকা অনেক রূপসী, তাই যে কেউ তাঁর প্রেমে পড়ে যায়। প্রেমিকার কাছে কাকে দিয়ে চিঠি পাঠাই? অবশেষে বন্ধুর সাথে পরামর্শ করে বন্ধুর আস্থাভাজন একজন সরল-সোজা লোকের মাধ্যমে চিঠি পাঠালাম। কিন্তু চিঠির বাহক আমার প্রেমিকার প্রেমে পড়ে গেলো। তারপর যখন বন্ধুর সাথে দেখো হলো, তখন কেবল এতটুকুই বললাম যে, তার সাথে সাক্ষাৎ হলে আমার

সালাম বলো। এই বিশাল ঘটনাটি গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কেবল একটি পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করে বলেন:

تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم　　میرا سلام کہیو، اگر نامہ بر ملے

(গালিব, ২০১৬ : ৩৯৪)

[বন্ধু তোমার সাথে কোনো কথা নেই। পত্রবাহকের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমার সালাম বলো।]

গালিব উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকবি

উর্দু সাহিত্যের কবিদের সাথে তুলনা করলে গালিবকে (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করতে হয়। বাক্যের উচ্চভাব, দার্শনিকত্ব আর রসাত্মক কাব্য রচনায় গালিব ছিলেন অদ্বিতীয়। গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) তাঁর দার্শনিক ও সুফি তত্ত্বের অধিকাংশ চিন্তা-ধারা ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) যেমন তাঁর কাব্যে কেবল সুফি দর্শনের আলোচনায় ব্যস্ত থেকেছেন, গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কাব্যচর্চা এমন এক কেন্দ্রিক নয়; বরং সমাজ সংস্কার থেকে শুরু করে ইতিহাসচর্চা, প্রেমকাব্য, কাসিদাসহ সকল আঙ্গিকের রচনায় তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর বিশেষ চিন্তা-চেতনা ও প্রকাশভঙ্গি উর্দু কাব্যে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। উর্দু সাহিত্যের সেই নবরূপ গোটা বিশ্বের সাহিত্যমোদিরা আগ্রহ ভরে গ্রহণ করে। গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) কাব্য ছিলো প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যের মেল বন্ধন।

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল

ফারসির রীতি-নীতিকে বজায় রেখে উর্দু কাব্যচর্চা করার সর্বশেষ মাইল ফলক হলেন ড. মোহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)। আল্লামা ইকবাল মূলত একজন ফারসি কবি। ফারসি ধারাকে সামনে রেখে তাত্ত্বিক উর্দু কাব্য রচনা করে তিনি বিশ্বময় আলোচিত ও সমাদৃত হয়েছেন।

ড. মোহাম্মদ ইকবাল ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল বর্তমান পকিস্তানের লাহোরের শিয়ালকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতার নাম শেখ নুরুদ্দিন এবং মাতা ইমাম বি। ইকবাল শিয়ালকোটের মাদরাসা থেকে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে কুরআন শরিফ হিফজ করেন। এ সময় মির হাসান নামের একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। কবি মনির উদ্‌দীন ইউসুফ[৮০] (১৯১৯-১৯৮৭ খ্রি.) তাঁর *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন: "পরবর্তীকালে ফারসি কাব্য রচনায় তাঁর যে দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়, তা তিনি তাঁর এই দক্ষ শিক্ষকের শিক্ষার প্রভাব বলে অনেকে মনে করেন।" (ইউসুফ, ১৯৬৮: ২৭৩)

৮০. মনিরুদ্দিন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭ খ্রি.) একজন বিখ্যাত বাংলা কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও অনুবাদক। তিনি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসির *শাহনামা* বাংলায় অনুবাদ করার জন্য তাঁকে বাংলার ফেরদৌসি নামে অভিহিত করা হতো। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (ইউসুফ, ১৯৭৯: ৩ ভূমিকা)

ড. ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছিলেন। শিয়ালকোট স্কচমিশন থেকে এফ, এ বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দর্শন নিয়ে বি, এ পাশ করেন এবং ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দর্শনে এম, এ পাশ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির সাথে সাথেই লাহোর অরিয়েন্টাল কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের শিক্ষক হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড গমন করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইথিক্স বা ধর্মনীতি নিয়ে দর্শনে এম, এ পাশ করেন। তারপর জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *The Development of Metaphysics in Persia* তথা পারস্যে অতীন্দয়বাদের বিকাশ শীর্ষক গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পি এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) বৃটেনে থাকা অবস্থায় ভারতের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে দলের বৃটিশ শাখার একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সৈয়দ আমির আলি ও হাসান বিলগিরামির সাথে সাব কমিটির সদস্য হিসেবে মুসলিম লীগের খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুসলিমলীগের পক্ষে নির্বাচন করে জয়ী হন।

কাব্যচর্চা

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) অমর হয়ে আছেন তাঁর ফারসি ও উর্দু ভাষায় রচিত কবিতার জন্য। শুরুতে আল্লামা ইকবাল গতানুগতিক গজল বা গীতিকাব্য রচনা করতেন। এ সময় তিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি দাগ দেহলভির[৮১] (১৮৩১-১৯০৫ খ্রি.) থেকে কাব্য সংশোধন করাতেন। পরবর্তীকালে তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পুরো আবেদনকে উর্দু ভাষায় ফুটিয়ে তুলে তা বিশ্ব দরবারে নন্দিত করার প্রয়াস চালান।

আল্লামা ইকবাল মূলত একজন ফারসি কবি। তিনি উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করলেও তাঁর চিন্তার বিকাশ ঘটেছে ফারসি কাব্যচর্চার মাধমে। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম দার্শনিক। তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ ফারসি ভাষায় রচিত।

আল্লামা ইকবাল রচিত গ্রন্থসমূহ

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) রচিত উল্লেখযোগ্য ফারসি কাব্যগ্রন্থগুলো হলো (১) *আসরারে খুদি* (اسرارخودی), (২) *রুমুজে বেখুদি* (رموز بے خودی), (৩) *পায়ামে মাশরিক* (پیام مشرق), (৪)

৮১. কবি দাগ দেহলাভির (১৮৩১-১৯০৫ খ্রি) নাম হলো নাওয়াব মির্জা খান। কবি নাম দাগ দেহলাভি। তিনি ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নাওয়াব শামসুদ্দিন খানের মৃত্যুর পর কবির মাতা মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের ছেলে মির্জা ফখরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (নুরুদ্দিন, ১৯৯৭: ৬৫৬)

জুবুরে আজম (زبور عجم), (৫) *জাবেদ নামা* (جاوید نامہ), (৬) *মাসনাভিয়ে মুসাফির* (مثنوی مسافر), *পাচ চে বায়াদ কারদ আয় আকওয়ামে শারক* (پس چه باید کرد ای اقوام شرق) ইত্যাদি। আর উর্দু ভাষায় রচিত আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)-এর কাব্যগ্রন্থ গুলো হলো (১) *বাঙ্গে দারা* (بانگ درا) (২) *বালে জিবরিল* (بال جبریل) (৩) *জারবে কালিম* (ضرب کلیم) ও (৪) *আরমুগানে হিজাজ* (ارمغان حجاز)।

ইকবালের খুদি-দর্শন

আল্লামা ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) খুদিদর্শন ছিলো জগৎ বিখ্যাত। তিনি খুদি দর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মপোলব্ধির বিকাশকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করে তা সৃষ্টি সেবায় নিয়োজিত করা এবং সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা। একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও জীবন পদ্ধতির পরিকল্পনা দরকার। তাই একজন মুসলিমকে ইসলামি বিধিবিধান মেনে নিয়ে জীবন ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। তার চরম ও পরম লক্ষ্য হবে ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়ন। আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) বলেন:

چوں حیات عالم از زور خودی است　　پس بقدر استواری زندگی است

(ইকবাল, ১৯৯৩:২৫)

[বিশ্বের জীবন টিকে আছে খুদির শক্তিতে। বিশ্ব জীবনের ভিত রচিত হয় খুদির শক্তিতেই।] সুতরাং যে বস্তু খুদি হারায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিপতিত হয়। যেমন বৃষ্টির এক ফোঁটা যখন খুদি অর্জন করে তখন তা মুক্তায় পরিণত হয়। একটি বীজ বা শস্যদানা যখন খুদিশক্তি অর্জন করে তখন তা মাটির বক্ষ ছেদ করে বেরিয়ে আসে। আর পাহাড়ের মতো শক্তিশালী বস্তুও যখন খুদিশক্তি হারায় তখন তা বালুকণায় পরিণত হয়ে মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়।

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.)-এর মতে বিশ্ব এখনো অসম্পূর্ণ। মানুষ খুদির সাহায্যে নতুন বস্তু আবিষ্কার করে তা পূর্ণ করতে পারে। মানুষ যতোবেশি আবিষ্কার করবে ততোবেশি সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) বলেন:

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے　　سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی

[যদি জীবিত হও তবে নিজের পৃথিবী নিজেই সৃষ্টি কর। আদম সৃষ্টির রহস্য এখানেই, জীবন রহস্য লুকানো আছে সৃষ্টির মাঝে।] (ইকবাল, ২০০৭:২১০)

আল্লামা ইকবালের ফারসি কবিদের অনুসরণ

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) কাব্যচর্চায় ফারসি কবিদের সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করেছেন। তাঁর কবিতার ভাব, শব্দ চয়ন, বাক্যবিন্যাস, সাহিত্যালঙ্কারের ব্যবহার– এ সব কিছুতেই ফারসি কবিদের অনুসরণ-অনুকরণের ছাপ রয়েছে। ফারসি কবিদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) সবচেয়ে বেশি প্রভাব গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) থেকে। তাঁর

রচিত উর্দু-ফারসি কবিতায় তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমিকে (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) স্বীয় চিন্তার বিকাশ সাধনের পির বা মুরশিদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) বলেন:

پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوها تعمیر کرد

(ইকবাল, ১৯৯৩: ১৪)

[আমার মুরশিদ ও পির মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি মাটিকে স্বর্ণ বানিয়ে দিয়েছেন। আমার মাটি থেকে আলোকজ্জ্বল বস্তু তৈরি করে দেখিয়েছেন।]

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) তাঁর কবিতার বহু স্থানে নিজেকে মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৬১ খ্রি.) হিন্দুস্তানি বা ভারতীয় শিষ্য বলে সম্বোধন করে কথপোকথন করেছেন। মাওলানা রুমিকে (১২০৭-১২৬২ খ্রি.) আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) উর্দু ভাষায় প্রশ্ন করে আবার নিজেই রুমির (১২০৭-১২৭৩খ্রি.) পক্ষ থেকে ফারসি ভাষায় তার উত্তর দিয়েছেন। এভাবেই নিজ কাব্যে উর্দু ও ফারসি ভাষার সম্মিলন ঘটিয়ে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) কবিতা রচনা করেছেন:

چشم بینا سے ہے جاری جوئے خوں علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں

(ইকবাল, ১৯৮৬: ১৮০)

[বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে দর্শকদের চোখে রক্ত ঝরতে থাকে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কারণে ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।] হে পির, আমাদের এখন কী করা উচিৎ? আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) এর উত্তর খুঁজে পেয়েছেন মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) কাব্যে এভাবে:

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر دل زنی یار بود

(ইকবাল, ১৯৮৬: ১৮০)

[জ্ঞানকে শরীর বা বাহ্যিক উপকারকে সামনে রেখে অর্জন করলে তা অজগরের মতো ক্ষতিকারক হবে। আর জ্ঞানকে হৃদয় বিকাশের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলে তা বন্ধুর মতো উপকারী হবে।]

মাওলানা রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ছাড়াও আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) বহু ফারসি কবির অনুসরণ করেছেন। এর মূল কারণ ছিলো হাজার শতকের পরে জন্ম নেওয়া ফারসি কবিগণ মুসলিম জাগরণের কথা বলেছেন। আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) সে জাগরণকে উপলব্ধি করে আরো শাণিতভাবে তা ব্যক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এক কবিতায় বিখ্যাত ফারসি কবি সায়েব (১৫৯৩-১৬৬৯ খ্রি.)-এর কবিতার পঙ্‌ক্তি এনে আল্লামা ইকবাল সানাআতে তাজমিন (صناعت تضمین)[৮২] করেছেন। সমাজ সম্পর্কে হতাশ হয়ে আল্লামা ইকবাল বলেন:

ہمان بہتر کہ لیلی در بیان باد جلوہ گر باشد ندارد تنگنائے شہر تاب حسن صحرایئ

(ইকবাল,২০০৭: ১৯৯)

৯৯. অন্যের রচিত পঙ্‌ক্তিকে নিজের কবিতায় সংযুক্তিকরণকে সানাআতে তাজমিন (صناعت تضمین) বলে।

[লাইলির জন্য উত্তম হতো যদি সে তার সৌন্দর্য মরু-প্রান্তরে প্রকাশ করতো। কারণ শহরের সংকীর্ণ রাস্তায় মরুভূমির সৌন্দর্য আর জৌলুশ ফুটে উঠে না।]

এটি মূলত ফারসি কবি সায়েবে তাজরিজির (১৫৯৩-১৬৬৯ খ্রি.) কবিতা। সমাজের অনাচার দেখে কবি হতাশ হয়ে এ কবিতাটি রচনা করেছেন। যার ভাবার্থ হলো, অনেক ভালো হতো যদি এ সমাজে আমার জন্ম না হতো। কারণ, এ সমাজ আমার কদর আর মান-মর্যাদা বোঝে না। তাই লাইলির যেমন শহরে না থেকে মরু-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর দরকার ছিলো আমারও এ সমাজে থাকার দরকার ছিলো না।

এ কবিতায় কবি লাইলির সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লাইলির সৌন্দর্য হলো স্বভাবজাত বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন ইসলাম হলো স্বভাবজাত ধর্ম। তাই একজন মুসলিম লাইলির সৌন্দর্যের বিমোহিত হওয়ার চেয়ে ইসলামের সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে সর্বস্তরে ইসলামের দাওয়াত দিবে। কিন্তু আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) স্বীয় জাতির প্রতি হতাশ হয়ে বলেন:

کہاں اقبال تونے آبنایا آشیاں اپنا　　نوااس باغ میں بلبل کو ہے سامان رسوائی

(ইকাবাল, ২০০৭: ১৯৯)

[হে ইকবাল তুমি এমন এক জাতির মাঝে জন্মেছো, যাদের মাঝে তোমার বুলবুলের মতো গান গাওয়া লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।]

অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, ফারসি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি আবু তালিব কালিম হামাদানির (মৃত্যু ১৬৫১ খ্রি.) একটি প্রাণবন্ত পঙ্‌ক্তি নিজের কবিতার মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) ভারতীয় মুসলিমদের সজাগ করতে চেয়েছেন।

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) মুসলমানদের সম্বোধন করে বলতে চেয়েছেন যে, আজ মুসলিম জাতি অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। তারা যদি উন্নতি করতে চায় তাহলে তাদের উচিৎ এই অনৈসলামিক আচরণ দূর করা। আজকে তাদের মাঝে সেই সততা নেই। তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে এড়িয়ে চলছে। আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) আবু তালিব (মৃত্যু ১৬৫১ খ্রি.) রচিত একটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করে তাজমিন করেন এবং উর্দু ও ফারসি ভাষার অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়ে বলেন:

سرکشی باهر که کردی رام او باید شدن　　شعله سان از هر کجا بر خاستی آنجا نشین

(ইকবাল, ২০০৭:১৮০)

[অবাধ্যতা তোমাকে ভ্রান্ত করলেও তাঁর আনুগত্যই তোমাকে সফল করবে। তাঁর দীপ্ত মশাল যেখানেই জ্বলতে দেখবে সেখানেই বসে পড়।]

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) এ কবিতায় অত্যন্ত হতাশ হয়ে বলেছেন যে, জাতি আজ পিছিয়ে পড়েছে এবং অনুভূতিশূণ্য হয়ে পড়েছে। তাই এ অবস্থায় আমাদের জাতিকে ছেড়ে দেওয়া উচিৎ হবে না; বরং জাতিকে তার অবস্থা সম্পর্কে জানান দিতে হবে।

ফারসি কবি আবু তালিব (মৃত্যু ১৬৫১ খ্রি.) রচিত কবিতাটি আল্লামা ইকবালকে (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) খুব প্রভাবিত করেছিলো। এই কবিতাটির তাজমিন করে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) পাঠককে ইসলাম ও রাসুল (সা.)-এর আনুগত্যের শিক্ষাগ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান।

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) বলেন: 'হে মুসলমান, তোমাদের মাঝে অনৈসলামিক বিষয়গুলো জায়গা করে নিয়েছে। তাই তোমাদের এতো অধঃপতন। তোমাদের মাঝে পরিবর্তন আসা দরকার। পরিবর্তন না আসলে তোমাদের উন্নতি সম্ভব নয়।' (চিশতি, ১৯৮১: ২০৮)

ফারসি কবি আবু তালিব কালিম (মৃত্যু ১৬৫১ খ্রি.) স্বীয় কবিতায় অত্যন্ত নিপুণভাবে মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ হিসেবে রাসুল (সা.)-এর অবাধ্যচারণের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার সমাধানের পথ উল্লেখ করে বলেছে,'তাই সমাধান হলো রাসুল (সা.)-এর আনুগত্যে আবার ফিরে আসা'।

মূলত আল্লামা ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) কাব্যজুড়ে আছে ফারসি কবিদের বিপুল প্রভাব। এঁদের মাঝে ফারসি কবি সায়েব, আবদুল কাদের বেদিল, আবু তালিব কালিম হামাদানি, ফায়জি , উরফি, খাকানি, মাওলানা রুমি, জামালকুম্মি, মোল্লা আরশি, রেজা দানিশ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের অনুসরণ-অনুকরণ করে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) উর্দু কাব্যে দর্শনচর্চার যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজও বিদ্যামান রয়েছে। উর্দু কাব্যচর্চার মাইল ফলক হিসাবে আল্লামা ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) আনীত ধারাই বর্তমান বিশ্বে সমাদৃত ও গ্রহণীয় হয়ে আছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উর্দু সাহিত্যের সূচনাকাল তথা ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উপর ফারসি ভাষার প্রভাব বিস্তার করেছে। উর্দু সাহিত্য ফারসি সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে বিকশিত হওয়ার যে পথ-নির্দেশ বাবায়ে আদম অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) করেছিলেন, তা-ই পরবর্তীকালের কবি-সাহিত্যিকগণ অনুসরণ করে উর্দু সাহিত্যকে পৃথিবীর বুকে এক সমাদৃত সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) প্রবর্তিত এ ধারা খান আরজু (১৬৮৮-১৭৪৭ খ্রি.), সাওদা (১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.), মির হাসান (১৭২৭-১৭৯০ খ্রি.), মির্জা গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.) ও আল্লামা ইকাবল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) প্রমুখের কাব্যচর্চায় আরো বিকশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১ অলি (২০০৮): *কুল্লিয়াতে অলি*, কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফারুগে উর্দু, দিল্লি, ভারত।

২ আন্দালিব শাদানি (১৯৬২): *দাওরে হাজের মে উর্দু গজল গুয়ি*, শেখ গোলাম আলি এন্ড সন্স, লাহোর, পাকিস্তান।

৩ আবু সাঈদ মুহাম্মদ নুরুদ্দিন (১৯৯৩): *তারিখে আদাবে উর্দু*, শামা প্লাজা, ফিরোজপুর, লাহোর, পাকিস্তান।

৪ আব্দুল হক (১৯৬১): *ফারসি শাইরি কা আসর উর্দু শাইরি পর*, অপ্রকাশিত পিইচ, ডি থিসিস, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫ ইউসুফ সালিম চিশতি (২০০৭): *শরহে বাঙ্গেদারা*, ইতিকাদ পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লি, ভারত।

৬. ইউসুফ সালিম চিশতি (২০০৭): *শরহে জাভেদ নামা*, ইতিকাদ পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লি, ভারত

৬ মনির উদ্‌দীন ইউসুফ (১৯৬৮) : *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৭ মির তাকি মির (১৯৪১) : *কুল্লিয়াতে মির*, নভেল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

৮ মির হাসান (১৯৯৫) : *মাসনাভি সিহরুল বয়ান*, উর্দু একাডেমি, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

৯ মির হাসান (১৯৩৩): *রুমুজুল আরিফিন*, শামসুল ইসলাম প্রেস, হায়দারাবাদ, ভারত।

১০ মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৮৬২) : *দেওয়ানে গালিব ফারসি*, মাতবায়ে নিজামি, কানপুর, ভারত।

১১ মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৯৮৫) : *দেওয়ানে সাওদা*, নিজামি প্রেস লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

১২ মুসলিহ উদ্দিন শেখ সাদি (১৩৭৫ সৌর.): *বুস্তান*, কুতুব খানায়ে আশরাফিয়া বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৩ মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৯৩): *মাসনাভি আসরারে খুদি*, দ্যা ইউনিয়ন সিস্টেম প্রেস, লাহোর, পাকিস্তান।

১৪ মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৯১): *রুমুজে বেখুদি*, পুনেসিটি, মহারাষ্ট্র, ভারত।

১৫ মুহাম্মদ ইকবাল (২০০৭): *বাঙ্গেদারা*, ইতিকাদ পাবলিকেশন্স, দরইয়া গঞ্জ, নতুন দিল্লি, ভারত।

১৬ মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৮৬): *বালে জিব্রিল*, তাজ কোম্পানি লিমিটেড, লাহোর, পাকিস্তান।

১৭ মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ (১৯৫০): *আবে হায়াত*, শেখ মোবারক আলি তাজ, লাহোর, পাকিস্তন।

১৮ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজি (১৩৭৬ সৌ.): *দেওয়ানে হাফিজ*, মুআসসাসায়ে ফারহাঙ্গে ইরান, তেহরান, ইরান।

১৯ সুম্বুল গিার (১৯৯৫): *উর্দু শায়েরি কা তানকিদি মুতালাআ*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

২০ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৯৬২): *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২১ হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৯৫৪): *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক অজিত চন্দ্র ঘোষ, কোলকাতা, ভারত।

২২ হাফিজ শিরাজি (১৩৭৪ সৌ.): *দিওয়ানে হাফিজ*, চাবে নৌ বাহার, তেহরান।

২২ Paul Smith (1992): Mansur Hallaj The Tawasin, New Humanity Books, London.

২৩ Ram Babu Saksena (1952): *The History of Urdu Leature*, Allahbad, Ram Narain Lal Publisher, India।

উপসংহার

আলোচিত অধ্যায়গুলোতে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যে প্রভাব বিদ্যমান ছিলো সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। অত্র অভিসন্দর্ভটি একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সব চেয়ে বেশি ছিলো।

এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে যে, উর্দু একটি ভারতীয় আর্য ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ইন্দো-ইরানি বা আরইয়ায়ি তথা আর্যভাষা থেকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক আর্যভাষার শৌরসেনির অপভ্রংশরূপ থেকে এ ভাষাটি জন্মলাভ করে। শুরুতে এ ভাষাটিকে হিন্দুস্তানি বা হিন্দাভি বলা হতো। কালের আবর্তে এ ভাষাটি দেবনাগরি ও ফারসি বর্ণমালায় লেখা হলে দু'টি বর্ণমালার জন্য দু'টি নাম নির্ধারিত হয়। দেবনাগরি বর্ণমালায় হিন্দি আর ফারসি বর্ণমালায় উর্দু ভাষা নামে পৃথিবীতে এ ভাষা দু'টি অস্তিত্ব লাভ করে। তাই বলা যায় যে, উর্দু ভাষার ইতিহাস ও বিকাশে ফারসি ভাষার প্রভাব বিরাজমান।

প্রথম অধ্যায়ে আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে, উর্দু-হিন্দির বিভাজন মোগল আমল বা তার পূর্ববর্তীযুগে দেখা যায় না। তখন এ ভাষাটিকে ভারতীয়গণ দেবনাগরি বা ফারসি বর্ণমালায় বা ভারতে প্রচলিত অন্য যেকোনো বর্ণমালায় লেখা হতো। এ ভাষাটি ছিলো ভারতের আপামর-জনসাধারণের ভাষা। ইংরেজ শসানামলে এ ভাষাটি সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে এবং মুসলিম লেখকদের এ ভাষাটি ফারসি বর্ণমালায় আর হিন্দু লেখকদের এ ভাষাটি দেবনাগরি বর্ণমালায় চর্চা করতে দেখা যায়। কিন্তু এ সময় প্রেম চাঁদের মতো প্রগতিশীল লেখকদেরকে উভয় বর্ণমালায় এ ভাষায় সাহিত্য রচনা করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটাতেও দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, উর্দু ভাষার ক্রমবিকাশে ফারসি ভাষার প্রভাব অনেক বেশি। কারণ, বর্ণমালা থেকে শুরু করে কাব্যালঙ্কার পর্যন্ত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিরাজমান। হাজার শতাব্দীর পর থেকে উপমহাদেশের অধিকাংশ শাসকদের ভাষা ছিলো ফারসি। শাসকদের ভাষা ফারসি হওয়ার কারণে উপমহাদেশের প্রায় সবকটি ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষার প্রভাব পড়ে। উপরন্তু পারস্যের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব তখন গোটা বিশ্বসাহিত্যে পড়েছিলো। ধর্মীয় আচারের কারণেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য গোটা বিশ্বে সমাদৃত ছিলো। এ সমাদরের কারণেই মূলত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উপর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিল্প ও সংস্কৃতিসহ ধর্মীয় আচারের কারণে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের কী কী প্রভাব উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে বিরাজমান তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রামাণিক বিষয় উল্লেখপূর্বক ফারসি ভাষা ও শব্দমালাকে সামনে নিয়ে উর্দু ভাষার বানানরীতিতে মির্জা মাজহার জানেজানার (১৭০০-১৭৮০ খ্রি.) যে অনন্য ভূমিকা রয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এতে উর্দু বানানরীতি ও ছন্দরীতি বিষয়ে কবি নাসিখের (১৭৭২-১৮৩৮

খ্রি.) প্রস্তাবনা এবং উর্দু সাহিত্যের তিনটি রচনাশৈলী তথা দক্ষিণ ভারতীয় রচনাশৈলী, দিল্লি রচনাশৈলী ও লাক্ষ্ণৌ রচনাশৈলীতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কিত প্রমাণসিদ্ধ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ষোলোশ শতাব্দীর শেষের দিকে দক্ষিণ ভারতে কার্যকরীভাবে উর্দু সাহিত্যের সূচনা হয়। দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের শাসকবৃন্দ উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দক্ষিণ ভারতের সাধারণ জনগণের ভাষা ছিলো উর্দু। আর শাসকবৃন্দের ভাষা ছিলো ফারসি। তাই দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রভাষা কখনো ছিলো ফারসি আবার কখনো উর্দু। রাষ্ট্রভাষার এ টানাপোড়েনে সাধারণ জনগণ ফারসি ও উর্দু উভয় ভাষা সমান্তরালভাবে চর্চা করেছেন । যার ফলে উর্দু ভাষার উপর ফারসি ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

উল্লেখ্য যে, আঠারোশ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উর্দু ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নে কোলকাতা ফোর্টউইলিয়াম কলেজ অনন্য ভূমিকা রেখেছে। এ কলেজের উদ্যোগে বেশ কিছু ইংরেজি ও ফারসিগ্রন্থ উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান জনাব ড. জোন গিলক্রিষ্ট উর্দু ভাষার জন্য ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উর্দু ব্যাকরণের পরিভাষার সকল নাম ফারসি ব্যাকরণিক পরিভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ কথাটি প্রমাণ করা হয়েছে যে, আরবির পর ফারসি ভাষা ও সাহিত্য হলো ইসলামি জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বিতীয় উৎস। উপমহাদেশের মুসলমানগণ এ উৎস থেকেই ইসলামি জ্ঞান আহরণ করেছে। একটি সময়ে ইসলামি জ্ঞান ফারসি থেকে উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য তৃতীয় উৎস হিসেবে কাজ করেছে। তাই দেখা যায় উর্দু অনুবাদ সাহিত্য একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য। নভেল কিশোর প্রেস, নাদওয়াতুল উলামা, দারুল মুসান্নিফিনসহ সহস্রাধিক প্রকাশনা সংস্থা উর্দু অনুবাদ সাহিত্যকে শক্তিশালী করেছে। উর্দু অনুবাদ সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব উল্লেখপূর্বক এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, উর্দু অনুবাদ সাহিত্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের কারণে সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত কবি নুসরাতি, গাওয়াসি ও আলি আদিল শাহের কাব্য পাঠে মনে হয় যেনো এটি ফারসি কাব্যের অনুবাদ জগৎ। উর্দু অনুবাদ সাহিত্যের উপর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের পর আরো বেড়ে যায় এবং এ প্রভাব ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গতিশীল ছিলো।

চতুর্থ অধ্যায়ে উর্দু ভাষার সূচনাপর্বের কবি-সাহিত্যিকগণ যে মূলত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করতেন তা প্রমাণসিদ্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চাই ছিলো তাদের ধ্যান। তাঁরা মাতৃভাষা হিসেবে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁদের রচনায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উঁচুমানের কবি সাহিত্যিকদের পরিচয় এসেছে। উর্দুভাষী সাধারণ পাঠক তাঁদের মাধ্যমে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছে। এটি প্রমাণ করার জন্য তাঁদের রচিত কবিতাসমূহ উদ্ধৃতিসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডার শাসক কুলি কুতুব শাহের (১৫৬৫-১৬১১ খ্রি.) উর্দু সাহিত্যচর্চা মূলত ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ছায়া অনুবাদ। উর্দু ও ফারসি মিলিয়ে তিনি প্রায় এক লক্ষ কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে উপমহাদেশের ধর্মাচার, সংস্কৃতি, সমাজ-প্রকৃতি ইত্যাদি বর্ণনা ফুঠে উঠেছে। তাঁর কবিতায় ফারসি কবিদের নান্দনিকতা বিশেষ করে ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি হাফিজের (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.) প্রতিছায়া পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ কবির রচনায় ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের বিপুল প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। এছাড়াও উর্দু সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতা ও নানা বক্তব্যের উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, উর্দু কাব্য সাহিত্যে ফারসি কাব্য সাহিত্যের বহু প্রভাব রয়েছে।

উর্দু কাব্যছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্র ফারসি কাব্যছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। উপমা-উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, প্রেয়সীর সৌন্দর্যের বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনা, ধর্মীয় বিষয়াদির বর্ণনা, ইহকাল-পরকাল সম্পর্কে ধারণা, কিচ্ছা-কাহিনী, সাহিত্য উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সকল কিছুই ফারসি থেকে এসেছে। এ কারণে উর্দু ভাষায় দেশীয় সাহিত্যের উপাদান বেশ কম। উপমা-উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, প্রেয়সীর সৌন্দর্যের বর্ণনা, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় উর্দু ভাষায় দেশীয় উপাদান শূন্যের কোটায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.) ১৬৮৬ ও ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত জয় করলে দক্ষিণ ভারতের সাথে দিল্লির যোগসূত্র তৈরি হয়। তৎকালে দিল্লির সংস্কৃতি ছিলো মুশায়েরা বা কাব্যাসরে কবিতা পাঠ। উর্দু ভাষার বিখ্যাত কবি অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করে দিল্লির কাব্যাসরে যোগ দেন। এ সময় অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) উস্তাদ সাআদুল্লাহ খান গুলশানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। উস্তাদ সাআদুল্লাহ খান গুলশান অলিকে (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি) ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রভাবিত উর্দু কবিতা রচনার পরাশর্ম দেন। অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলিত ছন্দে উর্দু কবিতা রচনা করে দিল্লির কাব্যাসরে পরিচিতি লাভ করেন। উর্দু কাব্যচর্চার এ রীতি তৎকালে উর্দু কবিদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) পূর্বে উর্দু কাব্যচর্চার ছন্দরীতি ছিলো বিক্ষিপ্ত। হিন্দি ও ফারসি ভাষায় প্রচলিত কাব্য-ছন্দসমূহই উর্দু কাব্যে ব্যবহৃত হতো। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) পর উর্দু ভাষার কবিগণ ছন্দ ব্যবহারের দিক-নির্দেশনা পান। অলির (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) পর থেকে আল্লামা ইকবাল পর্যন্ত অধিকাংশ উর্দু কবি নিজেদেরকে ফারসি কবি বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিগণের উর্দুর পাশাপাশি ফারসি ভাষায়ও কাব্যগ্রন্থ রয়েছে।

আল্লামা ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) মতো বিখ্যাত কবিও তাঁর রচিত ফারসি কবিতাগুলোকে উর্দু কবিতার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বিখ্যাত উর্দু কবি আল্লামা ইকবাল মাওলানা রুমিসহ (১২০৭-১২৭১ খ্রি.) একাধিক ফারসি কবির অনুসরণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, অলি (১৬৬৮-১৭৪৪ খ্রি.) থেকে আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.) পর্যন্ত কেউই ফারসি কবি হিসাবে বিখ্যাত নন। তাঁরা মাতৃভাষা উর্দুতে যা রচনা করেছেন, তার কারণেই তাঁরা আজ জগৎ সেরা হয়েছেন।

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পরতে পরতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। বর্ণমালা থেকে শুরু করে শব্দ ও বাক্যগঠন, ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্রীয় বিষয়াদি সব কিছুতেই ফারসি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যশৈলীতে ফারসি শব্দ ও উপমার উদাহরণ স্বল্প; কিন্তু দিল্লির প্রচলিত সাহিত্যশৈলীতে প্রচুর পরিমাণ ফারসি শব্দ ও উপমার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দিল্লির প্রচলিত রচনাশৈলীতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের নিপুণতা উর্দু ভাষায় ফুটে উঠে এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের মতো উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে রসবোধ সৃষ্টি হয়। এ সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের কারণে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব নন্দিত ভাষা ও সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

কিন্তু উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের লাক্ষ্ণৌ রচনাশৈলীতে কিছুটা মেকিভাব চলে আসে। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে রসবোধ জটিল হয়ে পড়ে। ফলে ভাষা ও সাহিত্যে শুরু হয় পতন। এক পর্যায়ে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে একটি সাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাহিত্যে পরিণত করার প্রয়াস চলে।

প্রত্যেক উর্দু কবি-সাহিত্যিকের আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁরা স্বীয়বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে সাহিত্য চর্চা করেছেন। এ সাহিত্যচর্চায় উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের রচনা ও ভাবনায় ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রভাব নিক্তি দিয়ে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে ফারসি ও উর্দু সাহিত্যকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে এ প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

বস্তুত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উপর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বময় নন্দিত করেছে। বর্তমানে উর্দু পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষা ও সাহিত্য। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-দর্শন এবং ধর্মপ্রচারে এ ভাষা অতুলনীয় ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে সঙ্গীত ও গজল তথা গীতিকাব্য রচনায় এ ভাষা সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করছে। আজও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে বিরাজমান। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা ব্যতীত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে প্রাজ্ঞতা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের দ্যুতিতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য দ্যুতিময় হয়েছে। জ্ঞান, শিল্প আর দর্শনে উর্দু ভাষাও ফারসি ভাষার মতো গোটা পৃথিবীকে আলোকময় করছে। তাই এ কথা অকপটে বলা যায় যে, উর্দু ভাষা ও সাহিত্য গোটা বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমীদের এক নতুন আলোর পথ দেখিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমরা মুখে যা বলি তাই ভাষা। ভাষার কোনো বর্ণ নেই। ভাষার কোনো ধর্ম নেই। ভাষার কোনো সীমারেখা নেই। ভাষা সর্বদা সর্বজনীন হয়। প্রতিটি ভাষার মাঝেই রয়েছে সুন্দর-অসুন্দরের ছোঁয়া। অসুন্দর দিকগুলো সবসময় ভাষা ও সাহিত্যকে কালিমাময় করে। পক্ষান্তরে সুন্দর দিকগুলো ভাষা ও সাহিত্যকে আলোকিত করে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের নান্দনিক দিকগুলো উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে আলোকিত করেছে। আলোকিত হয়েছে উর্দুভাষী সমাজ। মোটকথা উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পরতে পরতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান অভিসন্দর্ভটিতে ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উপর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যে ব্যাপক প্রভাব ছিলো তা বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

(নামের বর্ণানুক্রমে)

অ

১. অলি (২০০৮): *কুল্লিয়াতে অলি*, কাওমি কাউন্সিল বরায়ে ফারুগে উর্দু, দিল্লি, ভারত।

আ

২. আ. ত .ম. মুছলেহউদ্দীন (২০০৯): *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৩. আন্দালিব শাদানি (১৯৬২): *দাওরে হাজের মে উর্দু গজল গুয়ি*, শেখ গোলাম আলি এন্ড সন্স, লাহোর, পাকিস্তান।

৪. আবু মুহাম্মদ শরফুদ্দিন মুসলেহ উদ্দিন আব্দুল্লাহ শিরাজি শেখ সাদি (অনুল্লেখিত): *কারিমা*, আশরাফিয়া বুক ডিপু, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৫. আবু মুহাম্মদ শরফুদ্দিন মুসলিহুদ্দিন আব্দুল্লাহ শেখ সাদি শিরাজি (১৩৫৪ হি.): *গুলিস্তান*, আশরাফিয়া বুক হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৬. আবু মুহাম্মদ শরফুদ্দিন মুসলিহুদ্দিন আব্দুল্লাহ শেখ সাদি শিরাজি (১৩৭৫ সৌর.): *বুস্তান*, কুতুব খানায়ে আশরাফিয়া বাংলাবাজার, ঢাকা।

৭. আবু সাঈদ মুহাম্মদ নুরুদ্দিন (১৯৯৭): *তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান।

৮. আবুল কাসেম ইবন হাওকাল (৯৭৭): *সুরাতুল আরদ*, দারুস সাদির, বৈরুত, লেবানন।

৯. আবুল কাসেম ফেরদৌসি (১৩৭৪ সৌ.): *শাহনামায়ে ফেরদৌসি*, সংকলন ও সম্পাদনা, মাহদি কারিব ও মুহাম্মদ আলি বেহবুদি, ইনতিশারাতে তুস,তেহরান, ইরান।

১০. আবুল কাসেম রাফিঈ মাহরাবাদি (১৩৪৫ সৌ.): *খাত্ত ও খাত্তাতান*, মুওয়াস্সাসায়ে ইন্তিশারাতি আমীরে কাবীর, তেহরান, ইরান।

১১. আবুল লাইস (১৯৭৭): *মুকাদ্দামায়ে হিন্দুস্তানি গ্রামার*, বেনজামিন শেলজে, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

১২. আবুল লাইস (১৯৭১): *জামিউল কাওয়াইদ*, মারকাজি উর্দু বোর্ড, লাহোর, পাকিস্তান।

১৩. আবেদ আলি আবেদ (১৯৮৯): *আল বায়ান*, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

১৪. আব্দুল গফুর নাসসাখ (১৮৯০): *রিসালা দর তাহকিকে যবানে রিখতা*, মুন্সি নভেল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

১৫ আব্দুল মুহাম্মদ খান ইরানি (১৩৪৬ সৌ.): *পয়দায়েশে খাত্ত ওয়া খাত্তত্বান*, কিতাবখানায়ে ইবনে সিনা, করাচি, পাকিস্তান।

১৬. আব্দুল হক (১৯৭৬) : *তরজমা ফন আওর রেওয়ায়েত*,(সংকলক, ড. কামার রাইস), তাজ পাবলিকেশন হাউজ, জামে মসজিদ, দিল্লি, ভারত।

১৭. আব্দুল হক (১৯৬১): *ফারসি শায়েরি কা আসর উর্দু শায়েরি পর*, অপ্রকাশিত থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি।

১৮. আব্দুর রশিদ (১৩৯৭ হি.): *দুররে বাহায়ে কারিমা*, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা।

১৯. আব্দুশ শাকুর আহসান (২০১৬): *ইকবাল কি ফারসি শাইরি কা তানকিদি জাইজা*, পাঞ্জানুব, পাঞ্জাব, পাকিস্তান।

২০. আমির খসরু (১৩২৫হি.) : *কিসসায়ে চাহার দরবেশ*, চাপখানা সেপহর, তেহরান।

২১. আমির খসরু (অনু): *গুররাতুল কামাল*, এডুকেশনাল বুক হাইস. আলিগড়, ভারত।

২২. আলতাফ হুসাইন হালি (১৮৮৮): *হায়াতে সাদি*,মুজতোবায়ি প্রেস, লাহোর, পাকিস্তান।

২৩. আশরাফ আলি থানাভি (১৪২৫ হি.) : *কালিদে মাসনাভি*, ইদারায়ে তালিফ আশরাফিয়া, চকফুওয়ারা, পাকিস্তান।

২৪. আহমদ তামীমদারী (২০০৭): *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস*, [অনুবাদ, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী] আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২৫. আহমদ বিন ইয়াহইয়া বিন জাবির বিন দাউদ আল বালাজুরি (১৩৫১ সৌ.): *ফুতুহুল বুলদান*, চাপাখানা উসমানিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত ।

ই

২৬. ইউসুফ সালিম চিশতি (২০০৭): *শরহে জাভেদ নামা*, ইতিকাদ পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লি, ভারত।

২৭. ইউসুফ সালিম চিশতি (২০০৭): *শরহে বাঙ্গেদারা*, ইতিকাদ পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লি, ভারত।

২৮. ইনশা উল্লাহ খান ইনশা (১৯৩৫): *দারইয়ায়ে লাতাফাত*, [উর্দু অনুবাদ পণ্ডিত কায়ফি], আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দুয়ে হিন্দ, আওরঙ্গবাদ এডিশন, ভারত।

২৯. ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি (১৯৬৭): *বিররে আজিমে পাক ও হিন্দ কি মিল্লাতে ইসলামিয়া*, করাচি ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, পাকিস্তান।

৩০. ইহতেশাম হুসাইন (১৯৮৩): *উর্দু আদাবকি তানকিদি তারিখ*, কাওমি কাউন্সিল বরায়ে ফারুগে উর্দু, দিল্লি, ভারত।

৩১. ইহতেশাম হুসাইন (১৯৪৭): *হিন্দুস্তানি লিসানিয়্যাত কা খাকা*, আদবি প্রেস, লাটুস রোড, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

৩২. ইহতেরাম উদ্দিন শাগেল (১৯৬৩): *সহিফায়ে খুশনাভিসা*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, আলিগড়, ভারত।

উ

৩৩. উমর খৈয়াম (১৯৬৫): *আহওয়াল ওয়া রুবাইয়্যাত খৈয়াম*, শেখ গোলাম আলি পাবলিকেশন, লাহোর, পাকিস্তান।

৩৪. উমর খৈয়াম (১৯৭৮) : *রুবায়িআতে উমর খৈয়াম*, চৌঘরা, পাটনা, ভারত।

এ

৩৫. এজায রাহি (১৯৮৬): *তারিখে খাত্তাতি*, এদারায়ে সাক্বাফাত, পাকিস্তান।

ক

৩৬. কাজী আবদুর রশিদ (১৯৯৬): *মাসদার নুমায়ে ফারসি*, নিউ আর্টম্যান প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার, রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান।

৩৭. কাজি সাজ্জাদ হুসাইন (১৯৬১): *তরজমায়ে মাসনাভি মানাভি মৌলাভি*, হামেদ এণ্ড কোম্পানি, উর্দু বাজার, লাহোর, পাকিস্তান।

৩৮. কিউমারাস আমিরী (১৩৪৭ সৌ.): *জবান ওয়া আদাবিয়্যাতে ফারসি দার হেন্দ*, (ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), ইসলামি সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয়, ইরান।

খ

৩৯. খান মুহাম্মদ আতিফ (১৯৯৫): *তারিখে জবান ওয়া আদাবিয়্যাতে ফারসি*, খোদাবক্শ লাইব্রেরি, পাটনা, ভারত।

গ

৪০. গিয়ান চান্দ জেইন (১৯৮৭): *উর্দু কি নসরি দাস্তান*, উত্তর প্রদেশ, উর্দু একাডেমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৪১. গোলাম মোস্তফা খান (১৯৯৩): *ফারসি পর উদু কা আসর*, উর্দু মারকাজ, লাহোর,পাকিস্তান।

৪২. গোলাম রব্বানী (২০১৪): *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান*, মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা।

জ

৪৩. জহির উদ্দিন (অনুল্লেখিত): *বাহারিস্তান*, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

৪৪. জামিল জালিবি (১৯৮৬): *তারিখে আদবে উর্দু*, মজলিসে তারাক্কি আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

৪৫. জুরজি জায়দান (১৯৬৪): *তারিখে তামাদ্দুনে ইসলাম*, [অনুবাদ: মৌলভি মুহাম্মদ হালিম আনসারি], শেখ শওকত আলি এন্ড সন্স, করাচি, পাকিস্তান।

৪৬. জালালুদ্দিন জাফরি (১৯৪০): *তারিখে মাসনাভিয়্যাতে উর্দু*, শিরকাতে মুসান্নিফিন, লাহোর, পাকিস্তান।

৪৭. জালালুদ্দিন রুমি (১৩৭৩ সৌ.): *মাসনাভিয়ে মানাভি মাওলানা রুম*, মুআস্সাসা ইনতিশার নিগা, তেহরান, ইরান।

ত

৪৮. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী (২০১৪): *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বার্ড পাবলিকেশন্স, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৪৯. তারেক আজিজ (অনু): *উর্দু রাসমুল খাত্ত আওর টাইপ*, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

৫০. তালআত বাসারি (১৩৪৬ সৌ): *দস্তুরে মুখতাসারে যাবানে ফারসি*, কুতুব খানা তহুরি, তেহরান, ইরান।

দ

৫১. দয়া শঙ্কর (২০০৭): *মাসনাভি গুলজারে নাসিম*, মাকতাবা জামেয়া মিল্লি লিমিটেড, দিল্লি, ভারত।

ন

৫২. নাসির হুসাইন (১৯৫৯) : *তরজমায়ে শাহনামে*, শাউবুক ডিপু, চৌঘরা,পাটনা, ভারত।

৫৩. নাসির হুসাইন আজিমাবাদি (১৯৫৯): *দাস্তানে শাহনামা*, শাও বুকডিপু, চৌঘরা, পাটনা, ভারত।

৫৪. নাসিরুদ্দিন হাশিমি (১৯৫২): *দাকান মে উর্দু*, মাকতাবায়ে মুঈনুল আদাব, লাহোর, পাকিস্তান।

৫৫. নাসিরুদ্দিন হাশিমি (১৯৩৯): *মাকালাতে হাশিমি*, কাওমি কাউন্সিল বরায়ে ফারুগে উর্দু, দিল্লি, ভারত।

৫৬. নাসিম হেজাজি (২০০১): *মুহাম্মদ বিন কাসেম* (অনুবাদ, আইয়ুব বিন মুঈন), আল কাউসার প্রকাশনি, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৫৭. নুরুদ্দিন মুহাম্মদ (১৯৭০): *তুজকে জাহাঙ্গিরি*, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান ।

৫৮. নুরুল হাসান নাকাভি (২০০৪): *তারিখে আদাবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

৫৯. নুসরাতি (১৬৫৭): *গুলশানে ইশক*, এজাজ প্রিন্টিং প্রেস, হায়দারাবদ, ভারত।

ফ

৬০. ফরমান ফতেহপুরি (১৯৮৬): *তাদরিসে উর্দু*, মুক্তাদিরা কাওমি জবান, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

৬১. ফারহাত শামিম (২০১২): *উর্দু আওর ফারসি কে রাওয়াবেত*, আজাদ বুক ভিশন, জুম্মু, ভারত।

ম

৬২. মনির উদ্‌দীন ইউসুফ (১৯৬৮): *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৬৩. মাওলানা আব্দুর রশিদ (১৩৯৭ হি.) : *দুররে বাহায়ে কারিমা*, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা।

৬৪. মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ (১৪৩২ হি.) : *বাহারিস্তান*, আশরাফিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৬৫. মাসউদ হুসাইন খান (১৯৬৬): *মুকাদ্দমায়ে তারিখে যাবানে উর্দু*, উর্দু মারকাজ, লাহোর, পাকিস্তান।

৬৬. মাহমুদ বাহরি (১৯৫৫): *মনোলগন*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, পাকিস্তান।

৬৭. মাহমুদ শিরানি (১৯৮৪): *দাকান মে উর্দু* , আলা প্রেস, দিল্লি, ভারত।

৬৮. মির অলি উল্লাহ (১৯২২): *লিসানুল গাইব* কাশিরাম প্রেস লাহোর, পাকিস্তান।

৬৯. মির আম্মান দেহলাভি (১৭৭৭): *গাঞ্জে খুবি*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, দিল্লি, ভারত। [মূল : মোল্লা ওয়ায়েজ কাশিফি]

৭০. মির আম্মান দেহলাভি (১৯৪৪): *বাগ ও বাহার*, [সংকলক মৌলাভি আব্দুল হক], আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু ও হিন্দি, দিল্লি, ভারত।

৭১. মির তাকি মির (১৯৪১) : *কুল্লিয়াতে মির*, নভেল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

৭২. মির হাসান দেহলাভি (১৯২৮) : *মাসনাভিয়ে সিহরুল বয়ান*, মাজালিসে তারাক্কি আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

৭৩. মির হাসান দেহলাভি (১৯৩৩): *রুমুজুল আরিফিন*, শামসুল ইসলাম প্রেস, হায়দারাবাদ, ভারত।

৭৪. মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৮৬২): *দেওয়ানে গালিব* (উর্দু), মাতবায়ে নিজামি, কানপুর, ভারত।

৭৫. মির্জা আসদুল্লাহ খান গালিব (১৯৬৮): *দেওয়ান গালিব* (ফারসি), শেখ গোলাম আলি এন্ড সন্স, করাচি, পাকিস্তান।

৭৬. মির্জা খলিল আহমদ বেগ (১৯৯৫): *উর্দু জবান কি তারিখ*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

৭৭. মির্জা খলিল আহমদ বেগ (২০১৭) : *উর্দু যাবান কি লিসানি তাশকিল*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

৭৮. মির্জা মুহাম্মদ রাফি সাওদা (১৯৮৫) : *দেওয়ানে সাওদা*, নিজামি প্রেস লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

৭৯. মুমতাজ হুসাইন জৌনপুরি (১৯৬১): *খাত্ত ওয়া খাত্তাতি*, একাডেমি অফ এজুকেশন রিসার্চ, করাচি, পাকিস্তান।

৮০. মুহসেন আবুল কাসেমি (১৩৭৮ সৌ.): *তারিখে যবানে ফারসি*, কিতাব খানায়ে যুহরি , ইরান।

৮১. মুহাম্মদ আলি মির ইনশা (১৯৮৭): *জালিসুল মুস্তাক ভূমিকা* ইন্দোবির শেন সোসাইটি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৮২. মুহাম্মদ ইকবাল (২০০৭): *কুল্লিয়াতে ইকবাল*, ইতিকাদ পাবলিকেশন্স হাউজ, দিল্লি, ভারত।

৮৩. মুহাম্মদ ইকবাল (২০০৭): *বাঙ্গেদারা*, ইতিকাদ পাবলিকেশন্স, দরইয়া গঞ্জ, নতুন দিল্লি, ভারত।

৮৪. মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৮৬): *বালে জিব্রিল*, তাজ কোম্পানি লিমিটেড, লাহোর, পাকিস্তান।

৮৫. মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৯৩): *মাসনাভিয়ে আসরারে খুদি*, দ্যা ইউনিয়ন সিস্টেম প্রেস, লাহোর, পাকিস্তান।

৮৬. মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৯১): *রুমুজে বেখুদি*, পুনেসিটি, মহারাষ্ট্র, ভারত।

৮৭. মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টি (১৯৯০): *বাররে সগির মে ইসলাম কে আওয়ালে নুকুশ*, ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, লাহোর,পাকিস্তান।

৮৮. মুহাম্মদ কাসেম ফেরেশতা (১৯২৬): *তারিখে ফেরেশতা*, দারুত তরজমা উসমানিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত।

৮৯. মুহাম্মদ খুজায়েলি (১৩৪৯ সৌ.): *দাস্তুরে যাবানে ফারসি*, মারকাজে তাহকিকাতে ফারসি, ইরান।

৯০. মুহাম্মদুল্লাহ (১৪৩২ হি.): *বাহারিস্তান*, আশরাফিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৯১. মুহাম্মদ পালনপুরি (২০২০): *তারিখে হিন্দ*, মাকতাবতুস সালাম, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৯২. মুহাম্মদ রিয়াজ (১৯৭৭) : *ইকবাল আওর ফারসি শুআরা*, ইকবাল একাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান।

৯৩. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (২০১৯) *বাঙ্গালা ভাষার ইতবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৯৪. মুহাম্মদ সাজ্জাদ মির্জা (১৯৮৯): *উর্দু রাসমুল খাত্ত*, মুক্তাদিরা কাওমি যবান ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

৯৫. মুহাম্মদ সিদ্দীক খান শিবলি (১৯৯১): *তাসিরে যাবানে ফারসি বর যবানে উর্দু*, মারকাযে তাহকিকাতে ফারসি ইরান ও পাকিস্তান, ইসলামাবাদ।

৯৬. মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ (১৯৫০): *আবে হায়াত*, শেখ মোবারক আলি তাজ কুতুব আন্দুরুন, লাহোর, পাকিস্তান।

৯৭. মুহিউদ্দিন কাদেরি জুর (১৯৬০): *হিন্দুস্তানি লিসানিয়্যাত*, নাসিম বুক ডিপু, লাক্ষ্ণৌ, ভারত।

৯৮. মোল্লাহ ওয়াজহি (১৯৩৮): *কুতুবে মুশতারি*, আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, দিল্লি, ভারত।

৯৯. মৌলাভি আব্দুল হক (১৯৯৫): *উর্দু কি ইবতেদায়ি নশু নুমা মে সুফিয়া কিরাম*, ইদারা আদাবিয়্যাতে উর্দু, হায়দারাবাদ, ভারত।

১০০. মৌলাভি মোহাম্মদ হুসাইন আজাদ (১৯৫০): *আবে হায়াত*, শেখ মোবারক আলি তাজির কুতুব আন্দুরুন, লাহোর, পাকিস্তান।

র

১০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৩): *সোনারতরী*, বিশ্বভারতি, কোলকাতা, ভারত।

১০২. রেজা জাদে শাফাক (১৩৫২ সৌ.): *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান* [ইরানের সাহিত্য ইতিহাস], ইনতিশারাতে দানেশগাহে পাহলাভি, ইরান।

১০৩. রূহুল আমীন খান (২০২০): *কাব্যানুবাদ, মাসনবী শরীফ* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শ

১০৪. শওকত সব্জ ওয়ারি (১৯৬০): *দাস্তানে উর্দু* , আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দু, করাচি, পাকিস্তান।

১০৫. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজি (১৩৭৬ সৌ.): *দেওয়ানে হাফিজ*, মুআসসাসায়ে ফারহাঙ্গে ইরান, তেহরান, ইরান।

১০৬. শামসুল্লাহ কাদেরি (১৯২৯): *তারিখে জবানে উর্দু*, মুন্সি নভেল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্মৌ, ভারত।

১০৭. শিবলি নোমানি (১৯৪০): *শেরুল আজম*, দারুল মুসান্নিফিন, শিবলি একাডেমি, মাআরিফ প্রেস, আজমগরা, লাক্ষ্মৌ, ভারত।

১০৮. শিবলি নোমানি (১৯৬১): *সাওয়ানেহে মৌলাভি রুম*, মাজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

১০৯. শেখ মুহাম্মদ ইকরাম (১৯৯২)*: আবে কাউসার* ইদারা, সাকাফাতে ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান।

১১০. শেখ নিজামুদ্দিম গাঞ্জাভি (১৩৭৮ সৌ.): *ইসকান্দর নামে*, ইন্তিশারাতে নাগিন, তেহরান, ইরান।

১১১. শেখ নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১৩৭৮ সৌ.): *খসরু ওয়া শিরিন*, ইন্তিশারাতে নাগিন, তেহরান, ইরান।

১১২. শেখ নিজামুদ্দিন গাঞ্জাভি (১৩৭৮ সৌ.): *হাফত পেইকার*, ইন্তিশারাতে নাগিন, তেহরান, ইরান।

স

১১৩. সাজিদুল্লাহ তাফহিমি (অনু): *ফরহাঙ্গে ইস্তিলাহাতে উলুমে আদাবি*, (অনু)।

১১৪. সালিম আখতার (১৯৭১): *উর্দু আদব কি মুখতাসার তারিন তারিখ*, সাঙ্গমেইল পাবলিকেশন, লাহোর, পাকিস্তান।

১১৫. সিদ্দিক খান শিবলি (১৯৯১): *তাসিরে যাবানে ফারসি বর জবানে উর্দু*, মারকাজে তাহকিকাতে ফারসি ইরান ও পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

১১৬. সুকুমার সেন (২০১৮): *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কোলকাতা, ভারত।

১১৭. সুম্বুল নিগার (১৯৯৫): *উর্দু শায়েরি কা তানকিদি মুতালাআ*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলিগড়, ভারত।

১১৮. সুলতান জওক (অনুল্লেখিত): *কান্দখামা*, আশরাফিয়া বুক ডিপু, দেওবন্দ,ভারত।

Dhaka University Institutional Repository

১১৯. সুহাইল বুখারি (১৯৯১): *উর্দু যাবান কা সওতি নেযাম আওর তাকাবুলি মুতালাআ*, মুক্তাদিরা কাওমি যাবান, ইসলামাবাদ।

১২০. সুহাইল বুখারি (১৯৯১): *লিসানি মাকালাত*, মুক্তাদিরা কাওমি যাবান, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

১২১. সৈয়দ আব্দুল্লাহ (২০০৫): *অলি সে ইকবাল তক*, চমন বুকডিপু, উর্দু বাজার, দিল্লি, ভারত।

১২২. সৈয়দ আব্দুল্লাহ (১৯৬৭): *আদাবিয়্যাতে ফারসি মে হিন্দুউ কা হিস্‌সা*, মজলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

১২৩. সৈয়দ আবদুল্লাহ (১৯৭৭): *ফারসি যাবান ও আদব*, মসলিসে তারাক্কিয়ে আদব, লাহোর, পাকিস্তান।

১২৪. সৈয়দ আমির হুসাইন আবেদি (১৯৮৪): *হিন্দুস্তানি ফারসি আদব* , আলাপ্রেস, দিল্লি, ভারত।

১২৫. সৈয়দ মুহাম্মদ সেলিম (১৯৮১): *উর্দু রাসমুল খাত*, মুক্তাদিরা কাওমি যাবান, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

১২৬. সৈয়দ হাসান সদরুদ্দিন জাওয়াদি (১৯৯৩): *দাস্তুর নাভিসিয়ে ফারসি দর শিবহে কার্‌রাহ*, মারকাজ তাহকিকাতে ফারসি, তেহরান, ইরান।

১২৭. স্যার সৈয়দ আহমদ খান (প্রকাশের সন ও প্রকাশনা সংস্থার নাম অনুল্লিত): *আসারুস সানাদিদ*, সেন্ট্রালবুক ডিপু, উর্দু বাজার, জামা মসজিদ, দিল্লি, ভারত।

হ

১২৮. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৯৬২): *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কোলকাতা, ভারত।

১২৯. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৩৬০ বঙ্গাব্দ): *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক অজিত চন্দ্র ঘোষ, কোলকাতা, ভারত।

১৩০. হাফেজ মাহমুদ শিরানি (১৯৮৫): *মাকালাতে হাফেজ মাহমুদ শিরানি*, মজলিসে তারাক্কি আদব, লাহোর, পকিস্তান।

১৩১. হাফিজ জালালুদ্দিন আহমদ জাফরি (১৯২২): *তরজামা রুবাইয়াতে হাকিম উমর খৈয়াম*, আনোয়ার আহমদি ইলাহাবাদ প্রেস, ভারত।

১৩২. হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৫): *তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

১৩৩. E.L. Bril (1978): *TheEncyclopaedia of Islam,* New edition, Leiden, Netherland

১৩৪. Elton L Daniel (2001): *The History of Iran*, Greenwood Press, New York.

১৩৫. G A Grierson (year not mentioned): *Liinguistic Survey of Pakistan*, Vol-1, Accurate Publisher, Lahore, Pakistan.

১৩৬. G Lazard (1975): *The Rise of the New persian Language,* Cambridge University Press, London.

১৩৭. India (1996): A Country Study, Federal Research Division, Library of Congress, Washington.

১৩৮. Ismail R. al Faruqi (1986): *The Cultural Atlas of Islam*. Mac-millan Publishing Co, New York.

১৩৯. John Beames (1875): *A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India*, Cambridge Library. London.

১৪০. John Gilchrist (1903 CE.): *Linguistic survey of India*, Cambridge University Press, London

১৪১. Paul Smith (1992): Mansur Hallaj The Tawasin, New Humanity Books, London.

১৪২. Ram Babu Saksena (1952): *The History of Urdu Leature*, Allahbad, Ram Narain Lal Publisher, India.

১৪৩. Suniti Kumar Chatterji (1970): *The Origin and Development of the Bengali Language, Published by Rupa & Co*

Dhaka University Institutional Repository

যেসব ওয়েবসাইট এড্রেস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে:

1. https://www.rekhta.org
2. https://ganjoor.net
3. https://www.en.wikipedia.org
4. https://www.concise.britanica.com/ebc
5. https://www.iqbalacademy.com
6. https://www.ashrarqulawasat.com
7. https://www.ghalibacademy.com
8. https://www.urducouncil.nic.in/